১৯৪৩

১লা জানুয়ারি ১৯৪৩। ১৬ই পৌষ, ১৩৪৯। শুক্রবার।

সভাপতি গালুডি সুবর্ণ সঙ্ঘ। নীরদবাবু বল্লেন, ওঁর বিষয় ওঁর সাহিত্য নিয়ে বলতে। বিকেলে হেঁটে গালুডি। নীরদবাবুর বাড়ি স্বপ্ন মামা অভিনয় হল। অভিনয়ান্তে নবাব সাহেবের গাড়িতে ফিরি [—] অমরবাবু, রেখা, দ্বিজুবাবু, অমরবাবুর স্ত্রী। বাড়িতে এসে শুনি চাঁইবাসা থেকে মোটর নিয়ে এসেছিল, সেখানে সভাপতিত্ব করতে হবে।

২রা জানুয়ারি, ১৯৪৩। ১৭ই পৌষ, ১৩৪৯। শনিবার।

ঘাটশিলা—চাঁইবাসা। সকালে উঠে বসে আছি, মোটর এল। খেয়ে রওনা। কল্যাণী ও আমি হাত ধরে বসে। গত বৎসরও এই সময়ে চাঁইবাসা। বন ও পাহাড় পার হয়ে, রাখা মাইনস্ পার হয়ে কাপড়গাদি ঘাট। তারপরে পোট্‌কা, তারপর তিরিন। তিরিন বাংলোতে (P.W.D.) চা খেয়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে বসে কত কি ভাবি। সন্ধ্যার আগে খড়কাই নদী পার হয়ে মোটর রাখা হয়। কল্যাণীকে নিয়ে বেড়াই নদীর ধারে। চাঁইবাসা পৌঁছে সিংহ সাহেবের বাড়ি বাসা (?)। হরদয়াল সিংহ, কোল্‌হান D.F.0. এল। সুবোধের বাড়ি চা খাই। রাত্রে আড্ডা। সুরেশ দেখা করতে এল।।

৩রা জানুয়ারি, ১৯৪৩। ১৮ই পৌষ, ১৩৪৯। রবিবার। চাঁইবাসা

সকালে চা খাচ্চি, অবিনাশবাবু ও তাঁর মেয়ে দেখা করতে এল। আমরা সুবোধবাবুর বাড়ি গেলুম। সেখানে সত্যবাবুর মেয়ে সুধা ও তার স্বামী রয়েচে, সুবোধ ঘোষের মামা। সন্ধ্যায় টাউন হলে মিটিং হল। বনগাঁর বৃন্দাবন মিশ্র মোক্তারের জামাই মি. ওঝা (S.D.O.) সভায় বক্তৃতা দিলেন। সভান্তে হরদয়াল সিং ও যোগীন সিংয়ের সঙ্গে ক্লাবে যাই। কল্যাণী চলে গেল সুবোধের বাড়ি নিমন্ত্রণে।

সকালে সুবোধের গাড়িতে এরোড্রামের মাঠ ও লুবুংগুটু বেড়াতে যাই। অর্জুন গাছের ছায়ায় একটা ভ্যালি দিয়ে জল পড়চে। কয়েকটি ছেলে পিকনিক করচে—আমাদের খাওয়ালে।

৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৪৩। ১৯শে পৌষ, ১৩৪৯। সোমবার। বামিয়াবুরু ও সৈদ্‌পা

সকালে চা খাই সুবোধের বাড়ি। চা খেয়ে হরদয়াল সিং (D.F.O.-Kolhan), যোগীন সিং (D.F.O.-Dhalbhum), কল্যাণী ও আমি মোটরে রওনা। হরপতি করের বাড়ি নেমে দেখা করে পান খেয়ে রোরো নদী পার হয়ে বরকেলা পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে সৈদ্‌পা বনে এক ফরেস্ট বাংলোতে উপস্থিত হই। পেছনে বনাবৃত পর্বত, ঢালুর নীচে বাংলো। বনভূমির নিস্তব্ধতা। কল্যাণী চা করলে, আমরা চা খেয়ে সাবাই ঘাসের গাঁট বাঁধাই হচ্চে দেখতে গেলুম। পাহাড় থেকে ঝাড়ু ঘাসের ফুল নিয়ে এলুম কল্যাণীর জন্যে। সাবাই ঘাসের চাষ হচ্ছে সেখানে, সুন্দর সমতলভূমি। একটি বনমধ্যস্থ ঝরনার ধারে বসলুম। সৈদ্‌পা ফিরে আহার করে বাংলোর সামনে মাঠে বসে গল্প করি। তারপর ঘেঁটুফুলের গাছ সম্বন্ধে গল্প। আবার রওনা—বেলা ৩টা। পথে ক্রোমাইটের খনিতে হো মেয়েরা কাজ করচে। কল্যাণী একটা কড়া তুলতে পারলে না—সব হো মেয়েরা হাসে। একটা ঝরনাতে ক্রোমাইট কড়ায় ধুচ্চে। ঘন জঙ্গল। ৫॥০ টা বামিয়াবুরু বাংলোতে পৌঁছাই। সত্যি অপূর্ব স্থান। ১৯০০ ফুট পাহাড়ের মাথায় বাংলো। সামনে বসে চা খাই চেয়ার টেবিল পেতে। তারপর জঙ্গলের মধ্যে হরদয়াল সিংহ ও আমি বেড়াই। একস্থানে হরদয়াল বলে—বাঘ আসে। ফিরে এসে হো কুলি মেয়েরা আগুন পোয়াচ্চে, সেখানে দাঁড়াই। একজনের নাম সামনি, সবাই হাসে। বুনোdwarf খেজুর গাছের চটা বুনচে। ঘন অন্ধকারে উঠে এসে দেখি কল্যাণী রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে, গায়ে স্কার্ফ—পেঁপের ডালনা রাঁধচে। আমি ভাবি ও এল কি করে এখানে ?খেয়ে চিমনির আগুনে বসেগল্প। অনেক রাত্রে সিংহ ও আমি অন্ধকারে বেড়াই ও গল্প করি। কিসের সুগন্ধ পাই। সিংহ বল্লে—ওই

দেখুন, নিশ্চয়ই টাটার আলো। আকাশে মেঘ করেচে—এক জায়গায় মেঘ চকচক করচে। কল্যাণী ডাকচে শুতে। হরদয়াল বলচে, এসে শোও সব। দিনে গল্প কোরো।

৫ই জানুয়ারি, ১৯৪৩। ২০শে পৌষ, ১৩৪৯। মঙ্গলবার। বামিয়াবুরু ও চিটিমিটি

সকালে কি চমৎকার সূর্যোদয়। খুব মেঘ। কল্যাণী হাতমুখ ধুলে। চা করলে। আমরা ঘন জঙ্গল দিয়ে পোগমারা গাড়ার ধারের ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ৫ মাইল বেড়াই। কল্যাণীর স্কার্ফটা একজন ফরেস্ট গার্ড নিয়ে চলল। ছোট এলাইচের গাছ একজায়গায় বনের মধ্যে। গাছে গাছে ফার্ণ, সুবৃহৎ শাল ও আসান গাছ কলের চিমনির মত। কনটুর ট্রেঞ্চ, Grass quadrant-এর গল্প শুনতে এসে হরদয়ালের মুখে বনের মধ্যে এক জায়গায় বসি। আমলকী পেড়ে নিয়ে আসেফরেস্ট গার্ড বনবিহারী মিশ্র ও broom grass। বনহস্তী গাছের গায়ে দাঁত দিয়ে ছাল ছিঁড়েচে। বুনো হাতির নাদ রাস্তার ওপরে। টাইগার হিলে যাবো বলে বেরিয়েছিলাম—কিন্তু যাওয়া হল না। আহারান্তে গল্প করে মাছের বাঁধ দেখতে গিয়ে সেই গভীর বনের মধ্যে কতক্ষণ বসে। জঙ্গলে ironstone কত পড়ে। মোটরে চিটিমিটি। পথে কি সব ভীষণ জঙ্গল, হরদয়াল বনকে ভালোবাসে প্রাণ দিয়ে—কেবল বলে—এটা দেখুন, ওটা দেখুন। উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী পার হয়ে চলেচি। পথে এক হাট। নামলুম মোটর থেকে। কল্যাণী বৃন্দাবনী চাদর কিনলে। পথে ছড়া বানালুম

আগে পেটাপেটি—

বাঁকে, রুয়াউলি, করজুলি

তারপর চিটিমিটি।

কেবল শুনচি সান্‌তারাও, পেটাপেটি ফেলিং সিরিজ্‌। হরদয়াল বলচে—জঙ্গলে কি আগুন লাগল ?সন্ধ্যায় চিটিমিটি। বাংলোতে নেমেই চাকরে চা করতে লাগল—আমরা পাহাড়শ্রেণীর প্রত্যন্তসীমায় মাইলখানেক দূরে সমতলভূমির দৃশ্য দেখতে গেলুম মোটরে। বনের মধ্যে এখন সন্ধ্যা নামচে। তারপর কি সুন্দর দৃশ্য ! চা খুব মিষ্টি লাগল এখানে। বনপথে রওনা—অন্ধকার পর্বতশিখর, হরদয়াল গাড়ি চালাচ্চে—ঘুমুচ্চে, জ্বলজ্বলে নক্ষত্র উঠেচে মাথার ওপরে। ভগবান কোথায় কোন্‌ আকাশে এই ironstone-এর পদার্থ দিয়ে নক্ষত্র ও বিশ্ব তৈরি করে, এই বন, এই পাহাড়ের গাম্ভীর্যের মধ্যে নিজেকে অদৃশ্য করে কোথায় আছেন সেই great being ?আজ তাঁকে বুঝলাম ভালো করে। বনে, পাহাড়ে, এমনি রাত্রে, তারাভরা অন্ধকার আকাশতলে তাঁকে বোঝ যায়—মন্দিরে নয়, বাড়িতে পূজার ঘরে নয়। আশ্রমে নয়। This is realisation।ফেরার পথে রামমোহন লাইব্রেরির সভার বিষয়ে হতাশ হয়েছিলাম—কিন্তু দেখি লোক রয়েচে। সভা করে বালক কবি ও রঘুনন্দন হলের অজ্ঞাতনামা মেয়েটির কথা বলে বাসায় ফিরি। আবার গল্প। Not a moment dull। সিংহ, মিসেস সিংহ, সুবোধ ঘোষ। কাল জয়ন্তগড় যাবো।

৬ই জানুয়ারি, ১৯৪৩। ২১শে পৌষ, ১৩৪৯। বুধবার। জয়ন্তগড়

আজ সকালে চা খাওয়া সেরে মোটরে হাটগামারিয়া হয়ে বৈতরণী নদী পার হয়ে Eastern States ফরেস্ট স্কুল দেখি। রিঠা ফল ওখানে দেখি—শিরিষ ফলের মতো বড়। জয়ন্তগড় বাংলোতে সন্ধ্যায় চা খেয়ে মাঠের মধ্যে বসি। হাটগামারিয়া চায়না ক্লে মাইন দেখি। একটা বড় বাড়ির ছাদে ওঠায়—সেখান থেকে তারা দেখায়—ওই দূরে গুয়া, ঐ জামদা, ঐ বড়বিল। পরেশ সান্ন্যাল বলে এক লেখককে কষ্ট করে খুঁজে বার করি। তাঁর বাসায় গিয়ে বসে কতকগুলি ছোট ছোট মেয়েকে বলি আমার নাম। একটা দোকানে গাড়ি দাঁড় করে চা খাই, সিঙেড়া খাই। পরেশ সান্ন্যাল এল। এদিন সুবোধের বাড়ি রাত্রে নিমন্ত্রণ।

৭ই জানুয়ারি, ১৯৪৩। ২২শে পৌষ, ১৩৪৯। বৃহস্পতিবার। চাঁইবাসা ও সেরাইকেলা

পরেশ সান্ন্যাল এল সকালে। তার সঙ্গে সুবোধের মোটরে সিংহ ও S.D.O. (P.W.D.) সেরাইকেলা—ওখানে এলুম। S.D.O.-র বাসায় [-] এক ছোকরার বাড়ি আওরঙ্গাবাদে। সে বল্লে—মানিক ভট্‌চাজ বিএ, বিটি তিনি আর কি লেখেন ?চা খেয়ে সেরাইকেলা রাজার বাড়ি ও মিউজিয়ম দেখি। হরিদাস কবিরাজ বলে একজন মাইনিং অফিসার সব দেখালেন। ছো নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গির ফটো দেখি দরবার হলে। ফিরে এসে একটি চমৎকার পাহাড়ের মাথা থেকে ঠিক যেন arizone [arizona] মরুর দৃশ্য। Vast Space-এর দৃশ্য। সিংহ বল্লে—ওই দূরে বরকেলা, যেখানে সূর্য অস্ত যাচ্চে—ওর ডাইনে চিটিমিটি। স্লেট-পাথরের পাহাড়। নাম দিলে—বিভূতি শৈল। পরেশ সান্ন্যাল, সুবোধ সিংহ ও আমি—খাবার খাই সেখানে। রাত্রে ফিরি। দেন্দ্রাশালী স্টেশন থেকে পাহাড়টা ২.৫ মাইল।

৮ই জানুয়ারি, ১৯৪৩। ২৩শে পৌষ, ১৩৪৯। শুক্রবার। চাঁইবাসা ও চক্রধরপুর

এদিন সকালে সিংহের বাবার সঙ্গে গল্প করি। হরদয়াল সিংহের বাসায় গিয়ে দেখি জগৎ সিং (D.F.O. চাঁইবাসা) বসে। সে গল্প করে ভাণ্ডেই ভাণ্ডা (?)—হরদয়াল সিং বলে দেয় অর্থ, I am telling you, I am telling you-। সেখানে স্নান করে ফিরি। There was a cold day—দরওয়াজা খোল দে। There was a banker—দরওয়াজা বন্ধ কর। হরদয়াল খেতে বল্লে—কিন্তু ফিরে এখানেই খাই। বিকেলে সুবোধের গাড়িতে চক্রধরপুর। সন্ধ্যায় (?) নদীর ধারে কতক্ষণ বসি। মেজর চ্যাটার্জির বাড়ি যাই—তাঁর স্ত্রী কানে কম শোনেন। সাজানো গোজানো ঘর। নগেন ঘোষের বাড়ি চা ও খাবার খাই। কল্যাণীকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। পথে এক দুর্ঘটনা হয়েছিল মোটরে ! সুবোধ বলে। চক্রধরপুর যাবার পথে কিশোর সঙ্ঘের লাইব্রেরি দেখায়—কল্যাণী ও আমায় দিয়ে ওদের খাতায় লিখিয়ে নেয়। ফিরে যাই। সুবোধের বাড়ি কল্যাণী গেল। আমরা ভর্মা বলে একজন ছোকরা গ্র্যাজুয়েটের সঙ্গে পাশের (?) ঘরে গল্প করি। রাত্রে সুবোধের বাড়ির সব এখানে খেলে।

৯ই জানুয়ারি, ১৯৪৩। ২৪শে পৌষ, ১৩৪৯। শনিবার। চাঁইবাসা—ঘাটশিলা—ঝাড়গ্রাম

সকালে চা খেয়ে সুবোধের গাড়িতে রওনা। তিরিন এসে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে বটতলায় বসে চা খাই। আবার সেই সামন্তের স্ত্রীর সঙ্গে কল্যাণী গিয়ে গল্প করে। পোট্‌কা ছাড়াই। কালো কালো পাহাড় যেন পাথুরে কয়লার স্তূপ। তিরিনের ওপারে সুন্দর দৃশ্য। পথে রাখা মাইন্‌সের শিলাখণ্ড দেখি। বটগাছটার তলায় নীরদবাবুরা পিকনিক করেচে তার চিহ্ন। মিতে ও মন্মথদার কথা কদিনই ভাবচি। বামিয়াবুরুতে মিতের কথা ভেবেছি। ঘাটশিলা পৌঁছে আহারাদি করে নুকু, নুটু, সুবোধ ও আমি চাকুলিয়ার (?) পথে সোজা ঝাড়গ্রাম। বিহার ছাড়লুম, বাংলা আরম্ভ হল। তালগাছ, নারিকেল গাছ। বাংলার খড়ের ঘর। বাংলা মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করি। দাইজুড়ি (?) বলে একটা গ্রাম পথে পড়ে। ঝাড়গ্রামে পৌছে নুকুর সঙ্গে মায়াদির দেখা পথেই। রাজার বাড়ি ও সাবিত্রী মন্দির ঘুরে চা ও খাবার খেয়ে বেলুকে নিয়ে তখুনি রওনা। পথে একটু চাঁদ উঠল। কাল চক্রধরপুর থেকে ফিরবার পথে এ চাঁদ দেখছিলুম। বঙ্কিমবাবুর বাড়ি এলুম পেট্রোল নিতে। অনেক রাত্রে বাড়ি। সুবোধবাবু রইল।

বেলু এসেচে, বাথরুম দিয়ে ডোকানো হল—উমা দেখে তো অবাক।

১০ই জানুয়ারি, ১৯৪৩। ২৫শে পৌষ, ১৩৪৯। রবিবার।

সকালে চা খেয়ে নুটু সুবোধের সঙ্গে চাঁইবাসা গেল। আমি বেলু ও উমাকে নিয়ে ফুলডুংরি। এ যে নিজের দেশে এসেচি। পোট্‌কা থেকে সিদ্ধেশ্বরডুংরির মাথা দেখে কাল দুপুরে ভেবেছি—এই দেশে এলুম ! যেমন একদিন E.B.R.-এর সিগন্যাল দেখে চাঁদপুরে ভেবেছিলুম দেশে এলুম !কোথায় ৪১, মৃজাপুর স্ট্রীট। কোথায় বারাকপুর ! আর কোথায় এই পাহাড়ে ঘেরা সিংভূম ! এই এমন দেশ ! রাজেন গাঙ্গুলীর বাড়ির গল্প করি।

১১ই জানুয়ারি, ১৯৪৩। ২৬শে পৌষ, ১৩৪০। সোমবার।

এদিন প্রসূন এল সকালে। ওকে আসতে বললুম বিকেলে। বেলু ও উমা প্রসূনকে নিয়ে (গুটকেও ছিল)—রাত মোহানা। ভটচাজ সাহেবের বাড়ি গিয়ে কারো দেখা পেলুম না। দ্বিজুবাবুর বাড়ি রাত্রে দেখি তিনি বসে। সবাই খাই এক সঙ্গে।

১২ই জানুয়ারি, ১৯৪৩। ২৭শে পৌষ, ১৩৪৯। মঙ্গলবার।

এদিন অমরবাবুর বাড়ি যাবো বলে বেরিয়ে গুটকের মুখে শুনি ওঁরা বেরিয়ে গেছেন। উমা ও বেলুকে ফিরিয়ে দিলুম ধর মশায়ের সঙ্গে। ফুলডুংরিতে গিয়ে বসেচি, কালো মত সেই শীল বাংলার লোকটা এল। To be plagued thus by an undeveloped being—কি করি, ভাবনা দূর হল। তাকে কৌশলে বিদায় দিয়ে একটা বাড়ির রোয়াকে এসে বসি কলোনিতে। তারপর বসি মাঠে। জ্যোৎস্না অনন্ত আমার সামনে। আকাশে তারা জ্বলচে অসংখ্য। ইসমাইলপুরের মতো সোঁদা গন্ধ মাটিতে। বহুদূর Space—সত্যি, এরকম দেখার তুলনা নেই। মন একেবারে ভগবানের অসীমতা চিন্তা করে তাঁতেই নিবদ্ধ হয়ে যায়।

কদিন কেবলই মনে হচ্চে বামিয়াবুরু Rest House-এর কথা। চিন্তা করচি মিতে ও মন্মথদা ও যতীনদাকে যদি এখানে আনতে পারতুম।

নুটু বাড়ি নেই। রাঁচী গিয়েচে।

আজ দুপুরে ভীষণ মেঘ ও বৃষ্টি। তপেন ও মুকুল তখন বসে। ওদের ছাতা দিলুম।

১৩ই জানুয়ারি, ১৯৪৩। ২৮শে পৌষ, ১৩৪৯। বুধবার।

সকালে দ্বিজুবাবুর বাড়ি বসে গল্প করি। বিকেলে ভটচাজ সাহেবের বাড়ি যাই উমা ও বেলুকে নিয়ে। উমা ও বেলু ওপারে গেল তিনু ঝরনার মুখে। অনেকক্ষণ গল্প করে ও রেকর্ড বাজিয়ে গুঁপো গোপালের সঙ্গে ফিরি সোজাপথে। নুটু বাড়ি নেই—রাঁচী গিয়েচে।

তার আগে—গুটকের সঙ্গে ঘাটশিলা হাটে গিয়েছিলুম। এই প্রথম—ওখানে আর কখনো যাইনি।

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৪৩। ২৯শে পৌষ, ১৩৪৯। বৃহস্পতিবার।

সকালে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি একখানা মোটর এসে দাঁড়াল। আতাগাছের কাছে। নুটু এল—কল্যাণী দরজা খুলে দিলে। ওর মুখে রাঁচীভ্রমণের গল্প শুনি। দ্বিজুবাবুর বাড়ি যাই। বৈকালে আবার ফুলডুংরি যাই—এবার একা। আবার অনেকক্ষণ বসি জ্যোৎস্নারাত্রে। প্রথমে সেই অশ্বত্থগাছটার কাছে—তারপর বাণী রায়ের বাড়ির পেছনে। ফিরবার পথে রাজেন গাঙ্গুলীর বাড়ি বসে ওর মুখে ওর বড় ভাইয়ের অদ্ভুত adventure-এর কথা শুনি। প্যাডিংটন স্টেশনে স্টেশন মাস্টার ছিল। রাত দশটায় নুটুর সাথে জঙ্গলের গল্প করি। আজও বামিয়াবুরু জঙ্গলে মিতে ও মন্মথদা ও যতীনদাকে নিয়ে গিয়েচি—এই কল্পনা করচি অনেকক্ষণ ধরে। বনগাঁ থেকে বেরিয়ে ?এলুম। সৈদপা rest house-এ যতীনদা যেমন গাড়ি এসেচে অমনি দাঁত কিড়িমিড়ি করে বল্লে—আসুক দিকি, অন্য কারো ?অপূর্ব জ্যোৎস্না।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৪৩। ১লা মাঘ, ১৩৪৯। শুক্রবার।

সকালে উঠে ভীষণ মেঘ। চা খেয়ে অমরবাবুর বাড়ি বেড়াতে যাই। পথে বাটার জুতারদোকান গেলুম দেখে। অমরবাবু খুব খাবার খাওয়ালেন। ফিরবার পথে ডাক্তারখানায় এলুম। বাড়ি এসে স্নান করে Spirit teaching পড়ি। উমা ও বেলুকে নিয়ে বেড়াতে গেলুম আশ্রমে। খুব জ্যোৎস্না। সেখান থেকে মুকুল চক্কত্তির বাড়ি। ময়ূরভঞ্জ থেকে তার বন্ধু ফিরেচে—সেই গল্প করছিল। ফিরে এলুম বাঁধের ধার দিয়ে।

১৬ই জানুয়ারি, ১৯৪৩। ২রা মাঘ, ১৩৪৯। শনিবার।

সকালে দ্বিজুবাবুর গল্প করি। বিকেলে এঁদেলবেড়ার শালবনে ridge টার ওপরে গিয়ে ২৷৷০ ঘণ্টা কাল বসি—জ্যোৎস্না ওঠা পর্যন্ত। বড় চমৎকার স্থান। ভগবানের কথা ভেবে কতক্ষণ সেখানে বসেছিলুম। দুদিকে শ্যামল পাহাড়, ঘন বনভূমির মধ্যে সাদা পাথরের স্তূপে বসে আছি—এত সুন্দর লাগে ! সূর্য অস্ত গেল—ধীরে ধীরে বহু বিহঙ্গের কলকাকলীর মধ্যে সন্ধ্যা নেমে এল—ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে ক্রমশ স্পষ্টতর হল—গাছপালা, পাথর অদ্ভুত দেখাতে লাগল। উঠে এলুম বাণী রায়দের বাড়ি। ভগবান অদ্ভুত আর্টিস্ট বটে। কল্যাণী বললে—আমায় মন (?) তাবিজ, আরএকখানা বেনারসী শাড়ি। কি সময় ! ভগবান যদি আমায় দেন, বড় ভালো হয়।

১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪৩। ৩রা মাঘ, ১৩৪৯। রবিবার।

সকালে আবার দ্বিজুবাবুর বাড়ি। খুব বসে পড়ি World of Souls. মনে মনে খুব আনন্দ—কাল শালবনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা থেকে। আজও বেলু ও উমাকে সেই শালবনে নিয়ে গেলুম অনেকদূরে। আজ ridgeটা ভালো করে explore করলুম। চমৎকার লাগে। আবার পাখির গান—আবার শ্যামল বনস্পতিদলের ভিড়। ওখান থেকে বেলুদের পৌঁছে দিয়ে ফিরলুম রাজেন গাঙ্গুলীর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে। নিয়োগী, পিনাক প্রভৃতি উপস্থিত। রাত দশটায় ফিরি।

কল্যাণী বল্লে—তুমি বললে শাড়ি কেনার জন্যে। আমার বড় মন—তাবিজ আর শাড়ি। কি মজা ! দেবে তো ?

১৮ই জানুয়ারি, ১৯৪৩। ৪ঠা মাঘ, ১৩৪৯। সোমবার।

আজ বিকেলে World of Souls ও Modern Review-র সেই ছেঁড়া পাতাটা যাতে (?) এর বন্ধু Spirit-এর কথা আছে—বসে পড়বো ভাবচি—দ্বিজুবাবু বলে পাঠালেন ভট্চাজ সাহেবের মোটরে গালুডি যাবো। গেলুম। কি চমৎকার বিকেলের শোভা ! ওদের ছাদ থেকে কালাঝোরের ওপরকার আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখা যাচ্চে—আমি মডার্ন রিভিউর সেই

ছেঁড়া পাতাখানা পড়চি—এমন সময় ভট্‌চাজ ও দ্বিজু ছাদে উঠে এল। চারিদিকের সুন্দর Space-এর স্বপ্ন ভেঙে গেল। অমির কথা আজ বেশি কিছু হল না। মোটরে ফিরে এলুম।

না, আজ গরুর গাড়ি করে গালুডি গেলুম। রেখা-দ্বিজু-বেলুকে নিয়ে রাত্রে এক গাড়ি মিলিটারিদের মধ্যে দিয়ে ফিরি।

১৯শে জানুয়ারি, ১৯৪৩। ৫ই মাঘ, ১৩৪৯। মঙ্গলবার।

তারপর আজ দ্বিজুবাবু আবার বলে পাঠালেন ভট্‌চাজ সাহেবের গাড়িতে গালুডি যাবেন [—] তাই গেলুম এবং আগের দিনের সব ঘটনা আজকে ঘটল। আগের দিন গরুর গাড়িতে গালুডি গিয়ে দেখি নীরদবাবুরা নেই। অমি ও দ্বিজুকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েচে। তারা এল, জ্যোৎস্নারাত। নীরদবাবু বল্লে—রেখা আপনার নামে বলেচে আপনি নাকি আমাকে এই কথা বলেচেন। অনেক রাত্রে মিলিটারি ট্রেনে ফিরি। তারা সিগারেট দিলে। একজন বলেন, তুমি ইংলন্ডে গিছলে ?

২০শে জানুয়ারি, ১৯৪৩। ৬ই মাঘ, ১৩৪৯। বুধবার।

আজ সত্য চক্কত্তি (শিবরামের ভাই[)] এল আমার বাড়ি। চা খেয়ে গল্প করলে। আমি আজএঁদেলবেড়ার শালবনে শাদা পাথরের ridge-এ বসে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করলেম। একদিকে চাঁদ ও দুটি নক্ষত্র, বিস্তীর্ণ শালবন, পাহাড়শ্রেণী দূরে—ভগবানের অসীম মহিমা ও তাঁর সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে বিশ্বের সেই তরুণী girl-spirit (অন্য জগতের জীব)-এর কথা পড়ি সেখানে বসেই—কি যে সে অপূর্ব ভাব—তার তুলনা হয় না। মানুষ যেন কতকালের জীব—২॥০[হাজার বিছর] আগের মানুষ যদি আজ তরুণী হয়ে দেখা দিতে পারে, তবে কোনো মানুষই তো মরে না ! ভগবান কি বিচিত্র ও মহান সৌন্দর্যস্রষ্টা—যে এই শালবন, পাহাড় ও সাদা পাথরের ridge-এর আসন—এই দেখবার পিপাসা ছিল—তাঁর সৌন্দর্যসৃষ্টি আমাকে তিনি দেখালেন। [—] দেখিয়ে তিনি খুসি বা তৃপ্তি পেলেন—একজনও with a trained sense of beauty তাকে তিনি দয়া করে এই কাছেই বাড়ি করে দিয়েচেন। কি বিরাট ! কি মহান তিনি ! ওপরে চাঁদ হাঁসচে [হাসচে]—জ্যোৎস্নায় ভেসে গিয়েচে শালবন। শাদা পাহাড় ঝকঝক করচে। আমি ভাবচি quartz-এর এমনি একটা বড় ridge ভেঙে যদি লাখ টাকাও পেতুম—আমি তা নিতুম না। এইসব ভেবে রাত নটা পর্যন্ত একা বসে ফিরে এলুম সত্য চক্কত্তির বাসায়। সে নেই।

২১শে জানুয়ারি, ১৯৪৩। ৭ই মাঘ, ১৩৪৯। বৃহস্পতিবার।

এদিন শরীর ভালো ছিল না সকাল থেকে। তা সত্ত্বেও বেলুকে দিয়ে ভাত আনিয়ে খেলুম। কল্যাণী তখন ঘাটে। দ্বিজুবাবু এসে বল্লে—চলুন নবাবের গাড়িতে গালুডি যাব। গেলুম। গিয়ে দেখি কেউ নেই বাড়ি। রেখা মোটর করে ডাকতে গেল কিন্তু নীরদবাবু ফিরে এলেন—আমাদের নিয়ে গেলেন। অমি দ্বিজু picnic করচে। জ্যোৎস্না-পূর্ণিমা। পূর্ণচন্দ্র উঠচে। আমাদের খাবার খুব দিলে। অমির গল্প বলতে নীরদবাবু উন্মাদ। মোহিনীবাবুও ছিল। রাত নটা পর্যন্ত সুবর্ণরেখার তীরে যাপন (?) করে ফিরি। বাড়িতে আবার চা খেলুম। তারপরে বসে নবাব, দ্বিজু, নীরদ আমি গল্প করি—পরে মোটরে উঠে গালুডি ফিরি।

২২শে জানুয়ারি, ১৯৪৩। ৮ই মাঘ, ১৩৪৯। শুক্রবার।

বৃষ্টি। খিচুড়ি খাই দুপুরে। জ্বর ভীষণ এল দুপুরের পরে।

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৪৩। ৯ই মাঘ, ১৩৪৯। শনিবার।

জ্বর একটু কম। গল্পের বই পড়ি।

২৪শে জানুয়ারি, ১৯৪৩। ১০ই মাঘ, ১৩৪৯। রবিবার।

আজ অনেকে দেখা করতে এল—গুঁপো গোপাল, তপেন, মুকুল, রেখা, দ্বিজু, শচীন। আজ ছিলাম ভালো দিনে। রাত্রে ভীষণ জ্বর। ৩—৩ ॥০।ভগবানকে বললুম—ভগবান আমার অসুখসারিয়ে দাও। ছটফট করচি তখন জ্বরে।

২৫শে জানুয়ারি, ১৯৪৩।১১ই মাঘ, ১৩৪৯। সোমবার।

সকালে একটু জ্বর। দুধ খেলুম। বিকেলে মুকুল ও তার সঙ্গে দুই মহিলা দেখা করতে এলেন। আজ কল্যাণীকে কত গল্প বলুম (বললুম) সন্ধ্যায়। যোগিন সিং-এর চিঠি এল।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪৩। ১২ই মাঘ, ১৩৪৯। মঙ্গলবার।

ধরের সঙ্গে বসে ধর্মচর্চা করি। আজও কিছু খাইনি। মেঘ ও বৃষ্টি।

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৪৩। ১৩ই মাঘ, ১৩৪৯। বুধবার।

অন্নপথ্য করি। বৈকালে নদীর ধারে পাথরের ওপর গিয়ে একটু বসি। মেঘ ও বৃষ্টি।

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৪৩। ১৪ই মাঘ, ১৩৪৯। বৃহস্পতিবার।

আজ শরীরে একটু বল পেয়েছি। ভাত খেয়ে কোথাও বেরুই নি। দ্বিজুবাবুর বাড়ি গেলুম। মেঘ ও বৃষ্টি। মুকুলের বাড়ির মেয়েরা এল বেড়াতে। রাঁচী থাকে, এক বিধবা বোন।

২৯শে জানুয়ারি, ১৯৪৩। ১৫ই মাঘ, ১৩৪৯। শুক্রবার।

কল্যাণী কত গল্প করলে। আজ শরীর বেশ ভালো। স্নান করলুম। মেঘ ও বৃষ্টি।

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪৩। ১৬ই মাঘ, ১৩৪৯। শনিবার।

আজ সকালে দ্বিজুবাবু নেমন্তন্ন করলে। খিচুড়ি খেলুম কেষ্ট ও আমি, রেখা। বৈকালে নদীর ধারে সামান্য বেড়াই। সন্ধ্যায় ওভারসিয়ারের সঙ্গে বসে গল্প করি। মেঘবৃষ্টি আজ ফর্সা হল।

৩১শে জানুয়ারি, ১৯৪৩। ১৫ই মাঘ, ১৩৪৯। রবিবার।

আজ সকালে স্নান করচি—যোগীন সিং এল রাখা মাইন্‌স্ থেকে। খেলে ও "চৌঘাট মে জড়ি ?—তলহাস্তি পর ঝুঁকা হুঁয়ে" ওর গল্প পড়লে। আমি কাল কলকাতা যাবো। কাল যাবো কলকাতায়, বারাকপুরে, বনগাঁ।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ১৮ই মাঘ, ১৩৪৯। সোমবার। কলিকাতা

শেষরাত্রে উঠে তৈরি হয়ে বার হই, কল্যাণী, বেলু, গুটকে—গরুর গাড়িতে। ঝাড়গ্রামে শ্বশুরমশাই স্টেশনে ছিলেন। কলকাতায় নেমে সোজা সুরেশবাবুর প্রেসে। রমেশবাবু বল্লেন, সুরেন গাঙ্গুলি এসেচেন ভাগলপুর থেকে। বুদ্ধদেব রাজপুরে। এলুম মিত্র ও ঘোষ, অপূর্ব M.C. ও D.M.-তে। গিরিন নেই এখানে। হাওড়া থেকে নামচি, সুধীর হাজরার সঙ্গে দেখা (রাইপুর থেকে আসচে, H. C. Hazra Lime Merchant, Rajpur C.P.—এই হল ওদের ঠিকানা)।

যাবার সময় খড়কপুরে মহাদেব রায় খাওয়ালে। আমার সাথে গেল হাওড়া পর্যন্ত। নতুন ট্রাম খুলেচে নতুন হাওড়া পুলের ওপরে। সোনার কলকাতা। রাত্রে সাতু কাকার বাসায় এলুম। তাঁর মুখে শুনলুম সুরেন নেই কলকাতায়। পাঁচী এখানে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিল, পাঁচীর বাড়ির সামনে মিটিং হয়েছিল—এই সব গল্প। কেষ্ট (হাজারি রায়ের ছেলে, সাতবেড়ের) এখানে রাঁধে।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ১৯শে মাঘ, ১৩৪৯। মঙ্গলবার।

সকালে স্নান করেই বার হয়ে গোপালবাবুর বাসায়। সুপ্রভা মিরাশি ফিরেচে সেখানে শুনি। তারপর থ্যাকার্সের দোকানে গিয়ে সেই বৃদ্ধ সাহেবকে বলি আমি তোমার পুরোনো খদ্দের। Spiritualism-এর বই পড়ি। একজন Spirit বলচে—"Round the earth there is a miasma of desire"—সেজন্যে পৃথিবীতে যেতে পারিনে। মানুষের Spirit body-র সঙ্গে কি ভাবে স্থূল শরীরের Umbilical cord দিয়ে যোগ করা থাকে, সে কথা বলচে। পুরোনো দিনের মতো বসে বই পড়ি থ্যাকার্সের দোকানে। ভগবানের প্রতি বিরাট আস্থা ও ভক্তি নিয়ে ফিরি কার্জন পার্কের পাশ দিয়ে। সে কথা কার কাছে বলি ?মিত্র ও ঘোষে এলুম। আবার D.M. [—] মহাদেব রায়কে নিয়ে। সজনীর বাড়ি। প্রমথ বিশী এল। সজনী বল্লে—তোমার লেখা ছাপাবো না, বনফুলের ছাপাবো না, তারাশঙ্করের ছাপাবো না—তবে কাদের নিয়ে আমার কাগজ চলবে ?মহাদেব রায়কে বিদায় দিয়ে চলি। পটুয়াটোলা একটা পাইস্ হোটেলে ভাত খাই পুরোনো দিনের মতো। তারপর এলুম সুরেশবাবুর প্রেসে। সুরেন গাঙ্গুলী ও বুদ্ধদেব বসে। সুরেনবাবু ?ভারতীতে ছিলেন। মন হয়েছে খুব। চণ্ডী রায় সাহেব হয়েছে। হেমেন ভাগলপুরেই। যতীনবাবুর মেয়ে ও স্ত্রী ভাগলপুরেই। বুদ্ধদেবের বাড়ি যাবো বলে সুরেন গাঙ্গুলীকে ফাঁকি দিয়ে দুজনে বেরুই। ৬-১০-এর ট্রেনে গড়িয়ায়নামি। অনেক নতুন বাড়ি হয়েচে। পরের ট্রেনে রাজপুরে। কতকালের দিনের জীবন যেন। এই রাজপুরে কতকাল আগে ১৯২০ সালে মাস্টারি করতে আসি। অন্নপূর্ণার বাড়ি গিয়ে

দুজনে চা খাই। সত্য মজুমদারের ডোবার ধারে পাইখানাটা তেমনি আছে। বুদ্ধদেবের বাড়ি এসে সারারাত গল্প। বড় শীত। মৃত্যুঞ্জয়কে ও ডেকে আলো ধরে দিয়ে যায়। রামনারায়ণ জনাই আছে।

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ২০শে মাঘ, ১৩৪৯। বুধবার।

সকালে উঠে সেওড়ার দাঁতন করে মুখ ধুই। বুদ্ধদেব আমার সঙ্গে এল। মা যেখানে মারা গিয়েছিলেন, সেই নগেন ভাদুড়ীর বাড়ি। সেখানকার মাটি মাথায় দিই। মৃত্যুঞ্জয় আপিসে বেরুচ্চে। পুরোনো দিনের মতো জীবন চলচে এখানে। ২০ বছর আগেও যেমনি এখনো তেমনি। খুব গাছপালা। অন্নপূর্ণার বাড়ির সামনে খগেন ও আমার ছাত্র ধীরেন (মহেন্দ্র চক্কত্তির ছেলে, যাদের বাড়ি খেতুম) এসে আলাপ করলে। শুনলুম ধীরেনের মা এখন আছেন। ফুলিদের বাড়ি চা খাই, মাথা ধুই। ফুলির ছেলেরা ঝগড়া করচে। বড় ছেলে ব্রুক্ বন্ডের প্যাকেট কাঁধে—রাত ৪টাতে উঠে যায়। সেই সত্য মজুমদারের বাড়ি। এখানে 'উপেক্ষিতা' লিখি। বহু পুরোনো দিনের কাহিনী এঁর বাঁশবনে লেখা।—বলে এক নার্সের সঙ্গে ব্যাপার চলচে। খেয়ে ননীর শ্বশুরবাড়ি এসে শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করি। তার আগে কানাই-এর স্ত্রী বলেচে বিভূতিবাবুর মতো কে একজন যাচ্চে। ২৩ বছর পরে ননীর শাশুড়ি ওই বাড়িতে সংসার করচে এই বোমার ভয়ে। আমি তা দেখলুম আবার। বিরাট nterval [I] চলে আসি কলকাতায়। মিত্র ও ঘোষ। অপূর্বাববু। শক্তিপদর বাড়ি ও ছাত্রের বাড়ি। D.M.-এর দোকান। মিতের মেস্। সাতুকাকার বাসায় এসে শুনি মিতে এসেছিল। সাতুকাকা পুরোনো বারাকপুরের গল্প করেন। চালতেতলায় বাড়ি। ফটিক বাঁড়ুয্যে আবাদ কাটিয়েছিলেন। ২০, শ্রীগোপাল মল্লিকের লেনে ঠাকুরবাড়ি বসি। এই ঠাকুরবাড়িতে আর ঢুকিনি ১৯১৯ সালের পরে। সেই আর এই। গৌরীর শোকভারনত দিনগুলি। এখন আমি আর সেই আমি। ভগবান তুমি ধন্য।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ২১শে মাঘ, ১৩৪৯। বৃহস্পতিবার।

ভোরে এল মিতে। তাকে নিয়ে D.M. ও জগত্তারণবাবুর বাসা। D.M. লুচি ও চা খাওয়ালে। আমরা দুজনে খেয়ে বেরুই। অরবিন্দ দত্তের সঙ্গে দেখা। অরবিন্দ টেনে নিয়ে গেল সন্তাগার ক্লাবে। সেখানে কিরণ রায়, সুধাংশু, পরিমল গোস্বামী, অরবিন্দ দত্ত—সেই পুরোনো দিনের মতো। অরবিন্দ বলে—সন্তাগার স্কীমের আড়ৎ। সুশীল রায় নিমন্ত্রণ করলে। পরিমল একখানা বই দিলে। ওখান থেকে বার হয়ে লাইট হাউসে'This aloma all' দেখলুম। ট্যাঙ্ক যুদ্ধটা ভালো লাগল— টিউনিসিয়ার ট্যাঙ্ক যুদ্ধ। নিউ মার্কেটের বইয়ের দোকানে বেরিয়ে ট্রামে মিত্র ও ঘোষ। পথে শক্তিপদ রাজগুরু টেনে নিয়ে এল ওর মেসে। রবীন এল। রাত্রে সেখানে খেয়ে শুই।

২০, শ্রীগোপাল মল্লিকের লেনে ১৯১৯ সালের পরে আবার কাল যাই। ভগবান জীবনকে কি ভীমবেগে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্চেন ! কীর্তন হচ্চে। বসে বসে ভাবলুম—জাঙ্গিপাড়া, সতীশ, রাজপুর, ফুলি, Cow Protection, বিভূতি, ভাগলপুর, ক্লারিজ, সুপ্রভা, খুকু, রেণু, কল্যাণী—ঘাটশিলা—বামিয়াবুরু—চৌঘাট মে জড়ি...জীবনের কি সব অপূর্ব পরিবর্তন ! ভগবানের ঐ নক্ষত্রভরা আকাশ যেমন মহান, জীবনও তেমনি। তাঁর জয় হোক, গৌরীর স্বর্গ অক্ষয় হোক।

রমাপ্রসন্ন চাকদহে বাসা করেছে বোমার পরে।

৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ২২শে মাঘ, ১৩৪৯। শুক্রবার।

ভোরে উঠে চা খেয়ে মিতের মেসে আসচি, পরমপ্রিয় ও সুপরিচিত গলিপথ দিয়ে—কানাই সাহার সঙ্গে দেখা। কানাইও আমি কৃষ্ণধনের বাড়ি। কৃষ্ণধন নাকি হাঁসপাতালে (হাসপাতালে)। তখনি সাতুকাকার বাসায় এলুম। সুশীলবাবু এসে 'পথের পাঁচালী'র নোটস্ নিয়ে গেল। আমি খেয়েবার হয়ে শুনি নুটু এসেছিল। নুটুর সঙ্গে দেখা করব বলে বসে থাকি। সরোজবাবু যাচ্চে—আমাদের স্কুলের মাস্টার সরোজ। তাকে ডাকি, সে এল—গল্প করি। বলে—চলে যাচ্চে একরকম। সেই উদ্ধত সরোজের আজ কি অবস্থা ! নুটু এল, চা খেয়েই চলে গেল (—) বম্বে মেল ধরে ঘাটশিলা যাবে। আমি টাকা এনেচি সুরেশের বাসা থেকে। রবীন এল। জুতো ও শাড়ি কিনে রমেশ কবিরাজের বাসায়। রমেশবাবু 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' ও 'আরণ্যক'-এর উচ্চসিত (উচ্ছ্বসিত) প্রশংসা করলে। কালিদাস রায়ের সঙ্গে দেখা। ওখান থেকে বরেন্দ্র লাইব্রেরিতে ক্ষুদিরাম বোস ও দক্ষিণাবাবুর ছেলে ও উত্তরপাড়ার শান্তির সঙ্গে দেখা। সাতুকাকার বাসায় এলুম। পাঁচী বসে। পাঁচী বল্লে সুরেন ডাক্তার হরিপদকাকাকে কত অপমান করেচে। নিজে মনো রায়ের বাড়ি মদ খেয়ে রাত চারটার সময় হল্লা করেচে।

বারাকপুরে গেলুম না। রবীন চলে গেল। ট্রামে রবীনের বাসায় সন্ধ্যায়। রবীনের মা বল্লে পাঠিয়ে দেবো এখন। রবীন এল, তখন পাঁচী বসে গল্প করচে। আহা গ্রামের মেয়ে ! কতকাল পরে গ্রামের কথা।

সাতুকাকা বল্লেন বেণী রায় ও রাখাল রায় বেতকাশীর আবাদে গিয়েছিল। হরিশ বাঁড়ুয্যে Diat Inspector হয়েছিলেন। হরি বাঁড়ুয্যে ও বদ্যিনাথ রায়কে তিনি বরাকরে নিয়ে গিয়েছিলেন কয়লার খনিতে। নেপাল মাঝির বাড়ি ছিল তাঁর বাড়ির পাশে। বাক্স বাক্স টাকা বয়ে নিয়ে যায় তাঁর স্ত্রী। নতুন বাড়িতে। ভাতীর বলে সেই বৌটির হত্যার কথা ওঠে। হরিশ বাঁড়ুয্যে সাহায্য করেন বলে দুধ খেয়েছিলেন আর চাল। রাত্রেও যাই। পাঁচী গল্প করে। রবীন রাত ন'টায় গেল।

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ২৩শে মাঘ, ১৩৪৯। শনিবার। ঝাড়গ্রাম ও কলিকাতা

সকালে মিতে এল। তার সঙ্গে গল্প। সে ঝাড়গ্রামে যাবে। অবনী চিঠি দিলে নুটুকে। রবীন ও আমি বাসে হাওড়া। খড়্গপুর প্যাসেঞ্জারে ঝাড়গ্রাম। ঝাড়গ্রাম নেমে সাইকেল রিক্সা করে বাসা। কল্যাণী আমায় দেখে খুব খুশি। কোথাও বেরুই না।

কাল একটি যুবককে বাসে বসবার স্থান দিয়ে তাঁর প্রতি কি স্নেহ ! ভগবানের বয়স কত ! তিনিও আমাদের এইমতো স্নেহ করেন। কি অপূর্ব অনুভূতি হল বাস থেকে নেমে সন্ধ্যাবেলা। ভগবানের প্রতি কি প্রেম ! সত্যিই তিনি প্রেমময়। অনন্ত তারাভরা আকাশ—আর তাঁর গভীর বাণী অন্তরে যেন অনুভব করায় অসহনীয় আনন্দ ও মত্ততা। এমন মুহূর্ত জীবনে কটা আসে ?

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ২৪শে মাঘ, ১৩৪৯। রবিবার। ঝাড়গ্রাম

সকালে উঠে বাদু ও চুনীবাবুর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ি। প্রেমেন্দ্র নেই এখানে। বাদুকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে কতদূর বেড়াতে গেলুম। রাজবাড়ির পুকুরে স্নান করি। বৈকালে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে যাবো বলে ভাবি (—) বারাকপুরে এইরকম পাম-প্যাভিলিয়ন করে দেবো। রাত্রে ভূতের গল্প করি। কল্যাণীর সঙ্গে কত গল্প। ও ভগবানের আর এক দান। বড় শীত আজ।

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ২৫শে মাঘ, ১৩৪৯। সোমবার।

আজ সকালে বাণী ভবনের পথে কতদূর বেড়াতে গেলুম। বেশ বন। রাত্রে কল্যাণী বলে—আমার একটা যদি খোকা থাকত। তোমার কোলে মাথা রেখে যেন মরি। বিকেলে রাজবাড়ির পথটা দিয়ে কতদূর বেড়াতে গেলুম। কুলাচুনি (?) বলে একটা গ্রামে।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ২৬শে মাঘ, ১৩৪৯। মঙ্গলবার।

সকালে শালবনে বেড়িয়ে এলুম রাজবাড়ির সামনের পথে। বড় শীত। আজ সরস্বতী পূজা। অঞ্জলি দিলুম সবাই মিলে। বিকেলে স্কুলে ঠাকুর দেখতে গিয়ে এক মৌলবীর সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে বাজারে গেলুম। কান্তিবাবু বনগাঁয়ে Subregistrar—তাঁর ওখানে বসে কতক্ষণ গল্প করি।

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ২৭শে মাঘ, ১৩৪৯। বুধবার।

আজ সকালে উঠে বাণী ভবনের পথে বাদু ও শুবুকে নিয়ে ঘুরে এলুম। বৈকালে কল্যাণী ও খোকা স্টেশনে এল তুলে দিতে। কল্যাণী কতক্ষণ চেয়ে রইল। ট্রেনে চলে এলুম। বেশ লাগল অনেকদিন পরে। নুটুর ডাক্তারখানায় বাণী মায়ের ভাই সুশীলবাবু (—) আরো অনেক লোক। ব্রাউন সাহেব আমার সঙ্গে আলাপ করলে। বাড়ি এলুম সন্ধ্যাবেলা। নুটুর সঙ্গে কলকাতার গল্প।

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ২৮শে মাঘ, ১৩৪৯। বৃহস্পতিবার। ঘাটশিলা

সকালে বড় ভালো লাগল। সন্তোষবাবুকে নিয়ে বনের দিকে বেড়াতে গেলুম। মি. সিংহের কোনো দেখা নেই। সন্তোষবাবুকে নিয়ে এঁদেলবেড়া শালবন ও ridge টাতে বেড়িয়ে এলুম।

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩২৯শে মাঘ, ১৩৪৯। শুক্রবার।

আজ বৈকালে বঙ্কিমবাবুর বাড়ি যাব বলে বেরুই। ব্রাউন সাহেবের বাড়ি—ফর্নিচার দেখি। কতরকমের চেয়ার। ওখান থেকে এলুম বঙ্কিমবাবুর বাড়ি। তিনি মোটরে আমাদের বাড়ি এলেন—কত গল্প।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ১লা ফাল্গুন, ১৩৪৯। শনিবার।

আজ সকালে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি। বৈকালে নিজে একা ফুলডুংরির ওপারে শালবনে বেড়াতে গেলুম। অপূর্ব বনভূমি। অসংখ্য বেড়ানোর জায়গা। জ্যোৎস্না উঠল। তিনুর সঙ্গে যে ridge টাতে গিয়েছিলুম—সেটা দিয়ে পার হয়ে চলে এলুম। আবার ভগবানের কথা ভাবি একজায়গায় রোয়াকে বসে ও ম্যাঙ্গানিজ কোম্পানির ভাঙা রোয়াকে বসে। অসংখ্য তারাভরা আকাশ—অনন্ত বিশ্ব, প্রেম, অবিনশ্বর প্রেম—অপূর্ব জ্যোৎস্না—বনভূমি, শৈলশ্রেণী, সুখেদুঃখে ভরা অনন্ত জীবন বহুযুগব্যাপী—সামনে ও পিছনে। ভগবানকে ধন্যবাদ।

ননীকে চিঠি লিখি আসতে। সাঁৎরাগাছির ননী।

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ২রা ফাল্গুন, ১৩৪৯। রবিবার।

রবিবার সকালে দ্বিজুবাবুর বাড়ি। বৈকালে প্রথমে গেলুম কালকার ridgeটাতে। তারপর বামুনডি গ্রাম পার হয়ে আরো কতদূর যাই। ডুংরি, উঁচুনীচু ঢিবি—পাথর ছড়ানো শালবন। এক জায়গায় কুল কুড়ুচ্চে চুনুডির কয়েকটি উড়িয়াবাসী। তারা কুল দিলে। তারপর একটা পাথরের ওপর ধানক্ষেতের সামনে গিয়ে বসি। সামনে বুরুডির পাহাড়। সেখানে কতক্ষণ বসে তারপর বনের মধ্যে দিয়ে দিয়ে ফিরি। একস্থানে একটা সঙ্গীহীন কেঁদগাছ—দূরে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির শিখরটা। একটু পরে জ্যোৎস্না উঠল—হঠাৎ শালবনের রূপ গেল বদলে। একটা ডোবায় একটু জল চাঁদের আলোয় চিকচিক করচে। ঘুরতে ঘুরতে ওপরপাড়া গ্রামেরমধ্যে দিয়ে ফিরবার সময় মনে হল সিনেমায় দৃষ্ট আফ্রিকার কোনো অজানা বন্য গ্রাম দিয়ে ফিরচি। মাদল বাজার সঙ্গে সে কথা মনে নিয়ে এল। জ্যোৎস্না উঠেচে, বড় বড় গাছ, বড় বড় পাথর। দূরে দেখি ফুলডুংরি দেখা যাচ্চে—একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে তার মাথায়। একটা শাদা পাথরে বিড়ি ধরালুম। তারপর ফিরে এসে কলোনির রাস্তা (Colony Road) পেলুম—বাড়ি।

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ৩রা ফাল্গুন, ১৩৪৯। সোমবার।

(এদিন ভট্চায সাহেবের বাড়ি গিয়েছিলুম বিকেলে আমি আর নুটু। বড্ড বৃষ্টি। বড্ড ভিজি। রাত ১১টায় ভিজতে ভিজতে বাড়ি আসি) এ ডায়েরিটা আগামী কালের হবে।

এদিন ধরমশায় তামাক সেজে নিয়ে এলেন দুপুরে। গল্প করি। (এ ডায়েরিটা আগের দিন লেখা হয়েচে) কাল বৃষ্টি হওয়ায় সর্বত্র জল বেধেচে।

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৪৯। মঙ্গলবার।

আজ দ্বিজু, বাদু ও রেখা, বালির সঙ্গে বনভ্রমণে গেলুম। আফ্রিকা ভ্রমণকারী কল্পনা করে অনেকরাত্রি পর্যন্ত শালবনে খেয়েদেয়ে বেশ আনন্দ করা গেল। বালি কেবল বলে—চলো দিদি বাড়ি যাই ! এত রাগ হয় ওর ওপর !

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ৫ই ফাল্গুন, ১৩৪৯। বুধবার।

আজও শালবনে বেড়াতে বেড়াতে কাশিডার রাস্তা ধরলুম। অপূর্ব সৌন্দর্য বনভূমির। নতুন জুতো বড় লাগচে। অমরবাবুর বাড়ি এসে অনেক গল্প করি। সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ৬ই ফাল্গুন, ১৩৪৯। বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে মি. সিংহের চিঠি এল ও সুবোধবাবুর। বিকেলে নুটুর সঙ্গে মোটর সাইকেলের পেছনে বসে চন্দ্ররেখা গ্রামের মধ্যে দিয়ে সুবর্ণরেখার পুল পর্যন্ত বেড়াতে গেলুম। কতক্ষণ নদীর ধারে বসলুম। নতুন অনুভূতি (—) জীবনে এই প্রথম মোটর সাইকেল, সেই Harley Davidson Machine চড়ি। বহুকাল থেকে সখ ছিল চড়ার। জ্যোৎস্নারাত্রে শালবনের ridge-টাতে বসে ভগবানের কথা চিন্তা করি। কল্যাণীকে তিনি দিয়েচেন, তাঁর অপূর্ব দান। কি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাতারার রূপ, শালগাছের ডালের ফাঁকে, অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত্রে সুদূর আকাশে পরিদৃশ্যমান। পথের ওপর জ্যোৎস্না পড়া চকচকে শালের শাখাপ্রশাখার রূপ—যেন কোনো অনাবিষ্কৃত, সুদূর অরণ্যভূমিতে একা বসে আছি জনমানবশূন্য বনের মধ্যে নির্জন রাত্রে ! ফিরে এলুম দ্বিজুবাবুর বাড়ি। রমণীবাবু আজ সকালে আমার বাড়িতে অনেকক্ষণ বসেছিলেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ৭ই ফাল্গুন, ১৩৪৯। শুক্রবার।

ঘাটশিলা {এই ডায়েরি লিখচি লিপুকোচা জঙ্গলে তাঁবুতে বসে} [।] বৈকালে বাইরে ঈষৎ ছায়াভরা পাহাড়ের রেখা [,] বড় বড় গাছ তাঁবুর দোর দিয়ে অদূরে দেখা যাচ্চে।

বিকেলে গেলুম নুটুর ডাক্তারখানায়—কারণ নুটু এল না নরসিংহগড় থেকে। গুট্‌কের সঙ্গে গল্প করে ফুলডুংরি এসে দেখি চুনাবালি টিফিনের বাক্স নিয়ে পাহাড়ে উঠেচে। আমরা পাহাড়ে বসে জ্যোৎস্নারাতে খাবার খেলুম ও গল্প করি। রেখা ঘুগ্‌নি দিয়ে গেল শালপাতায়। আমি বাড়ি এসে দেখি নুটু আসেনি। অনেক রাত্রে প্রায় ১১টায় এসে নুটু ডাকচে দেখি। সে বল্লে, সে ঝাড়গ্রামে গিয়েছিল। মায়াদিকে মোটর সাইকেলে নিয়ে ঘুরে এসেচে কোলাকুলির (?) পথে।

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৯। শনিবার।

ঘাটশিলা (লিপুকোচা তাঁবুতে লিখিত। বৈকাল। [}]

আজ মি. সিংহের আসবার কথা, কিন্তু সকালে এলেন না। বৈকালে ভট্‌চাজ সাহেবের বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়ে দেখি ওখানে এতোয়া (মি. সিংহের আরদালি) দাঁড়িয়ে আছে। নবাব সাহেব ও প্রিন্স কামগার (?) শাহ এলেন। আমরা চা খেয়ে গল্প করে নবাবের গাড়িতে ফিরি ডাকবাংলায়। সিভিল সার্জন ও আরো লোক বসে। সুবোধ ঘোষ ও মি. সিংহ আমাদের বাড়িতে রাত্রে খেয়ে খুব গল্প হল।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ ৯ই ফাল্গুন, ১৩৪৯। রবিবার।

{লিপু কোঁচা তাঁবু} ঘাটশিলা ও বহরাগড়া

সকালে শচীন, গুঁপো গোপাল আরো অনেক লোক। শচীন একটা নাটক পড়ে শোনালে।গুট্‌কে এসে জানালে মি. সিংহ বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রিত—সেই সঙ্গে আমিও। নুটু সকালেই চলে গিয়েছিল ধলভূমগড়। মি. সিংহ গাড়ি নিয়ে এলেন—আমরা গিয়ে জুটলুম বঙ্কিমবাবুর ওখানে। দেখি গিয়ে সুবোধবাবু বসে। বললুম, নুটু কোথায় ?শুনলাম সে তখনো চাকুলিয়া। সিভিল সার্জন, মি. সিংহ, সুবোধবাবু, ইনকামট্যাক্স অফিসার সব্বাই খাই একসঙ্গে। তারপর মোটরে নরসিংহগড় range office-এ এলুম। আজ হাটবার এখানকার গোপালনগরেরও। আবার চলি। চাকুলিয়ায় কলা কেনা হল ২ ডজন। মানসমুড়িয়া পর্যন্ত তার গিয়েচে। বহরাগড়া আমি কখনো আসিনি—শচীন মুস্তফির দাদা এখানে ডাক্তার ছিল। বিস্তীর্ণ মুক্ত উচ্চাবচ ভূমিভাগ ও দূরপ্রসারী দিকচক্রবাল—সুবর্ণরেখার ওপারের ধূসর পর্বতশ্রেণী— সোঁদা সোঁদা রোদপোড়া মাটির গন্ধ। একটা চমৎকার পাহাড় ডাকবাংলা থেকে অনেক দূরেই শুধু কালোbasalt (?)-এর পাহাড়ে মি. সিংহ ও আমি বসে। খুকুর গল্প করি। জ্যোৎস্না উঠল—আজ প্রতিপদ। চাঁদের আলোয় পাহাড়ের রূপ, মুক্তরূপা প্রকৃতির চেহারা গেল বদলে—যেন কোনো ইন্দ্রজালভরা জগতে এসে পড়েচি। আজ গোপালনগরের হাট। পঞ্চা মাস্টার এতক্ষণ গাড়িতে।

{অঙ্গুলে খুব জঙ্গল। Wild animals। কটক থেকে তালচির লাইনে মেরামন্তলি স্টেশন। সেখান থেকে বাস ১৪ মাইল। অঙ্গুল থেকে টিকরপাড়া ঘাট (মহানদীর ওপরে) যেতে খুব অপূর্ব দৃশ্য ও জঙ্গল রাস্তায় পড়ে। ৩৫ মাইল রাস্তা, অঙ্গুল থেকে বাস যায়। মি. সিংহ এ খবর আমায় দিলেন।} লিপুকেচা তাঁবুতে অন্ধকার রাত্রে বসে লিখচি। ৭॥০টা।

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ১০ই ফাল্গুন, ১৩৪৯। সোমবার। বহরাগড় ও ঝাড়গ্রাম

জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফিরচে। এই যেন তুঁততলা স্কুলের কাছে গেল—এই বারাকপুর গলায় দড়ে আমবাগানের সামনে গেল—এইসব ভাবচি। পাহাড় থেকে উঠে বাংলোর বারান্দায় চেয়ারে বসে কল্পনা করলুম যেন গত বৎসরের মতো আমিও চালকীতে ফিরচি ঐ গাড়িতে। কল্যাণী দাঁড়িয়ে আছে আমুদি বাগদীর বাড়ির কাছে। বল্লুম—ও কল্যাণী, আলো নিয়ে এসো। সেই চালকীতে জাহ্নবীর ঘরখানা। মন কেমন করল কল্যাণীর জন্য। জ্যোৎস্নারাত রাত্রি ও সোঁদা রোদ পোড়া মাটির গন্ধ—স্মরণ করিয়ে দেয় ইসমাইলপুরের গন্ধ। আজ মহাত্মাজির খবর ভালো নয়। মন খুবই ভারাক্রান্ত। ভারতের ভাগ্যে কি আছে, কে জানে ?...পরদিন খুব সকালে উঠে বহরাগড়া গ্রামে বেরিয়ে এসে চা খেয়ে দুজনে দুধকুণ্ডী রিজার্ভ ফরেস্ট যাই। তেমন বড় বন নয়—বোগা (Boga Medloa) গাছ পোঁতা হয়েছে। মরুভূমির মতো জমিকে মি. সিংহ চেষ্টা করে অনেক উন্নত করেচেন। বড় বড় লতাভরা জঙ্গল নতুবা অনেক (Combritam Decandrum) শাল ছিল না। বড় রোদ। গাড়োয়ালী বাংলা আছে একটা—খড়ের ঘর, আমগাছের ছায়ায় বসে আমি হঠাৎ বল্লুম ঝাড়গ্রাম কতখানি এখান থেকে ?একজন বল্লে লোধাশোল হয়ে যেতে হয়। ম্যাপে দেখা গেল তাহোলে হয় ত্রিশ মাইল। আমরা এগিয়ে যাই দেখতে। বম্বে

রোড দিয়ে। বিহার ছাড়িয়ে বাংলায় পড়লুম। শালবন, রাঙামাটি—সোজা পথ হুহু করে ছুটচে মোটর। কেঁকো বলে গ্রামে এদিকে ভুইয়ং নদী। পার হয়ে নোদাশৌল (?)যেতে হয়। এক সাঁওতাল স্ত্রীলোক বিচিত্র ভঙ্গিতে বল্লে, নদীতে এক কোমর জল, মোটর পার হবে না। তার কথা না শুনে গিয়ে দেখি জলের ওপর পাথরের বাঁধ দেওয়া। দিব্যি পার হয়ে ঝাড়গ্রাম এলুম। কল্যাণী এসে দেখে খুশি হল। খেয়ে ওদের নিয়ে স্টেশন ছাড়িয়ে বেড়িয়ে আসি মোটরে। মায়াদি, দুনু গান করলে। ফিরে এসে রাত ৮টায় রওনা। কল্যাণী কেবল বলে, উঁহু, হুঁ-উ, রাত্রে থাকো। তা কি করে সম্ভব ?বোঝালুম। রওনা হয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নোদাশোলি—শালবনে চাঁদ উঠল। আজ শুক্লা দ্বিতীয়া। খাড়া মৌদা ও জিঞ্জির বলে দুটো গ্রাম পড়ল পথে। এ গ্রামের লোক সব কি করে তাই ভাবি। জ্যোৎস্নারাতে বাংলায় বসে মি. সিংহ ও আমি কত গল্প করি।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ১১ই ফাল্গুন, ১৩৪৯। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে যাই কেশুরদা বাঁশবন দেখতে। প্রায় ৭৫ বিঘা জমিতে চমৎকার বাঁশের বন—কি চমৎকার ছায়া। কেশুরদা গ্রামে এলুম। পান্ডা বলে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ ভাঙা বাংলা কথা বল্লে। অনেক লোক এসে একটা স্থানীয় মন্দিরে নিয়ে গেল। স্বর্গ বাউরি বলে দেবী, পুরোনো পাথরের মূর্তি ও অনেক প্রাচীন ভাস্কর্য ভাঙা অবস্থায় মন্দিরের আশপাশে পড়ে। বগরাচোরা গ্রামে এলুম ওখান থেকে—উড়িষ্যার প্রভাব এখানে খুব বেশি। লোক যে ভাষা বলে তা উড়িয়া, বাংলা ও সাঁওতালীর এক জগাখিচুড়ি। এখানেও মরুভূমিতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বনানীর শোভা বিকশিত করেচে।

বৈকালে স্থানীয় হাইস্কুল দেখি। হেডমাস্টারকে নিয়ে মোটরে সুবর্ণরেখা পার হয়ে সোজা ওপারে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে সিরসা গ্রামের প্রথম বাড়িতে গেলুম। সুন্দর দৃশ্য সুবর্ণরেখা তীরের। অনেক চওড়া। বিস্তীর্ণ বালুচর। ময়ূরভঞ্জের পাহাড়শ্রেণী ওপারে। ভগবতী প্রসাদ মহান্তি হল সেই প্রথম বাড়ি কর্তা। দিব্যি বাংলা বল্লে, পান এনে দিলে। আমরা ফিরে এসে নদীতীরে সূর্যাস্তের শোভা দেখি। স্কুলে ফিরে এসে ছাত্রসভাতে মি. সিংহ ও আমি বক্তৃতা দিলুম।

মহাত্মাজির অবস্থা আজ খুব খারাপ। মনে যথেষ্ট উদ্বেগ।

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ১২ই ফাল্গুন, ১৩৪৯। বুধবার। লিপুকোচা

সকালে চা খেয়ে বসেচি বহরাগড়া বাংলোতে, একখানা মোটর এসে থামল। ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার মি. গুপ্ত পূর্বেকার মি. গুপ্তের ছোট ভাই। সবাই চা খেয়ে গল্প করে বিদায় নিয়ে বেরুই। সেই কেশুরদা ও বগ্‌রা চোড়া হয়ে মিসেস শর্মার গল্প শুনতে শুনতে কেরুকোঁচার শালবন দিয়ে এলুম। বাঁদিকে দূরে সাদা কোয়ার্টজাইটের পাহাড়, নাম শিররাই—নাকি ওখানে কাইনাইট পাওয়া যায়। কি ঝকঝকে সাদা দেখাচ্চে রোদ লেগে। হাঁ করে চেয়ে রইলুম দ্রুত ধাবমান মোটর থেকে [-] পথে সিন্দুরা ও আসানগুড়ি পাহাড়ি নদী পার হই। নরসিংগড়ে নুটুর সঙ্গে দেখা—পথে। তার সঙ্গে কথা বলে মোটরে এলুম সুবর্ণরেখার ধারে গোপালঘাট। নদী পার হয়ে বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ভাল্‌কি জঙ্গলে। দু'তিন জায়গায় অদ্ভুত দৃশ্য—পাহাড়ি নদী পাথর কেটে গভীর নালা সৃষ্টি করেচে—স্তরে স্তরে অনাবৃত কঠিন প্রস্তর সাজানো—মহেন্‌জোদারা ও হারাপ্পা নগরীতে সে যুগের নরনারীরা যেদিন প্রসাধন করত, তখন ঐ প্রস্তরস্তর অর্ধেকও কাটেনি। এইসব ভাবলে eternity-র সম্মুখীন হতে হয়। বন, পাথর, পাহাড়। মাঝে মাঝে বসে খাবার খাচ্চি, ধূমপান করচি। লিপুকোচা আসবার আগে বাসাতন্ডী বলে স্থানে খানিকটা ঘোড়া চড়লুম। লিপুকোচা ক্ষুদ্র বন্যগ্রাম। একটা গাছতলায় বন্য মেয়েরা কুসুম ফুলের বীজ চূর্ণ করে তেল তৈরি করচে দুখানা বড় কাঠ চেপে। তাঁবু থেকে কি সুন্দর দৃশ্য ! বিস্তীর্ণ উপত্যকা, চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। শিমুলফুল ফুটেচে বনেপাহাড়ের মাথায়। চা খাই ও তার সঙ্গে টাটকা মাছভাজা। সুবর্ণরেখা থেকে কিনে আনা। রাত্রে হাতির ভয়ে আগুন জ্বালানো হল। মুরগির ঝোল ও ভাত খাই রাত্রে। ঘন বনের মধ্যে তাঁবুতে রাত্রিযাপন এই প্রথম জীবনে।

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৪৯। বৃহস্পতিবার।

(হাতির ভয়ে আগুন জ্বলচে)

তাঁবুতে বসে লিখচি—বাইরে ঘন অন্ধকার

সকালে চা খেয়ে একটা হো কুলি নিয়ে বরমকোচা যাবো বলে বেরুই। পথে একস্থানে একটা অদ্ভুত ঝরনা বনমধ্যে এক সরোবরের সৃষ্টি করেচে। তার ধারে একটা শিববৃক্ষ। নির্জন বনভূমি। নাম লিপুদারা। পাহাড় ডিঙিয়ে ঘন বনের পথে একটি পার্বত্য ঝরনার পাশ দিয়ে বরমকোচা পৌঁছুই। এক সাঁওতালী মেয়ের বাড়ি বসে গল্প করি। তামাক দিলে, পথপ্রদর্শক সাঁওতালী কুলিবিড়ি তৈরি করলে। মেয়েটা বল্লে—ভালো ভালো জায়গা দেখে তুমি বেড়াচ্চ বুঝি, (এত ভালো বাংলা নয়)। আবার পাহাড়ের ওপর উঠে চমৎকার এক উপত্যকা। সামনে খুব উঁচু পাহাড়। কতক্ষণ সেখানে বসলুম। এ

দৃশ্য সত্যিই মনকে নাড়া দেয়। পাহাড়, পাথর, উঁচুনীচু পথ, শাল পড়াশি, কেঁদ, করম বন। রাঢ়ীগোড়া বলে একটা গ্রামে আসবার পূর্বে কিছু কুল পেড়ে নিলুম। পথে যেখানে সেখানে বন্যহস্তীর নাদ (dung)। রাঢ়ী-গোড়ায় হোদের বাড়ি বসে গল্প করি, বিড়ি দিলে। আবার সেই জঙ্গল, পাথর। একস্থানে নিম্নে কি চমৎকার উপত্যকা। এখানে কিছু গোলগোলি ফুটে আছে পাহাড়ের মাথায়। চারিদিকে উঁচু পর্বতশিখর। বাসাতন্ডির দিকে না গিয়ে লিপুতে ফিরি তাঁবুতে। স্নান করে খেয়ে ঘুমুই। কতকগুলো লোক এল মাড়োতলিয়া গ্রাম থেকে মি. সিংহের কাছে নালিশ জানাতে, দরবার করতে। হো ভাষায় কথা আরম্ভ করলে। চা খেয়ে দুজনে লিপুদারায় গেলাম। বিকেলের ছায়া ঘনীভূত হয়েচে লিপুদারায়। এ দৃশ্য অতি অপূর্ব। ওপরে বনের মধ্যে একা বসে ভাবছিলুম এই বৈকালে গোপালনগরের হাট। মনো বিড়ি বিক্রি করচে। পঞ্চা মাস্টার এতক্ষণ গাড়ি করে চালকী চলেচে। অন্ধকার হয়ে এল। আমরা ঝর্নার মর্মর জলপতনধ্বনির দ্বারা বিখণ্ডিত গভীর আরণ্য নিঃশব্দতার মধ্যে ওপারে বসে আছি। ক্রমে ক্রমে সান্ধ্য অন্ধকার নেমে এল চারিপাশের বনে, বড় বড় গাছের মাথায়, ঝোপে। দুটি নক্ষত্র উঠল। যুগযুগান্ত এখানে—এই ঝরনা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে এই নালা কেটেচে। Eternity ও ভগবান একেবারে মুখোমুখি। ভগবানকে ধন্যবাদ দিলুম যে তিনি এই অপূর্ব স্থান দেখবার সুযোগ দিলেন। দশ লক্ষ বৎসরের মধ্যে কেউ এখানে আসেনি [,] কেউ দ্রষ্টা আসেনি এ সৌন্দর্য দেখতে। অনাবৃত পর্বতপ্রাচীর খাড়া হয়ে আছে ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের দুদিকে—ওপারে ক্রম ঢালুতে ঘন বন, নটরাজ শিবের মতো নৃত্যপরায়ণ শিববৃক্ষই ওপরে দাঁড়িয়ে। কেউ কোথাও নেই, অন্ধকার ঘনতর হল, বন্য সরোবরের একদিকে ঘন অরণ্যানী অন্ধকারে ঢেকে গেল। মি. সিংহ বল্লেন, চলুন হাতি আসতে পেরে [পারে] জল খেতে। তখুনি উঠে এলুম এপারে উঁচু পাথরে। অসংখ্য জোনাকী জ্বলচে, পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারা। তপরলিপু গ্রামের ভাঙা চাঁদ উঠল বনের ও পাহাড়ের মাথায়—যেমন উঠত ভাগলপুরে। অস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠল। আলোর সামনে বসে গল্প করচি আমরা। অনেক রাত, একরকম কাঠঠোকরা পাখি রাত জেগে অনবরত ডাকচে জঙ্গলে। (লিপুকোচা তাঁবুতে লিখিত। সকালবেলা।)

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪৯। শুক্রবার।

চা খেয়ে রওনা হয়ে জুড়িয়া নালার ধারে শান্ত ছায়া, শীতল শিলাসন, পুষ্পিত Indigofara palchela গাছের সামনে অনাবৃত পর্বতপ্রাচীরের নীচে মধ্যে বসে লিখচি। কত কি পাখির ডাক, অসংখ্য পক্ষীদলের কূজন। ঘুঘু ডাক্‌চে। ছায়াবৃত নিবিড় পর্বতারণ্য। পাখিরা কলগীতির ঐক্যতান [ঐকতান] সুরু করেচে ঠিক বাংলাদেশের মতো। এত পাখির গান এদেশে শুনি নি। বাংলার অনেক প্রিয় পরিচিত বিহঙ্গকূজন মিশে আছে। মি. সিন্‌হা ম্যাপ দেখচেন, আমি সিগারেট খাচ্চি আর লিখচি পাথরে বসে। ঠাণ্ডা সকাল। বনের মধ্যে এগিয়ে ডানদিকে মুরাঠাকুরা Camp (?)দেখতে গেলুম। এ বনে হাতির পায়ের দাগ ও নাদ সর্বত্র [|] ধাতু [woodfordia Horitunda]ফুল ও লুট্‌বা(?)ফুলের (Indigofara palchela) এত মেলা সিংভূমের এদিকে দেখিনি। মি. সিংহ বন তদারকে যাবেন—আমি একটা উপত্যকায় কেঁদগাছে ঠেস্ দিয়ে সকালের ছায়ায় বসে এই অংশ লিখচি। বেলা ১১টা। পাখির ডাক সর্বত্র, এই উপত্যকাতেও পাখি বাংলার মতো ডাকচে। নুরুল হক্ (Range Officer) বল্লে—একটা লোক রাখবো কি হুজুরের সঙ্গে ?বল্লুম, বাঘ আসবে না তো ?আমার সামনে, ও ডাইনে ঢেউখেলানো পর্বতচূড়া, নিষ্পত্র গোলগোলি গাছ দেখা যাচ্চে পাহাড়ের মাথায়। একটা অপূর্ব শান্তি ও বিহঙ্গকূজন। দুদিকে উপত্যকার অদূরে অরণ্যময় পর্বত ক্ষুদ্র উপত্যকাটি বেষ্টন করে আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে এমনি দাঁড়িয়ে আছে—এই দৃশ্য দশ লক্ষ বৎসর আগে এলেও দেখতে পেতুম। পুরোনো কলমটা[য়] (পার্কার, 'পথের পাঁচালী' লিখেছিলুমযা দিয়ে) লিখচি, যেমন ক্ল্যারিজের সময় এটা দিয়ে স্কুলের ছাদে ছেলেদের Progress Report লিখতুম।

কি অদ্ভুত শান্তি ও শোভা ! নিঃশব্দ পর্বতারণ্য। একটি শিববৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে ডাইনের পর্বতসানুতে। কত বন, পাহাড় ও উপত্যকা দেখলুম এবার। সাধ মিটিয়ে নির্জন বনে বনে বেড়ালুম। একজন ফরেস্ট গার্ড আসচে দূরের পথে। সেলাম দিল। বল্লুম—পাতা কেটে আনো। পাতা নিয়ে এল, বিছিয়ে দিলে। বল্লে, সাহেব কোথায় ?বল্লুম— কূপে গিয়েচেন। সে একটা বান্ডিল রেখে চলে গেল এগিয়ে। আবার কেউ নেই—আমি আর পর্বত, অরণ্য, বিহঙ্গকূজন। অসংখ্য পাখি এ বনে। সামনের পর্বতে একটা চারা শিমূল গাছে ফুল ফুটেচে। এ শিমূল এ বনে মন্দ নয়। নেই গোলগোলি। পুরোনো দিনের মতো। ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ, তাঁর দয়াতে এই বনের প্রকৃতি আজ দেখলুম। দুটি লোক ঝুড়ি নিয়ে যাচ্চে, দুটি মেয়ে। কাছে ডাকলুম। মাইনো ঘোরা (?)বাড়ি, ২ ক্রোশ এখান থেকে। সিংপুরার হাটে ধান কিনতে যাচ্চে, বল্লে। (কি পাখির কাকলি এখানে !) এই বিহঙ্গকূজিত শান্ত উপত্যকায় বসে ভাবচি, পাঁচী ও হরিপদদার সমস্যা, গ্রামে এতক্ষণ ইন্দু রায় ও সুরেন ডাকার হয়তো লোজন নিয়ে সংকীর্ণ মজলিস করচে। গজা ও অমুল্য মুহুরি ফন্দি আঁটচে। হু হু হাওয়া

বইচে—হাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা। সামান্য শীত করচে। পাখির ডাক কি সুন্দর শুন্‌চি। কে বলে ধলভূম অরণ্যে পাখি নেই ?সেদিনকার সেই ছোট্ট ছেলেটির কথা ভাবচি—বহরাগড়া বডিংয়ে [বোর্ডিংয়ে] ভাতের ফেনের লোভে সে সারাদিন বসে থাকে। আজ ২৬/৩/[২] ৪৩ সকালবেলা। ১১টা। কেঁদগাছের তলা। মুরাঠাকুরা। রাজপুরের লোক এখন ছুট্‌চে ১০-২এর ট্রেন ধরতে ২০ বছর আগের মতো। ওদের জীবনে কি সংকীর্ণতা ! এপারে ডোঙায় এসে দেখি মোটর দাঁড়িয়ে আছে। আফ্রিকা বেড়িয়ে দুই পর্যটক যেন সভ্য জগতে ফিরলুম।

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৪৯। শনিবার।

সকালে মুসাবনি। উঠলুম ভবনী (?)পাহাড়ে। রেণুর রুমাল পেতে বসে তুলতে মনে ছিল না। সিংহ কুড়িয়ে নিয়ে এল। রাত্রে মিসেস কলওয়ার খেতে বল্লে। গুট্‌কেকে নিয়ে বুরুডি জঙ্গলে ও নতুন রাস্তায় বেড়াতে গেলুম মি. সিংহ ও আমি। চমৎকার দৃশ্য—এত দেখে এসেও মনে হল এ দৃশ্য খুব ভালো। রাত্রে ডিনারে যাই।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৪৯। রবিবার।

মি. সিংহ সকালে এসে রইল। মানভূম (?)যাওয়ার ঠিক হল [1] শচীন এল। হুট্‌ব্য ফুল খেলুম ভেজে।

১লা মার্চ, ১৯৪৩। ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৪৯। সোমবার।

সকালে মুকুল চক্কত্তির বাড়ি গেলুম—ওখান থেকে রাজেনবাবুর ওখানে। ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে দুখানা বই আনলুম বিবেকানন্দের। বৈকালে রাজেনবাবুর সঙ্গে সুবর্ণরেখার ধারে কতক্ষণ নানা গল্প। দ্বিজুবাবুর বাড়ি সন্ধ্যায় কাটাই। গুট্‌কে আজ এল নরসিংহগড় থেকে বেলা ১১টার সময়। কাল রাত্রে সেখানে পৌঁছেচে রাত দশটায়। কাল ছিল সেখানে।

২রা মার্চ, ১৯৪৩। ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৯। মঙ্গলবার।

আজ সকালে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে বসি। তারপর এসে পড়াশুনা করি। ফিরি ও খেয়ে উঠে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে শুনলুম কাল (?)এসেচে। অনেকদিন পরে দেখা করতে যাই। রেণুরা আসেনি, বুদ্ধু এসে সার্ভিস (?)লিখে আছে শুনলুম। বেশ চমৎকার বিকালটা। দ্বিজুবাবুর বাড়ি এসে করি গল্প।

মহাদেব রায়কে ঝাড়গ্রাম আসতে লিখি।

৩রা মার্চ, ১৯৪৩। ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৪৯। বুধবার।

সকালে রমণীবাবুর বাড়ি গিয়ে চা খাই। দুপুরে সত্য চক্কত্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। বড্ড রদ্দুর চড়েচে।

৪ঠা মার্চ, ১৯৪৩। ২০শে ফাল্গুন, ১৩৪৯। বৃহস্পতিবার।

এদিন সকালে স্টেশনে গেলুম গুট্‌কের সঙ্গে। ট্রেন এল ন'টায়। ঝাড়গ্রাম পৌঁছে রাজবাড়ি পুকুরে স্নান করে এলাম। বিকেলে একটা নতুন পথে অনেক জঙ্গলের মধ্যে বেরিয়ে এলুম কিছুদূর। কল্যাণী খুব ভাবছিল, আমায় দেখে খুব খুসি হল। কল্যাণীকে নিয়েই জঙ্গলের পথে গিয়েছিলুম। এক জায়গায় আমরা বসলুম মাঠের মধ্যে। বারাকপুরের মতো, কল্যাণী নিকটেই বসে রইল। অন্ধকার হল, আমরা 'বাণী ভবন'-এর পুকুরে নেমে জল দেখে ফিরে এলুম। পথে সাবিত্রি (সাবিত্রী] মন্দিরে দুজনে গিয়ে বসি। কত গল্প হয়। আরবারে চালকীতে কি সব করতুম, গোপালনগরের স্কুল করেছিলুম এই সময়ে—সেই সব কথা।

৫ই মার্চ, ১৯৪৩। ২১শে ফাল্গুন, ১৩৪৯। শুক্রবার। ঝাড়গ্রাম

সকালে বাজার ও স্টেশনের দিকে যেতে এক ভদ্রলোক নিয়ে গিয়ে তুল্লেন এক ছাত্রদের মেসে। সেখানে চা খেয়ে চলে এলুম বাড়ি। বিকেলে জঙ্গলের পথে গিয়ে বেড়াই। বেশ জায়গাটি।

রাত্রে 'ডাকঘর' অভিনয় হল। যখন অভিনয় চলচে, মহাদেববাবু এল খড়্গপুর থেকে। তার সঙ্গে বহু গল্প। অনেক রাত্রে শুই। কল্যাণী বলে—আমায় খোকার গল্প কর। তারপর ছেলেমানুষের সুরে ঘুমপাড়ানি গোছের একটি কবিতা বলে—

'খোকা আমার সাত সাগরের পার' নাকি এম্‌নি। বেশ লাগে।

৬ই মার্চ, ১৯৪৩। ২২শে ফাল্গুন, ১৩৪৯। শনিবার।

আজ সকালে কান্তিবাবুর বাড়ি গেলুম। একটু বসেই কান্তিবাবু বল্লে—বড্ড ব্যস্ত আছি, এখুনি বাজারে বেরুতে হবে। দুজনে বাজারে বেরুই। ফিরবার পথে S.D.O. মির্জা সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। ইনি বনগাঁয়ে ছিলেন, কিন্তু তখন আমার

সঙ্গে আলাপ ছিল না। তিনি আজই বদলি হয়ে বারাকপুরে যাচ্চেন। মৌলবী সাহেব, [.] ড্রয়িং মাস্টারও সেখানে উপস্থিত। মির্জা সাহেব, সত্যবাবু, জিতেন দফাদার, ননী মুখুয্যে প্রভৃতির কথা জিগ্যেস করলেন। রাজবাড়ির পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ভাবি বারাকপুরে এই রকম বাঁধা ঘাট ও পার্ক করে দেবো। বৈকালে সেই জঙ্গলের পথে বহুদূর গিয়ে খানাকুই গ্রামে এক সাধুর আশ্রমে অনেকক্ষণ বসি। বেশ স্থানটি। সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি ক্ষুদ্র নদী পার হয়ে শালবনের অন্ধকারে চলে এলুম। কল্যাণী পরোটা ভেজে নিয়ে এল নিজে। ওকে খাওয়াই, নিজেও খাই।

৭ই মার্চ, ১৯৪৩। ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৪৯। রবিবার

আজ সকালে কল্যাণী, মায়াদি ও বেলুকে নিয়ে শালবনের মধ্যে দিয়ে সাধুর আশ্রমে বেড়াতে গেলুম। বেশ পথ, শালবনের ছায়া। ফিরবার পথে শালবনে বসলুম। বিকালে আমি একা ওই শালবনের পথে কতদূর গিয়ে একা ঝরনা পেলুম। চুপ করে বসলুম তার নির্জন তীরে। এক জায়গায় একটা বাঁধানো বাঁধ। সন্ধ্যায় নিবিড় ছায়া নেমেচে শালবনে, শুষ্ক ঝরাপাতার কেমন সুন্দর গন্ধ। উদাস করে মন—ঘন শালবনে—ভয়ও হয়। আজ হাটবার গোপালনগরে, মনো খুড়ো বিড়ি বিক্রি করচে। হাজারি জেলেনী বেলা গেলে হাটে আসচে আর বলচে—বেলা গেল মামাঠাকুর ! বাঁওড়ের পথ দিয়ে হাট করে সবাই ফিরচে। কতক্ষণ বসে বসে ভাবলুম, পৃথিবীতে একলক্ষ beauty spot আছে। মানুষ জীবনে পাঁচ হাজার দেখতে পারে। তারপর কত গ্রহ। কত তারা, কতbeauty spot—মানুষ দেখবে কত ?কি সুন্দর রাত্রির হাওয়া ! কল্যাণী পরোটা ভেজে নিয়ে এল। ব্রহ্মানন্দ জতা বলে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি বিবাহ।

৮ই মার্চ, ১৯৪৩। ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪৯। সোমবার।

সকালে উঠে সেই শালবনের ছায়ায় গিয়ে বসি। মনে অপূর্ব ধ্যানের ভাব আসে। মনে পড়ে আমাদের বিশ্ব উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের দলের মধ্যে অবস্থিত এক বিরাট Spiral নেবুলা। এর কেন্দ্র Sagitarius [Sagittarius] নক্ষত্রপুঞ্জের কাছাকাছি। দুশো পঞ্চাশ লক্ষ বছরে এ বিশ্ব একবার পাক খাচ্চে।

ঝরা শালপাতার রাশির ওপরে গভীর বনে পাখির কূজনের মধ্যে একা বসে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে যেন মনে হয় বৈদিক যুগে আছি। গভীর শান্তি। ভগবানকে মুখোমুখি পাই। তিনি এই বিরাট শান্তির মধ্যে, নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে আসন পেতেচেন। গুট্‌কের বাবাকে নিয়ে সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাবো ভাবলুম—কারণ মহাদেব রায়ের সঙ্গে যেতে একটা চাকর দরকার। বিকেলে মায়াদি, কল্যাণী স্টেশনে তুলে দিয়ে গেল। কল্যাণী প্রণাম করলে। বারবার বলে—যেয়ো না—চল। আজ ফিরে যাই। ক'দিনই এরকম করেচে। আসতে দেবে না। বলে—ও আজ যাবে না ?তা বেশ। সোমবারও থাকবে ?বেশ। নুটু ধলভূম স্টেশনে দেখা করলে। তরকারির ঝুড়ি থেকে ওকে ডিম দিলুম। বেশ লাগবে ঘাটশিলা। খুব হাওয়া। সুরেন গাঙ্গুলীর পত্র এসেচে ভাগলপুর থেকে—রবীন্দ্র পরিষদের নিমন্ত্রণ এসেচে ইউনিভার্সিটি থেকে। দ্বিজুবাবু 'স্বপ্নমায়া' দেখতে গিয়েছিল, গল্প করলে সন্ধ্যাবেলা।

৯ই মার্চ, ১৯৪৩। ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৪৯। মঙ্গলবার।ঘাটশিলা

আজ বিকেলে এঁদেলবেড়ার জঙ্গলে একটি স্থান আবিষ্কার করলুম, শিলাসন বিস্তৃত, কি একরকম বনফুলে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্চে [।] ঘন ছায়াবৃত স্থানটি—ঝরনার গর্ভে। শুকনো শালপাতা বিছানো বৃক্ষতলও যথেষ্ট। Ridgeটায় উঠে দেখি অন্তত ১০।।১২টি গোলগোলির ফুলের গাছে হলদে হলদে ফুল ফুটেচে—কি তার শোভা ! এমন স্থান যে এখানে আছে তা জানতাম না। সমস্তটা নিয়ে একটা মস্ত বড় ফরেস্ট পার্ক। রাজেনবাবুর বাড়ি কাটাই সন্ধ্যাবেলা। আজ চাঁইবাসা থেকে forest officer-এর পত্র এল—সেই সত্যশরণ মুখোপাধ্যায়ের নিমন্ত্রণ পত্র আদ্রা যাওয়ার জন্যে। রাত্র [রাত্রে] নুটু এল ধলভূম থেকে।

১০ই মার্চ, ১৯৪৩। ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৪৯। বুধবার।

আজ সকালে নুটু চলে গেল ভোরে উঠে। ধরমশায় বার বার এল। চাঁইবাসা থেকে কল্যাণীর চিঠি এল রত্নাবাগ থেকে। দ্বিজুবাবুর বাড়ি গেলুম বেড়াতে। শরৎ ধরের একটা কবিতা ২০। ২৫ বছর আগে লেখা, স্কুলের মেয়েরা পড়ছিল, উনি হঠাৎ শুনে অবাক হলেন। এ তো তাঁর কবিতা—ওরা কোথায় পেল ?বইখানা এনে আমায় দেখালেন।

[বাঘমুণ্ডীর পাহাড়ে—দুপুরে বসে লেখা।]

বিকেলে মি. সিন্‌হা ও সুবোধবাবু এলেন। সন্ধ্যায় সুবর্ণরেখার ধারের পথ দিয়ে ডাকবাংলার মাঠে বসেছি। মি. কল্‌ওয়ার ও মিসেস কল্‌ওয়ারের বাড়ি গিয়ে বসলুম। মিসেস কল্‌ওয়ার হাত দেখালে। নুটু এসেছিল, রাত্রেই চলে গেল রাঁচী এক্সপ্রেসে।

১১ই মার্চ, ১৯৪৩। ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৪৯। বৃহস্পতিবার।ডাল্‌মা—মাটাবুরু

[বাঘমুণ্ডী পাহাড়ে বসে লেখা]

সকালে মোটরে বার হই। রাখা মাইনের পুল দিয়ে সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে রাজদহের পথ দিয়ে টাটানগর এলুম। আশুদের বাড়ি মাসীমা আমায় আদর করলেন, জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন।মি. ঘোষ, মি. সিন্‌হা ও আমি তিনজনে খেয়ে মোটরে আবার বার হই। ডাল্‌মা পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে ঢুকে পড়ে এক জায়গায় বসেচি। চারিধারে পাহাড়ে ঘেরা, অসংখ্য গোলগোলি ফুলে ভর্তি শৈলসানু। এত গোলগোলি ফুল কোথাও দেখিনি। ডালমার উচ্চচূড়ায় ডিরেক্টারের বাংলা থেকে নিম্নের সমতলভূমির দৃশ্য কি সুন্দর ! যথেষ্ট জঙ্গল ! নিমডির পথে নামলুম—পলাশ, রক্তপলাশ ও গোলগোলি ফুলের মেলা। ঘেঁটুফুল পর্বতসানুতে কত যে ফুটেচে ! সন্ধ্যায় মাঠাবুরু বাংলাতে এসে পৌঁছে গেলুম। কি উচ্চাবচ ভূমিশ্রীর সৌন্দর্য ! আজ যখন ডালমা পাহাড় থেকে নামি, তখন গোপালনগরের হাটে মাস্টার ডাব বিক্রি করছিল—একথা ভুলেই গিয়েছিলুম।

জ্যোৎস্না উঠেচে। পেছনেই মাটাবুরু পাহাড়—তিনটি শৈলচূড়া পাশাপাশি। আরামকেদারায় বসে গল্প করলুম, চা খেলুম। কোথা থেকে কোথায় এলুম আজ ! দূরবিসর্পিত টাঁড় বা প্রান্তর।

ডালমার বন্যসৌন্দর্য ও নিস্‌ডির পথের পলাশ ফুল ও গোলগোলির অজস্র সম্ভার [-] মনে নেশার মতো আবেশ। আর একটা ফুল দেখলুম, কাঞ্চন ফুলের মতো (Bohinia) [Bauhinia] হিন্দিতে বলে ‘কাচনার’। রাখামাইনে রেঞ্জ অফিসে চা খেলুম মিসেস্ গুপ্তের বাড়ি।

সকালে চা খেয়ে মোটরে বার হয়ে বাঘমুণ্ডী ডাকবাংলা বসে গল্প করি। তারপর পাহাড়ে উঠি। সাঁওতাল মেয়েরা কাঠ আনচে। পাহাড়ের তলায় ঘেঁটুফুল, কালো পাথরের চাঁই। শৈলসানুতে গোলগোলি ফুল, ধাতুপ, রক্তপলাশ, লতাপলাশ। কালো পাথরে বসে লিখচি, সুবোধবাবু ‘আরণ্যক’ পড়চেন, আমরা শুনচি ও লিখচি। খুব রোদ্দুর, একটা গাছের ছায়ায় বসে আছি আমরা তিনজনে, মুখ তুললেই চোখে পড়চে সামনে সানুদেশে গোলগোলি ফুলের মেলা। এত গোলগোলি ফুলও এই দিকের পাহাড়ে ও বনে। ডাল্‌মা পাহাড় থেকে শুরু। তারপর নীচে নামলুম। বেলা দেড়টা। আজ সকালে কল্যাণী ও ভূতনাথকে পত্র দিয়েচি। জীবনে কোনোদিন যে ভূতনাথকে লিখতে হবে—কে ভেবেছিল ?তাও এতকাল পরে ! পাহাড়ের নীচে গাছের ছায়ায় ঘেঁটুফুলের বন। সেখানে দাঁড়িয়ে অদূরবর্তী পর্বতশিখরের দিকে চেয়ে ভাবলুম, বারাকপুরের গাঙের ঘাটে কোনো লোক জেলেপাড়ার হয়তো নাইতে নেমেচে এখন এত বেলায়।

একটা গাছের তলায় সাঁওতাল মেয়ে ও পুরুষের দল কাঠের বোঝা নামিয়ে ছায়ায় বিশ্রাম করচে। কাঠ মাথায় দলে দলে মেয়ে-পুরুষ নামচে পাহাড়ের পথ বেয়ে। মাদ্‌লার হাটে বিক্রি করে চার আনা পাঁচ আনা রোজগার করবে। অন্য কোনো উপজীবিকা নেই এদের।

মাঠাবুরু বাংলোয় ফিরে এলুম। স্নানাহার করে উঠে ‘Leningon and the ants’গল্পটা পড়তে লাগলুম। সুবোদ সাইকেলে কখন চলে গিয়েচে বলরামপুরে।

বিকেলে ছায়া নেমেচে। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখচি পুষ্পিত পলাশ ও বিশালকায় মাঠাবুরু পাহাড়ের অনাদৃত কালো শিখরদেশ দুটি। দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে—কি বিরাট massiveness—কালো পাথরের গম্বুজ যেন দৈত্যের রাজপুরীর মতো—গ্রানাইট বা ডলোরাইটের। চা খেয়ে বেড়িয়ে এলুম গ্রামে। এক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ দেখতে সাঁওতালের মতো। কথাও সেইরকম। একজায়গায় জাঙিপাড়ার সেই আঁকোড় ফুল ফুটেছে অনেক। বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বাঁকা, বোঝা যায় না। সন্ধ্যায় ফিরে এসে বসেচি, সোঁদা রোদপোড়া মাটির ভরপুর সুগন্ধ ও শুষ্ক ঘাসের ও খড়ের—ঠিক ইসমাইলপুরের মতো। Delicious !ইসমাইলপুরকে মনে করিয়ে দেয়। মাঠাবুরু শিখরে মাঠা দেবীর কাছে নরবলি হোত। এ একটা সুদীর্ঘ শৈলশ্রেণী ১৯ মাইল লম্বা, অনেকদূর নিয়ে পাহাড়জঙ্গল, গুর্গাবুরু হচ্চে এই শৈলশ্রেণীর উচ্চতম চূড়া, ২২১৮ ফুট উঁচু ! বাঁড়ুয্যে মশাই বলছিল পাহাড় থেকে গ্রামের লোক কেঁদ, পিয়াল, বেল, বৈঁচি, মাকড়াকেঁদ, জংলি আম, খাম আলু

নিয়ে আসে। বাঘ, হরিণ, ময়ুর, সাপ সব আছে জঙ্গলে। হায়েনাও আছে। আমি বল্লুম—বেঁচি আছে ?ওরা বল্লে—অনেক, অনেক গাছ আছে। পুরুলিয়া থেকে এ স্থান ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, রাঁচী থেকে East-South-East, ৫০ মাইল দূরে।

১৩ই মার্চ, ১৯৪৩। ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৪৯। শনিবার।

মাঠাবুরু

[মাঠাবুরু শিখরদেশে বসে লেখা। ৯॥০টা।]

দিনটি আজ বেশ কাটল। দুপুরে বসে 'আরণ্যক' পড়া বাঘমুণ্ডীর পাহাড়ে [—] মঞ্চীর কথা পড়ালে সুবোধ ঘোষ। পলাশ ও গোলগোলি দেখে মন তৃপ্ত হল। পরদিন সকালে চা খেয়ে পাহাড়ে উঠচি। নীচের দিকে বড় বড় শিলাখণ্ড, বড় বড় লতার বাঁধনে আবদ্ধ কালো ?পাথরের চাঁই। ঘন ছায়া। এর বিভিন্ন চূড়ার নাম মাঠাবুরু, সাড়েবুরু, বড়ামবুরু, নোয়াবুরু, বড়োবুরু, কাড়াবুরু, কুকুবুরু। (মাঠাবুরু সর্বোচ্চ চুড়ায় বসে লেখা। বেলা ১টা।) একেবারে মাঠাবুরু দেবীর শিলার নিকটে যেখানে বসে লিখচি কঠিন প্রস্তরময় পর্বতচূড়ায় বসে, সেখান থেকে ১০০ ফুট নিম্নের সমতলভূমি, গরুবাছুর, বাড়িঘর সব পুতুলের মতো দেখাচ্চে। রাস্তা দেখাচ্চে সরু সাদা সুতোর মতো। গরুর গাড়িগুলোcrawl করে যাচ্চে। আমাদের কত নীচে চিল উড়চে, শাদা বকের দল উড়চে। সম্মুখে দূরবিস্তৃত সমতলভূমি দূরত্বের কুয়াসায় আচ্ছন্ন। একটু বামে ডালমা পাহাড় দেখা যাচ্চে ধোঁয়ার মতো। রোদ চড়েচে, পাকুড় গাছের ছায়া ঘুরে গেল। বেলা ১টা (?)। বহুদূরে সুবর্ণরেখা এঁকেবেঁকে আসচে, খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা দূরত্বের কুয়াসায় আচ্ছন্ন। এখানে 'আরণ্যক' পড়া হল। বেলা ১২টা (?)। পাষাণময় শিখর তেতে উঠেচে। সূর্য মাথার ওপরে।

নামবার সময় ঘন পাদপছায়ায় নিম্নসানুতে বসে আছি। কত কি পাখি ডাকচে। বেলা ১।।০টা। কুলি মেয়েরা ওপরে কয়লা বইতে উঠচে। এসে স্নান করে একটু ঘুমুই, তারপর বিকেলের ছায়া নেমেচে উঠে দেখি—তিনটি চূড়া তার নীচে পুষ্পিত পলাশ। কল্যাণী কোথায় ?আর বছর এ দিনে চাল্‌কী। ঘাটশিলা যাবে বলে বেরিয়ে আজ যাওয়া হয়নি। সে আজ অনেকদূরে। আমি চাল্‌কী ঘেঁটুফুলের মধ্যে নেই আজ। বহুদূরে মানভূমে মাঠাবুরু পাহাড়ের নীচে বসে লিখচি। আর বছর চালকীতে কাঠ বইলুম এদিকে। কল্যাণী রাঁধত।

বিকেলে মোটরে কিয়দ্দূর গিয়ে বনের মধ্যে বেড়ালুম। একখানা পাথরে বসলুম। সামনে দূরে মাঠাবুরু, হু হু হাওয়া, জ্যোৎস্না উঠল মস্ত বড় পাথরটাতে, শালবনে। কোন্ মায়ারাজ্যে যেন এসে গিয়েচি। এত সুন্দর লাগচে এ দেশ ! আসবার পথে জ্যোৎস্নাভরা রাত দিয়ে হাঁটচি, বামে জ্যোৎস্নাস্নাত শালবন, চক্‌চকে সাদা অভ্রকণা সর্বত্র জ্বলচে। একস্থানে পথের ধারে বট গাছ, মোটর দাঁড়িয়ে আছে—কি চমৎকার দেখাচ্চে বটগাছ জ্যোৎস্নারাত্রে। ইন্দু রায় ওর রোয়াকে বসে আছে জ্যোৎস্নায়, বিড়ি টানচে অনেকদূরে আমার গ্রামে। আজ বড় শীত। বাংলো ফিরে জ্যোৎস্নারাতে পাহাড়ের সামনে বসে কত গল্প করি। আর ভাবি লিচুতলার আড্ডায় বনগাঁয়ে এতক্ষণ হরিদা, যতীনদা বসে ২০ বছর ধরে যা বক্‌বক্ করে তাই করচে। কি কূপমণ্ডূক !

১৪ই মার্চ, ১৯৪৩। ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৯। রবিবার।

সকালে বাংলোর পেছনে বেড়াতে গেলুম। কি ছায়া, বড় বড় গাছ, লতা—পাহাড়ের তলে বড় বড় শিলা ছড়ানো। বড় ভালো, ভালো। বাসের উপযুক্ত, লেখা, পড়া, চিন্তার উপযুক্ত স্থান।

{১৪ই মার্চের ডায়েরি [}]

[গুর্গাবুরু পর্বতচূড়ার সামনে জাহিরা শালবনে পত্রোপরি বসে লেখা। [}]

বেলা ১২টা।

সকালে মোটরে মাঠা থেকে ৩ মাইল এসে বনের মধ্যে হেঁটে কতদূর এলাম। কি ছায়া শীতল অরণ্যভূমি ! শাখা নদীর ছোট ছোট শাখা বনের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েচে। কোথাও ছায়াতরুতলায় কৃষ্ণবর্ণ শিলাসন। কোথাও পুষ্পিত তরু লোহাজাঙ্গি (যে গাছ এঁদেলবেড়ার জঙ্গলে আছে) ও পেটারি (বানিয়াকাণ্ড)—দুইয়ের ফুলই সুমিষ্ট সুগন্ধে ভরপুর। আর আছে ভুররু (সাদা একপেটে গন্ধরাজের মতো) [,] একরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল (করন্ধ—Carrisa Spinarum) সুমিষ্ট খেতে। খুব খেলুম। লোহাজাঙ্গির নাম রফল (?) (Ixora perviflora)। সত্যিই অপূর্ব বনপ্রকৃতিরসৌন্দর্য এদেশে। একস্থানে কালো পাথরের বড় পাহাড়। যেন এই কালো পাথরের মধ্যে কোথাও আদিম মানবের বাসভূমি গুহাবলী বর্তমান। কোথাও শৈলসানু গোলগোলি ফুলে একেবারে হল্‌দে হয়ে আছে। কোথাও পাহাড়ি ঝরনার শুষ্ক খাত—শঙ্খ নদীর শাখা। এক জায়গায় তিনটি সাঁওতাল বহেড়া ফল ভেঙে বীচি খাচ্চে। একজনকে ডাকলুম, তার বয়েস ৬০, বল্লে আমার

বয়েস ১৫/১৬ হতে পারে আজ্ঞে। দূরে চাউনি বলে গ্রাম, বাঘমুণ্ডী রাস্তার ধারে। ৬ মাইল দূর বলরামপুর থেকে। এই মাঠে চারিধারে পুষ্পিত পলাশ সব দিকে। সামনে মাঠা শৈলমালার উচ্চতম শিখর গুর্গাবুরু। আমরা শালবনে শুকনো পাতার রাশিতে শুয়ে পড়ে গল্প করচি। ফরেস্ট গার্ডরা আগে চলে গিয়েচে। খুব হাওয়া বইচে। শঙ্খ নদী পার হয়ে চলে মোটর ধরলুম ?প্রথমে। বৈকালে নাক্‌টিটাড়ের পলাশবনে বেড়াতে গেলুম। ভুবনেশ্বর বাঁড়ুয্যে গেল সঙ্গে। কিছুদূর গিয়ে ফিরে চেয়ে দেখলুম শৈলশ্রেণীর দিকে। মাঠের সর্বত্র ফুটন্ত পলাশ বৃক্ষ অনাদৃত বিরাট শৈলমালার পটভূমিতে। কিছুদূর ঘন বন, বৈকালের ছায়া সুবাসিত হয়েচে করন্ধাফুলের মিষ্ট গন্ধে। যুঁইফুলের মতো সুবাস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা ফুল। বহুস্থানে বড় বড় করন্ধা গাছ। চা খেলাম বনের মধ্যে বসে—রবিবার আজ, গোপালনগরের হাট, কাছারির সামনে বেগুন বিক্রি হচ্চে। পঞ্চা মাস্টার ডাব বিক্রি করচে সেই কোন্‌টাতে বসে—এতদুর থেকে আমি যেন দেখতে পাচ্চি। তারপর আমরা হাঁটতে শুরু করি [—] বনমধ্যে অষ্টমীর জ্যোৎস্না উঠল—বড় বড় গাছ, কতস্থানে সাদা কালো পাথর, এমনি একটা পাথরের ওপর এসে বসলুম। ডাইনে দূরে মাহা শৈলমালা, বামে রহস্যময় বনভূমি, জ্যোৎস্নায় মায়াময় হয়ে উঠেচে। গাছপালার ফাঁকে শুক্রতারা জ্বলজ্বল করছে পশ্চিম দিগন্তে। এই ছিল একরকম, জ্যোৎস্না উঠতেই অন্যরকম হয়ে গেল। ইন্দ্রজালময় প্রকৃতি গাছ, পাথর, মাটির রূপ বদলে দিয়েচে। বনের প্রত্যেক glade প্রতিটি তরু অপূর্ব রহস্যময় হয়ে উঠল। সেই রহস্যময়ী বনপ্রকৃতির দিকে চেয়ে, তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে, অভ্রকণিকাময় বিশাল প্রস্তরাসনে আমরা হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লুম। ভগবান ছাড়া আর কার কথা মনে হবে এখানে ?তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। যিনি এই মহান, রহস্যময় অরণ্য, তারাভরা আকাশ, ঐ বিরাট মাঠাবুরু শৈলমালা সৃষ্টি করেচেন, যিনি এখানে আমাকে এনে দেখবার সুযোগ দিয়েচেন। রাত দশটার সময় ফিরি বাংলোতে। বেশ শীত আজ। ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে, যেন পৌষমাস।

১৫ই মার্চ, ১৯৪৩। ১লা চৈত্র, ১৩৪৯। সোমবার।

সকালে মাঠাবুরুর নিকট বিদায় নিয়ে বলরামপুর ডাকবাংলা। সেখান থেকে সোজা পুরুলিয়া। পথে কাঁড়দাবুরু ভালো করে দেখবার জন্যে মোটর ছেড়ে ওপারে মাইলখানেক দূরে এক মহুয়াতলায় বসি। অনাবৃতকায় পাষাণের গম্বুজ উঠেচে ২০০ ফুট বনরেখার ওপরে—হাত পা দিয়ে আঁকড়াবার কিছু নেই। দুপুরবেলা ঝাঁ ঝাঁ করচে রোদ। এক ঘণ্টা দেরি করি। ইন্দু ঘুমুচ্চে। বৈকালে পুরুলিয়া পৌঁছাই—মানভূমের এ অঞ্চল যেন আরিজোনা [—] অদ্ভুতদর্শন পাহাড়ে তৈরি mesa অঞ্চল। D.C. মি. শর্মার বাংলোর আগে আগে গেলুম। মুচুকুন্দ চাঁপার সুগন্ধ বাংলোর হাতায় মি. শর্মার সঙ্গে কথা বলে সাহেব বাঁধ [—] জ্যোৎস্নারাত্রে অমিয়বাবু সাবডেপুটির বাসায় চলে এলুম। একজন ছোকরা এসে কাল মিটিংয়ের কথা বল্লে।

১৬ই মার্চ, ১৯৪৩। ২রা চৈত্র, ১৩৪৯। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে ডেপুটি কমিশনার মি. শর্মার ওখানে নিমন্ত্রণ খেতে যাই। বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হল। সাহেব বাঁধ দেখে ফিরি অমিয়বাবুর কোর্টে। ঘুম এসেছিল, একটু ঘুমুই। এখুনি বেরুতে হবে কেঁদা [,] ধরমপুর [,] পানিপাথর] সিঁদুরপুর অঞ্চলে বনভ্রমণে। আধঘণ্টা সময় ঘুমিয়ে নিয়ে তখুনি বেরুই। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। ফণি কাকা, ইন্দু রায় এই দুপুরে বারাকপুরে ঘুমুচ্চে। রৌদ্রদগ্ধ দিগন্তঘেরা মালভূমি [,] টাঁড় পথের দুধারে, গাছ নেই, পালা নেই—কাঁকর ও পাথরছড়ানো ডাঙা—চাষ নেই, পলাশ নেই, শাল নেই। Beauty of Vast Spaces !বহুদূরে ছোট্ট একটা পাহাড়, তাও নাকি বাঁকুড়ায়। বিকেলে এমনি টাঁড়ে কালো পাথরের টিলায় বসলুম। চা খেলুম মি. সিন্‌হা, অমিয়বাবু সাবডেপুটি ও আমি। Space-এর মহাসমুদ্রে ডুবে আছি যেন। ক্ষীণ জ্যোৎস্না উঠল—সেই mesa of Arizon—সেই বিরাট Space আমাকে ঘিরে রয়েচে। ফিরবার পথে দূরে বাঘমুণ্ডী আড়শা পাহাড়ে আগুনের মালা দেখতে দেখতে ও জ্যোৎস্নাস্নাত মালভূমি [,] টাঁড় দেখতে দেখতে কসাই নদীর সেতু পার হলুম। মানভূমে তিনটি শৈলারণ্যের বড় চাপ—(১) ডাল্‌মা (২) বাঘমুণ্ডী (৩) টুন্ডি Hills (ধানবাদের কাছে)। গ্রামের নাম—কুলিং [,] বোঙ্গামারি [,] দক্ষিণ বহাল, তোড়াং, চন্দন বিয়ারী, সোনাজুড়ি, চন্দ্রকলা, ইন্দুরেরংটাঁড়। মহল বনা, বাড়েদা, টেঙ্গাডি, কেলুংগা, দুবরাজপুর [,] পলাশকলা। (পুরুলিয়া স্টেশন ওয়েটিংরুম, বেলা ৯টা [,]

১৭ই মার্চ, ১৯৪৩। ৩রা চৈত্র, ১৩৪৯। বুধবার।

ভোরে উঠে ট্রেন ধরতে এসেচি মি. সিন্‌হা ও আমি। ৯টা বাজে ট্রেনের দেখা নেই—হাঁ করে ওয়েটিং রুমে বসে আছি। একটি খুব সুন্দর মেয়েকে প্ল্যাটফর্মে দেখে স্টেশনশুদ্ধ [সুদ্ধ] চেয়ে রইল।

১৭ই মার্চ। আদ্রা রেলওয়ে কোয়ার্টার। ট্রেন স্টেশনে এল ন'টা। পথে আদ্রার নিকট জয়চণ্ডী পাহাড় দেখলুম। Lt. সত্য মুখার্জির বাংলায় বসে লিখচি। এইমাত্র আরাম করে স্নান করে এলুম। বেশ আরামের বাথরুম। বেলা ১২টা। ননীর বর্ণিত সেই জয়চণ্ডী পাহাড় ও রঘুনাথপুর। মোটর ট্রলিতে ১৫ মাইল পুরুলিয়া চলে এলুম—কি চমৎকার লাগল ! গতির বেগ

এত চমৎকার ! আমাদের গ্রামের খুড়িমা [,] ন'দি, পিসিমা বসে গল্প করচে। ফিরে এসে চা খেয়ে সত্যবাবুকে পৌঁছে দিতে আবার স্টেশনে মোটরে যাই। তারপর সভায় গেলুম। সাহেব বাঁধের ধারে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে। লাইব্রেরি দেখালে, অটোগ্রাফ নিলে। বেশ সভা—বহুলোক। সভান্তে জলযোগ হল। ভূতনাথ চিঠি লিখেচে কাল আসবে।

১৮ই মার্চ, ১৯৪৩। ৪ঠা চৈত্র, ১৩৪৯। বৃহস্পতিবার।

রাত্রে মশার বেশ উপদ্রব। দিন হোলে যেন বাঁচি। রাত তিনটে বাজল তখন জাগলুম। সেই থেকে জেগে রইলুম। সকালে উঠে কয়েকটি ছেলে এল দেখা করতে। তাদের সঙ্গে কথা শেষ করে হরিদা'র ভাগনে দক্ষিণেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করি ও বাড়ি এসে বসি। কিন্তু ভূতনাথ কোথায় ?দেখা নেই। এমন সময় এতোয়া মোটর নিয়ে এল ডেপুটি কমিশনার মি.শর্মার বাড়ি থেকে। গেলুম সেখানে, প্রার্থনা সম্বন্ধে তত্ত্ব আলোচনা। চমৎকার লোক মি. শর্মা। সেখান থেকে বার হয়ে পুরুলিয়া বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে মোটর দাঁড় করিয়ে কল্যাণীকে পত্র দিলুম। ফিরে গেলুম—ভূতনাথ নেই। খেয়ে রওনা মোটরে, বড় গরম, বলরামপুর বেশ টাউন—পার হয়ে চাণ্ডিলের মধ্যে এলুম। নিমডি ছাড়িয়ে সামান্য জঙ্গল ও ডালমা পাহাড়েও দীর্ঘ শ্রেণী সামনে। চাণ্ডিল গ্রাম অপকৃষ্ট খোলার বস্তি। সেই চাণ্ডিল, যেখানে নীরদবাবু বলেছিলেন অজগর খেলা করে। ডালমা পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে ঢুকে গাড়ি পূর্বমুখী হল। বহু গোলগোলি ফুলের ও পলাশের মেলা। আজ গোপালনগরের হাট, এখন হাট বসল, পঞ্চুমাস্টার ডাব আনচে গাড়ি করে। টাটা এসে এক বাড়িতে চা খাই। বড় সহর, ভালো রাস্তা। আশুর বাড়ি চা খেয়ে রওনা। পথে এক পাহাড়ে আগুনের খেলা—কুদাদা forest-এ। হু হু গাড়ি ছুটেচে, জ্যোৎস্না রাত্রি। লিচুতলায় এতক্ষণ যতীনদা এসে বসে মাঠাবুরুর চিঠি পড়চে। চলেচি, চলেচি মোটরে। কোথা থেকে কোথায়। কুদাদা পাহাড়ে আগুনের সাপের মতো কতদূর থেকে দেখা যাচ্চে। খড়কাই নদীর ধারে গাড়ি রেখে বেড়াই। চাঁইবাসা পৌঁছে ভবানী সিংয়ের বাড়ি বসলুম [।] সুবোধ ঘোষ আমরা পৌছুতেই গিয়ে হাজির। সুবোধের বাড়িতে এসে জ্যোৎস্নায় বসে সুবোধের স্ত্রী, সুবোধ সিংহ [,] আমি গল্প করি। সুবোধেরস্ত্রী বল্লেন—মাসিমাকে (?)আনলেন না কেন ?এসে খেয়ে গল্প। রাত ১।।০টায় শুই। ১০০ মাইল। পুরুলিয়া থেকে এসেচি আজ। মোট ৩২৫ মাইল মোটর ভ্রমণ হল এ কয়দিনে। আজ পথে আঁকোড় ফুলের বৃক্ষ—খুব বড় (Elangium Lamarkia) দেখেচি। কি শোভা ডালমা পাহাড়ে।

১৯শে মার্চ, ১৯৪৩। ৫ই চৈত্র, ১৩৪৯। শুক্রবার।

সকালে হরদয়ালের বাড়ি আসান গাছের ছায়ায় বসে গল্প করি ও চা খাই। বোরা নদীতে হরদয়াল, সুবোধ [,] দ্বিজু, [,] মিনু [?]সব স্নান করি মজা করে। ভবানী সিং ও গাইডকে নিয়ে ফিরে এলুম। নিভা ও লীলা এল দেখা করতে—বল্লে এবার রমাকে এনে আমাদের বাড়ি থাকতে হবে। ছড়িসে (?)যায়েগা, তো ভালুকমে মরে গা।

বেলা ৫।।০ শান্তি, ভবানী সিং, সিন্‌হা সবাই এলুম স্টেশনে। দেরি হল, ট্রেন ছাড়ল। টাটা আসবার আগে ডালমা পাহাড়ের আগুনের মেলা। বাদাম পাহাড়ের ট্রেনে একখানা বগিতে উঠে বসি। টাটা স্টেশনে হঠাৎ এখন মনে পড়ল কতদিনের কথা, গরুর গাড়িতে আসতে আসতে মুরাতিপুর থেকে বাবা বল্লে। তার মার বাড়ি যাবার (?)কথা। গোয়াড়ি দাদামশায়ের মৃত্যুর আগে।

২০শে মার্চ, ১৯৪৩। ৬ই চৈত্র, ১৩৪৯। শনিবার।

সকালে দ্বিজুবাবুর বাড়ি। রংপুর থেকে পত্র এসেচে সাহিত্য সম্মেলনের। বৈকালে ফুলডুংরির ওপারে একটা শিলাখণ্ডে জ্যোৎস্নায় বসে মনে কি অপূর্ব ভাব এল। ক্ষুদ্র এক পড়শীর চারা ও একটা উলু ফুল উর্দ্ধমুখে [উর্ধ্বমুখে] ফুটে। ভগবানের বিরাটত্ব এখানে বসে অনুভব করি। এই সৌন্দর্যস্রষ্টার কথা মনে হয়ে তাঁর সামনে (?)মাথা নুয়ে পড়ে। শিলাসনে অর্ধশায়িত অবস্থায় সে অপূর্ব অনুভূতি ! কতক্ষণ বসে রইলাম। উঠে আসতে ইচ্ছা করে না। দূরে জ্যোৎস্নালোকিত শালবন ও শৈলশ্রেণী। রাজেন গাঙ্গুলীর বাড়ি এসে বসি। দ্বিজুবাবুর বাড়ি এসে ভ্রমণের গল্প করি। আজ 'তৃণাঙ্কুর' হাতে পেলুম। গৌরী পাঠিয়েচে। কল্যাণীকে চিঠি দিই আসবার জন্যে।

২১শে মার্চ, ১৯৪৩। ৭ই চৈত্র, ১৩৪৯। রবিবার।

আজ সকালে সুবর্ণদেবী, ভিক্টোরিয়া দত্ত, মিস দাস চা খেতে বসেচেন এমন সময় আমি গিয়ে হাজির। একটু পরে নীরদবাবুরা এলেন। সারা দুপুর রং দেওয়ার ভয়ে গায়ে রেখাদের শাড়ি জড়িয়ে শুয়ে শুয়ে নীরদবাবুর সঙ্গে মাঠাবুরু ভ্রমণের গল্প করি। সন্ধ্যায় সুবর্ণ সংঘের মিটিং। মিস দাস ও প্রিন্স কামগার শাহ সভানেত্রী ও প্রধান অতিথি। আমি

প্রস্তাব করলুম। ভিক্টোরিয়া দত্ত গায়ে বেজায় রং দিলে খাবার সময়। পূর্ণিমার রাত্রি। নীরদবাবু কেবল বলেন, বিভূতিবাবু এসে বসুন না এখানে ! হাতে রংয়ের পিচ্‌কারী। বেশ আনন্দে কেটে গেল দিন।

২২শে মার্চ, ১৯৪৩। ৮ই চৈত্র, ১৩৪৯। সোমবার।

সকালে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে গল্প। দ্বিজুবাবু ছেলেদের ওপর চটা। আমি কল্যাণীর সেদিনের গান মনে করি। "আমার খোকা সাত সাগরের পার"—আমার খোকার কথা বল। আমাদের খোকা। হায়—সেই প্রত্যাশিত পুত্র ! ফুলডুংরির পাশে জ্যোৎস্নারাত্রে বেড়িয়ে আসি।

২৩শে মার্চ, ১৯৪৩। ৯ই চৈত্র, ১৩৪৯। মঙ্গলবার। ঘাটশিলা

সকালে বাইরে ছায়ায় এসে খাটিয়া পেতে বসে লিখি। ধরমশায় গল্প করেন। আমি দুপুরে ঘুমুই, কারণ রাত্রে ঘুম হয় নি। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে দেখি ভট্‌চাজ সাহেব দ্বিজুবাবুর ওখানে বসে ও সুবোধবাবু ডাক্তার। রেখার অসুখ দেখতে এসেচেন। বেলা গেল। রাজেন গাঙ্গুলীর বাড়ি গিয়ে বসলুম। চা খেয়ে নানা গল্প করতে চাঁদ উঠল। তারপর এসে আবার বসি দ্বিজুবাবুর বাড়িতে। জ্যোৎস্না উঠেচে—তবে মেঘও আছে। কালকার মতো ভীষণ গরম হাওয়া বালু নেই। আহারাদির পরে চেয়ার পেতে বাইরে বসে রইলাম।

২৪শে মার্চ, ১৯৪৩। ১০ই চৈত্র, ১৩৪৯। বুধবার।

সকালে বসে পড়ি ছায়ায়। এত দীর্ঘদিন ঘাটশিলাতেও তো কখনো থাকিনি। রাজেনবাবু যন্ত্রপাতি সমেত এসে জানলা সারিয়ে দিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ রইলেন। দ্বিজুবাবুর নাতনী এসেচে, ডেকে পাঠালেন দ্বিজু। ওরা এসেচে ঝাড়গ্রাম থেকে। বিকেলে ধরমশায়ের সঙ্গে আশ্রমে ও রায়মশায়ের বাড়ি বেড়াতে গেলুম। একজন লোকের মধ্যে বেশ প্রকৃতির ওপর অনুরাগ দেখলুম। তাকে নিয়ে এঁদেলবেড়ার জঙ্গলে যাবো বেড়াতে। শরৎ বাবুর স্মৃতি সভায় নিমন্ত্রণ করেছিল—আমি যাইনি। ধরমশায় ও দ্বিজুবাবু প্রবন্ধ পড়েছিল।

২৫শে মার্চ, ১৯৪৩। ১১ই চৈত্র, ১৩৪৯। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে লিখি। দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে গাছের ছায়ায় বসি। ওর নাতি এসেচে ওবেলা নিমন্ত্রণ করলেন। রাত্রে উনি নিমন্ত্রণ করলেন। বিকেলে ধরমশায়ের সঙ্গে স্টেশনে গেলুম কল্যাণীকে আনতে—কারণ আজ কল্যাণী আসবে। ডাক্তারখানায় বসলুম [।] ট্রেন এল, কল্যাণী নামল—যখন ডাক্তারখানার কাছে এলুম, তখন এল নুটু। রাত্রে দ্বিজুবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাই ও চলে আসি। কল্যাণীর সঙ্গে গল্প করি অনেক রাত পর্যন্ত।

২৬শে মার্চ, ১৯৪৩।১২ই চৈত্র, ১৩৪৯। শুক্রবার।

দুপুরে ঘুমিয়ে উঠেচি এমন সময় মি. সিন্‌হা এল। চা ও খাবার খাওয়া গেল—খুব গল্প। লাহিড়ী মহাশায় [মহাশয়] বেড়াতে এলেন—ওঁকে সঙ্গে নিয়ে আমরা গেলুম এঁদেলবেড়ার বনে। কচি শালপাতা ওঠা বনের বড় শোভা হয়েচে। সেই ridgeটার পাশে গোলগোলি ফুলগুলি এখনো আছে, তবে নিষ্প্রভ হয়ে এসেচে। আমরা নেমে গিয়ে বনের ঝরনার মধ্যে সেই শিলাসন খুঁজে নিয়ে ওখানে বসলুম। বনে আগুন দিয়েচে। গাছপালার ফাঁকে সান্ধ্যতারা। মোহনবাবুর বাড়ি এসে কলোনিতে জল খেলুম। বাড়ি এসে রাত ১২টা পর্যন্ত গল্পগুজব। মি. সিন্‌হা ১২টার পরে মোটরে রাখা মাইন্‌স্ চলে গেল।

মহাদেব রায়ের পত্র এল আজ। খড়কপুরের সাহিত্য সম্মেলনের দিন পিছিয়ে গেল।

২৭শে মার্চ, ১৯৪৩। ১৩ই চৈত্র, ১৩৪৯। শনিবার।

সকালে নুটুর সঙ্গে গল্প করে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে বসলুম। কল্যাণী ওদের খুকুর গল্প করচে। বিকেলে রায়মশায়ের বাড়ি ও রাজেনবাবুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

২৮শে মার্চ, ১৯৪৩। ১৪ই চৈত্র, ১৩৪৯। রবিবার।

আজ বিকেলে বেড়াতে বার হয়েচি—লাহিড়ী এসে আমতলার দোকানের কাছে ধরলে। দুজনে বেড়িয়ে প্রথমে ridge ও পরে হ্রদ ও হ্রদ ছাড়িয়ে ওপারের বনে বেড়াতে গেলুম। ভুররু ফুল ফুটেচে ঠিক যেন বাগানের মতো। যেদিকে চাই সেদিকে। করন্ধা ও বালিয়াকাণ্ড (?)দেখলুম অনেক গাছে। গন্ধে সুবাসিত বনভূমি। লাহিড়ী বল্লে ফুলের এমন সুগন্ধ সে কোথাও দেখেনি আগে। ম্যাঙ্গানিজ্ কোম্পানির রাস্তা দিয়ে রাত্রে ফিরে এলুম।

২৯শে মার্চ, ১৯৪৩। ১৫ই চৈত্র, ১৩৪৯। সোমবার।

আজ বিকেলে নুটু, কল্যাণী, বৌমা, উমা ও দ্বিজুবাবুর সঙ্গে আবার সেই বনে বেড়াতে যাওয়া গেল। বনের মধ্যে যে বাড়ি তার ছাদের ওপর উঠে চারিদিক দেখতে কি ভালোই লাগল। দূরে হ্রদ, একদল সাদা বক বসে আছে জলের ধারে, একদিকে নীল পাহাড়— ভগবানের এই এক রূপ। কতরূপে যে তিনি আছেন ! একটা ছোট খেজুরচারায় খেজুর ফলেচে থোলো থোলো। রাত্রি৮টায় ফিরি। বাইরে বসে নুটু ও আমি গল্প করি। একরাশ করন্ধা ও বালিয়াকাণ্ড এনেচি। লতা পলাশ ও ভুররু ফুলের কি শোভা !

৩০শে মার্চ, ১৯৪৩। ১৬ই চৈত্র, ১৩৪৯। মঙ্গলবার।

আজ লাহিড়ীমশায়ের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। চা খেয়ে দুজনে নদী পার হয়ে তুষার কূটে গেলুম। সেই গিয়েছিলুম রামকৃষ্ণের সঙ্গে (কমলের ভাই)। বেশ চমৎকার পাহাড়—খুব rugged, কাঁটাগাছ যথেষ্ট। দেখতে ভালো—আমার তো ভালোই লাগল। কোয়ার্জ পাথরের ridge—দুটো পাহাড়েই উঠলুম—সেবার বাঁদিকের ছোটটাতে উঠিনি। নদীতে আসবার পথে হয়ে গেল অন্ধকার। গর্তে পড়ি, খানায় পড়ি—হাতড়াতে হাতড়াতে অনেক কষ্টে এলুম নদীর ধারে। নদী পার হয়ে বাড়িতে আসি রাত ৯টাতে।

৩১শে মার্চ, ১৯৪৩। ১৭ই চৈত্র, ১৩৪৯। বুধবার।

আজ সকালে রমণীবাবুর সঙ্গে জমি দেখতে নদীর ধারে। তিনি বল্লেন, নদীর ধারে নাকি ঘন শালবন ছিল। যতীনবাবু এটর্নি একবার এসে বলেছিলেন, বড় চমৎকার শালবন। এখন সে সব কোথায় ?বিকেলে ফুলডুংরি পাহাড়ে গিয়ে বসি। একমনে প্রকৃতির শোভা দেখি। কচি কলার পাতা ওঠা রংয়ের নির্জন নতুন শালবন ও বুরুডির পাহাড়। এ যেন ভগবানের নতুন রূপ। যদি কেউ এমন সুন্দর ভুররু ফুল ও করন্ধা ফুল ফোটা ও সাদা কোয়ার্জের স্তূপ ছড়ানো বনভূমি আমার কাছে বিক্রি করত, যে বনে দশ বছরের পুরোনো মোটা গুঁড়িওয়ালা করন্ধা ও ভুররু হয়েচে, ছায়া, পাখি ডাকচে—এসব আমি কাটতে পারতুম না, যদি দশ হাজার টাকাও দাম হোত।

১লা এপ্রিল, ১৯৪৩। ১৮ই চৈত্র, ১৩৪৯। বৃহস্পতিবার।

আজ ক'দিন ধরেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচরিত ও কথামৃত পড়চি। বেশ ভালো লাগচে। সাকার ও নিরাকারের সমন্বয় চমৎকার করেচেন। ভগবান আছেন কিনা, এ মতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে কতকাল থেকে Imperial Library থেকে বই খুঁজচি ১৯৩৬/৩৭ সাল থেকে। "God"এই কথা ইংরিজিতে দেখলেই মনের ভেতর কেমন করে ও সে বই কিনে তখনই জানবার চেষ্টা করি। তিনি আছেন কিনা। এক সময়ে সন্দেহ জাগে, এক এক সময়ে চলে যায়। এই বছর Stainton Moses-এর Spirit teachings পড়ে God যে নিশ্চয়ই আছেন, সে কথা ভালোভাবে বুঝলুম, বিশ্বাস দৃঢ় হল—এই যখন মনের অবস্থা, তখন এই শ্রীম-কথিত রামকৃষ্ণচরিত ও মায়াবতী আশ্রম থেকে প্রকাশিত জীবনচরিত দুখানা আজ দিন ৭/৮ হাতে এসেচে। পড়ে বুঝলুম হাতের কাছে এমন বই সব ছিল, এ ফেলে বিনা অন্ধকারে হাতড়ে মরেচি এখানে ওখানে ?এ বছরটা নানা কারণে অদ্ভুত। ভ্রমণ ও God সম্বন্ধে।

অনেকক্ষণ ফুলডুংরির সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়ে আজও বসলুম—সেই কচি কলাপাতা ওঠা শালবন, কোকিল ডাকচে—দূরের বারাকপুরের কথা মনে হল। এই সময় কত পাখির ডাক, বকুল ফুলের কি সুমিষ্ট গন্ধ—সবই তাঁর রূপ ! বিভিন্নরূপে তাঁরই প্রকাশ ! দ্বিজুবাবুর সঙ্গে রাত্রে অনেকক্ষণ সমালোচনা।

২রা এপ্রিল, ১৯৪৩। ১৯শে চৈত্র, ১৩৪৯। শুক্রবার।

আজ সকালে চা খেয়ে ধরমশায় এল বলে দ্বিজবাবুর বাড়ি গিয়ে ঘোর তর্ক। ভগবান সম্বন্ধে ডাকার বা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করবেন না। বড় গরম দুপুরে। একটু ঘুমিয়ে উঠে চা খেয়ে ভট্চাজ সাহেবের বাড়ি। ডুংরি থেকে ওপারের পাহাড় ও কচি পাতাওঠা শালবনের দৃশ্য বড় মনোরম। ভট্চাজ সাহেবের বাংলোতে গিয়ে কত গল্প ও আলোচনা করি। রাত্রে ফিরেএলুম—পাহাড়ে পাহাড়ে আগুন দিয়েচে। বড় সুন্দর দৃশ্য। এই বিশ্বপ্রকৃতিকে ভগবানের রূপ বলে উপাসনা করবো। সব দিকে তাই, যখন দেখি কচি পাতা ওঠা শালবন— তখনোই ভাবি—হে অনন্ত ভগবান, এই আপনি নানারূপে সামনে।

এই কথাটা ভাবলে নতুন নতুন প্রাকৃতিক দৃশ্য beauty of sense enjoyment-এর দিক থেকে নয়—একটা আধ্যাত্মিক আনন্দ এর সঙ্গে জড়ানো থাকবে। সব প্রাকৃতিক দৃশ্যই তাঁর রূপ। তিনি নানারূপে। আনন্দ কর তাঁর রূপ দেখো। প্রতিদিন নির্জনে তার কথা চিন্তা—আর একটা lesson। এই করচি রোজ।

৩রা এপ্রিল ১৯৪৩। ২০শে চৈত্র, ১৩৪৯। শনিবার।

আজ সকাল 'ভারতে বিবেকানন্দ' বইখানি পড়ি। তারপর স্নান সেরে খেয়ে একটু ঘুমুই। লিখি উঠে। মহাদেব রায় আসবার কথা ছিল, কিন্তু যখন দ্বিজবাবুর বাড়ি বসে গল্প করচি, তখন ট্রেনখানা এল। গোপালবাবু এসেছিল, তাকে সাইকেলে পাঠালুম গুট্‌কের কাছে। আমি ছুটি, কিন্তু শুনলুম আসেনি। ডাক্তারখানায় খানিকটা বসে ফুলডুংরি কলোনিতে সেই বাড়ির রোয়াকে দিয়ে বসি। তারাভরা রাত্রি অন্ধকার হয়ে গেছে—নির্জন, নিস্তব্ধ। ওখানে বসে ঁভগবানের কথা চিন্তা করি। মনে বড় শান্তি হল। এই নক্ষত্রজগৎ তাঁরই সৃষ্টি। একটা অনুভূতি অনেকদিন থেকে খুব সহজ হয়ে গেছে—মনে ভয় নেই। 'I AM'এ কথার অর্থ সহজ হয়ে গেছে, জোর করে আনতে হয় না। আমি চিরকাল আছি, চিরকাল থাকবো—একথা এখন Common places of knwoledge হয়ে উঠেচে আমার মনে। ভগবানে ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে যায় মনে। জগতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই—সবই তিনি, একথাটা সর্বদা বুঝতে চেষ্টা করচি। এ একটা নতুন lesson যা নতুন শিখেচি, এখনো আয়ত্ত হয়নি। তবে ভয়, পাপের sense, এ সব আর নেই। মন খুব নির্ভীক হয়ে উঠেচে—তাঁরই কৃপা। এসব উন্নতির লক্ষণ আজ যোগী রামচরণের (?)বইতেও দেখলুম। এই একটা নতুন lesson নিয়েচি—সব প্রাকৃতিক দৃশ্যই ভগবানের সাকার রূপ। যা কিছু দেখচি—পাহাড়, নীল আকাশ, পাতাওঠা শালবন, ঝরনা, পাখির কলরব—সব তিনি। সাকার ঈশ্বর।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৩। ২১শে চৈত্র, ১৩৪৯। রবিবার।

সকালে একপাতা লিখে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করে এলাম। নুটু এসেচে, তার সঙ্গে নানা গল্প করি। দুপুরে বেজায় গরম। বৈকালে বেড়াতে বার হই। শালবনের কচি পাতাওঠা গাছগুলোর পাশ দিয়ে বনের মধ্যে বসে অপূর্ব দৃশ্য দেখলুম। নিস্তব্ধ শালবন; করন্ধা পুষ্পসুবাসিত বায়ু—দূর বনে কোকিল ডাকচে, ভালকি বনের তাঁবুতে গভীর নিশায় যে কাঠঠোক্‌রা পাখির স্বর শুনতাম—তাও শুনি। মন আনন্দে পরিপূর্ণ—আজ হাটবার গোপালনগরের। বহুবার আসি যাই, ক্ষতি নেই—এই সৌন্দর্য দর্শন করি, এর স্রষ্টা ও শিল্পীকে ভক্তি করি অর্থাৎ ভগবানকে। হয়তো সে ভগবান মনের সৃষ্ট-নামরূপধারী ভগবান—কিন্তু ব্রহ্ম থেকেই তাঁর উৎপত্তি তো।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাস্থুর্মনোমতং [ম্]

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

কেনোপনিষৎ ১/৫/

"যখন ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াছে বলা যায়, তখন তিনি আর ব্রহ্ম নহেন। ঈশ্বর আমাদের কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। যাঁহাকে পূজা করা যায়, সেই সগুণ দেবতা হইতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ পৃথক। ["]

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

অন্ধকারে দু একটি তারা উঠল, চলে এলুম।

রাত্রে নুটুর সঙ্গে বাইরে বসে জাঙ্গিপাড়ার গল্প করি। কল্যাণী বলে—মান্‌কু, রাম রাম বল তো ?তুমি কে ?

৫ই এপ্রিল, ১৯৪৩। ২২শে চৈত্র, ১৩৪৯। সোমবার।

কল্যাণী গল্প লিখচে দুপুরে মেজেতে। উৎসাহের সঙ্গে বল্লে—খুব চমৎকার একটা গল্প লিখচি আমায় আর তোমায় নিয়ে। একটু পরে কাগজের পিঠে একদিকে লিখচে নিয়ে কি যেন বলেচি, ওর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মনে কষ্ট হল। 'দেবযান'-এর যতীনের অদ্ভুত দর্শনের অধ্যায়। কতকাল বাদে আবার বই আরম্ভ করেচি গত ২৫শে মার্চ। সেই ১৯৩৭ সালে খুকুকে শুনিয়েছিলুম, আর নয়। বোধ হয় এ বইয়ের উপযুক্ত মন ছিল না।

বিকেলে রমণীবাবুর বাড়ি ছাড়া আর কোথাও [—]

৬ই এপ্রিল, ১৯৪৩। ২৩শে চৈত্র, ১৩৪৯। মঙ্গলবার।

খুব ভোরে উঠে এঁদেলবেড়ার বনমধ্যস্থ হ্রদে সান করে এলুম। বড় আনন্দ পাই। করন্ধা ফুল ফুটেছে—শিশিরস্নাত ভুররু এখনো গাছে গাছে। অনেকখানি টলটলে নির্মল জলরাশি। কোকিল ডাকচে বনে, একদিকে দূরে পাহাড়। স্নান করি, প্রাতঃসূর্য উঠেচে শালবনের ওপারে—সবে উঠেচে। ভগবানের কাছে নবীন দিনের আনন্দ জানাই। তর্পণ করি। এমন আনন্দ পাইনি অনেকদিন। কাল বেড়ানো হয়নি—আজ শোধ তুলে নিলুম। যখন বাড়ি ফিরেচি তখন বেলা সবে ৭৷৷০টা। নাগপুরে ট্রেন গেল, আমি তখন লরি সাহেবের বাড়ির নীচে।

দুপুরে বেজায় গরম। আমি লিখি। কল্যাণীও মেজেতে বসে লেখে গল্প। একটু ঘুমিয়ে উঠি বঙ্কিমবাবুর বাড়ি যাবো বলে, কিন্তু বাণী রায়ের বাবার সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ি এসে গল্প করি, বাণী রায়ের মা ও বাবার সঙ্গে দুতিন ঘণ্টা। বনভ্রমণের গল্প। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরি।

৭ই এপ্রিল, ১৯৪৩ ২৪শে চৈত্র, ১৩৪৯। বুধবার।

আজও সকালে উঠে বেড়াতে গেলুম পুকুরটা পর্যন্ত। এঁদেলবেড়ার পুকুর নয়—অন্য পুকুর—যেটা কাছে। নবোদিত সূর্য যেন সমুদ্র থেকে উঠচে কি শোভা ! আসবার সময় দ্বিজুবাবুর বাড়ি থেকে বসে গল্প করে ফিরি। দুপুরে ঘুমিয়ে সইমা, পুঁটি দিদি, জ্যাঠামশায়, মা ও খুকুর স্বপ্ন দেখি একসঙ্গে। ঘুমিয়ে উঠে দেখি মেঘ করেচে। বেড়াতে বার হই, বেলা ৪টার বেশি নয়। ফুলডুংরির পিছনে শালবনটার মধ্যে একস্থানে বসি। ভগবানের চিন্তা করি। Entering into silenceটা বেশ অনুভব করা গেল। তারপর উঠে কত করন্ধা গাছের ফুটন্ত ফুলের সুগন্ধের মধ্যে কাশিদার রাস্তায় চলি। রাস্তা আর কিছুতেই মেশে না বড় রাস্তায়, অবশেষে বনের মধ্যে একটা সরু রাস্তা ধরে চলে দেখি সামনে দুটো মস্ত বড় করন্ধা গাছ। ফুল কি ফুটে আছে ! একটু এগিয়ে চমৎকার একটা জায়গা সামনে কাশিদার রাস্তা। সেই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এসে কিছুদূরে একটা ছবি বড় অপূর্ব দেখলুম। সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মাথায় রক্তবর্ণ বড় সিঁদুরে টিপের মতো লাল সূর্যটা অস্ত যাচ্চে। সে যে ভগবানের কি বিরাট রূপ ও জায়গাটা খুব উঁচু। খুব ভালো দৃশ্য। সে সূর্যাস্তের দৃশ্য অনেকদিন মনে থাকবে। জীবনে একটা ভালো দৃশ্য দেখলুম বটে। শালবনের মধ্যে একটা বাড়ি, পার্ক মতো করে রেখেচে অনেক শাল ও দু'একটা বটগাছ বজায় রেখে।

গোপালপুরের রমণী মুখুজ্যের বাংলোর পাশে এলুম পাওড়া গ্রামের মধ্যে দিয়ে। রাত্রে ভীষণ উত্তপ্ত হাওয়া। মেঘ।

৮ই এপ্রিল, ১৯৪৩। ২৫শে চৈত্র, ১৩৪৯। বৃহস্পতিবার।

কাল রাতের ভীষণ গরমের পরে আজ সকাল থেকেই মেঘলা। লিখে স্নান করে এলুম। গুট্‌কে এসে বল্লে নুটু টাটায় গেল মোটরে। আমি ঘুমিয়ে উঠে চা খেয়ে বেরুই। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ঠাণ্ডা দিনটা। প্রথমে লরি সাহেবের বাড়ির পিছন দিয়ে পুকুরধারের মাঠটাতে একটা পাথরে বসি। সামনে পাহাড় ও কচি শালবনের নীচে গালুডি রোডের সাঁকোটা বিলিতি ছবির মতো দেখাচ্চে। সেখানে এল ঝড় ও টিপটিপ বৃষ্টি। উঠে গেলুম পেছনে একটা বড় পাথরে। সেখান থেকে আরো পাহাড় দেখা গেল কোণের দিকে। ভগবানের কত রূপ। সেখান থেকে এঁদেলবেড়ার বনের ধারে সেই গাছের গুঁড়িটায় বসে গাছের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হই। জাম, লোহাজাঙ্গি, করন্ধা—আরো কত গাছ। সেখান থেকে উঠে বনের মধ্যে ঢুকে ঝরা শুষ্কপাতার গন্ধেভরা বনতলে বসি। কি সুগন্ধ করন্ধা ফুলের ! বনের মধ্যে হেঁটে ridgeটাতে বসি পাথরে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সেখান থেকে উঠে শালবনের মধ্যে দিয়ে এলুম ফুলডুংরিতে আমার প্রিয় সেই স্থানটিতে। অনেকক্ষণ সেখানে বসে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি। নুটু এল, টাটায় গিয়েছিল [,] রাত্রিটা রইল।

মি. সিন্‌হার পত্র এল। চাঁইবাসাতে থাকবো লিখেচেন। সুবোধবাবু পুরুলিয়া গেছে।

৯ই এপ্রিল, ১৯৪৩। ২৬শে চৈত্র, ১৩৪৯। শুক্রবার।

আজ বেশ মেঘলা দিন নয়, রোদ উঠেচে—কিন্তু জোর নেই রোদের। বাতাস গরম নয়। দ্বিজুবাবুর বাড়ি গেলুম সকালে উঠে। দুপুরে 'ভারতবর্ষ' পড়লুম। বিকেলে পাওড়া গ্রামের মধ্যে দিয়ে কাশিডীর সেই শালবনের পাশ দিয়ে অনেকদূর চলে গিয়ে খরস্রোতা নদী পার হয়ে এক বড় প্রস্তরস্তূপে বসলুম। উঁচু জায়গাটা, বড় পাথরের চওড়া রোয়াকের মতো স্থান। সূর্য অস্ত যাচ্চে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির ওপারে। ছোট টিলার ওপরে কতকগুলো নিমচারা। ডাইনে ভালকি পাহাড় ও অরণ্য দূরে সুবর্ণরেখার ওপরে নীল দেখাচ্চে। পাখির ডাক, নিকটে কোনো গ্রাম নেই—বনানীর মধ্যে স্থানটা মনোরম। তবে শেওড়াগাছের মতো শালচারা সামনে, বন সাবাড় করে দিয়েচে—তেমন বন নেই—অর্থলোলুপ ঠিকাদারদের উপদ্রবে কোথাও বড় গাছ কি থাকতে পারে ?কোনো দেশেই না। দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আফ্রিকা থেকে কাঠ এনে ব্যবসার

সুবিধে নেই, তাই সেই সব দুর্গম স্থানে আদিম অরণ্যানী এখনো আছে। মানুষের দুর্নিবার লোভ নয়তো সে সবও এতদিন উচ্ছন্নে দিত। সন্ধ্যার আগেই হেঁটে ফিরে এলুম। সামান্য চাঁদ উঠেচে, মেঘে ঢাকা।

কল্যাণী বলচে, আমার ছেলের বৌমার জন্যে তুমি কি কি গহনা দেবে ?তাবিজ দিতে হবে। বৌমার মুখ দেখতে হবে এই দিয়ে। আমার বৌমার জন্যে এসব আমি রেখে যাবো। আমার ছেলে হবে কেমন মোটাসোটা—কেমন মজা !

১০ই এপ্রিল, ১৯৪৩।২৭শে চৈত্র, ১৩৪৯। শনিবার।

আজ সকালে লিখি, কিন্তু লেখা ভালো অগ্রসর না হয়ে বেধে গেল (দেবযান)। দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি নবাব আসবে বলে টেবিল সাজাচ্চে। বল্লে—ওবেলা এলেন না কেন ?নবাব কত খাবার পাঠিয়েছিল। আমি ডাক্তারখানায় গেলুম। নাগপুর প্যাসেঞ্জার এল বড় দেরীতে। মহাদেব রায় এল—ওকে নিয়ে গেলুম ফুলডুংরির কাছে—ফিরে এসে রাত্রে কূর্মশিলায় বসলুম জ্যোৎস্নারাত্রে।

১১ই এপ্রিল, ১৯৪৩। ২৮শে চৈত্র, ১৩৪৯। রবিবার। ষষ্ঠী

সকালে মহাদেবকে নিয়ে সুবর্ণরেখাতীরে বেড়াতে যাই। তারপর স্নানআহার ও বিশ্রাম করে এঁদেলবেড়ার জঙ্গলে ও Lakeএ যাই ওকে নিয়ে। Lakeএ নিয়ে গিয়ে জল খেয়ে জলের ধারে বিশ্রাম করি। খুব জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নারাত্রে ফিরি। নুটুর সঙ্গে ফুলডুংরিতে দেখা। আমরা বসে গল্প করচি, বড়াজুড়ির একটি গরিব লোক নীলকণ্ঠের গান গাইতে গাইতে যাচ্চে—"পোড়ে কোঠা বাড়ি ছোটে টালিচুন"। বাবা গাইতেন গানটা। সে এসে বসল। তাদের গাঁয়ে চাল দুষ্প্রাপ্য, মহুয়া ফুল সিদ্ধ করে খেয়ে আছে। আমরা তাকে গান করতে বল্লুম। মহাদেব রামকীর্তন গাইলে। খেয়ে গল্প করে রাত্রের ট্রেনে চলে গেল।

১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩। ২৯শে চৈত্র, ১৩৪৯। সোমবার।

সকালে নুটু চলে গেল বসে লিখচি, এমন সময়ে একখানা মোটর এল। মি. সিন্‌হা সপরিবারে নামলেন। আমরা গল্প করচি, সিন্‌হা চলে গেল বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে। তারপর আমরা সবাই গেলুম নিমন্ত্রণে। সেখান থেকে কল্যাণীরা চলে এল, আমি, ইন্দুবাবু ও মি. সিন্‌হা চলে গেলুম ধলভূমগড়ে। নুটুর আপিসে গেলুম প্রথমে, সেখান থেকে ইন্দুবাবুর আপিসে। চা ও খাবার খাওয়া। ভোলাবাবু বলে মুরাঠাকুরা গ্রামের (নদীর ওপারে ভাল্‌কীblockএ) অধিবাসীকে ideal গৃহস্থ বলাতে সিন্‌হা ও আমি দুজনেই চটে গেলুম। তুমি পেঁপে গাছ কর ?আজ্ঞে দুটো গাছ আছে। গরু ?আজ্ঞে দুটো। বললুম—কিরকম ideal গৃহস্থ তবে ?চা ও খাবার খেয়ে চাকুলিয়া diversion roadএ শ্যামল বনানী ও সমতল মাঠে অনেকদূর বেড়াতে গেলুম। বড় বড় শিমূল ও বটগাছ। দৃশ্যঅতি সুন্দর। নুটু ছিল সঙ্গে। ওকে নামিয়ে আমরা ৭ মাইল চলে এলুম মোটরে নিজের বাড়ি। মি. সিন্‌হা চলে গেলেন। রাত্রে মিলিটারি ট্রাক নিয়ে নুটু এল ওষুধ নিতে। সে তখনি চলে গেল। আমরাগল্প করি অনেক রাত পর্যন্ত।

১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৩। ৩০শে চৈত্র, ১৩৪৯। মঙ্গলবার। অষ্টমী। ঘাটশিলা—চাঁইবাসা

সকালে উঠে বাঁধে মুখ ধুয়ে এলুম ও বেড়িয়ে। মি. সিন্‌হা রাত্রে একদম উঠানে শুয়ে খাটে। তারপর আমরা চা খেয়ে গল্প করি। ওরা বেড়িয়ে গেলে আমি দ্বিজুবাবুর বাড়ি, দ্বিজুবাবু বল্লে—বড্ড যে মোটর যাতায়াত করছে ?কেঁদ পাতার (?)এক contractor এল, ৭০০০ টাকা দেয় গবর্নমেন্টকে। খরচ করে ৪০,০০০ টাকা। সারা ধলভূমে কেঁদ পাতা নেয়। ছ বান্ডিল of 60 leaves each হচ্চে এক পয়সা মজুরি। পাতা কুড়িয়ে আনে বন্য নরনারী। স্নানাহার করে বসে আছি। ওদের Lunchএর নিমন্ত্রণ, মিসেস্ কলওয়ারের বাড়ি। আমরা ৪॥০৫টার সময় বার হয়ে মিসেস্ খান্নার ওখানে চা খেয়ে যাই রাখা মাইনস্। Range officer মি. ভার্মার স্ত্রীর সঙ্গে ?ও দেখা করতে নামল কল্যাণী ও মিসেস্ সিন্‌হা। পথে আধ-জ্যোৎস্নার সুন্দর দৃশ্য। খড়কাই পার হয়ে একটু বসলুম জ্যোৎস্নায় নদীর ধারে। রাত ৮।।০ টায় চাঁইবাসা। সুবোধের (?)বাড়ি গিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রে গল্প করি। পথে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি রাখা মাইনে Lt. Bose ও জহুরির সঙ্গে তাঁবুতে বসে গল্প করি। রাত ১২টা পর্যন্ত আইয়াঙ্গার সম্বন্ধে গল্প।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৩। ৩১শে চৈত্র, ১৩৪৯। বুধবার। নবমী। চাঁইবাসা

সকালে উঠে চা খেয়ে গল্প করি। সুবোধ এল। খুব আড্ডা ও গল্প। একটু পরে নিভাননীদের বাড়ি গেলুম সবাই মিলে। অবিনাশবাবু ও বর্ষার [?]অসুখ। সুবোধের সঙ্গে ওর বাড়ি গেলুম। সেখানে এল লালসাহেব মুসাবনীর। বাড়ি এসেচে,

দেখা করতে এল Lt. চৌধুরী চক্রধরপুরের। ইতিমধ্যে ভবানী সিং চায়ের নিমন্ত্রণ করাতে [করতে] এল। মি. লাল এখানেও এল, তখন আমি শুয়ে। হরদয়াল রাঁচিতে বদলি হয়েচে। বৈকালে মোটরে সবাই মিলে ভবানী সিং-এর বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণে। শান্তি কাল কলকাতা যাচ্চে। বাইরে ফাঁকা আকাশতলে সবাই বসি। বৈকাল বেলা। রামনবমী আজ। বাল্যকালের মতো কোথায় দোল হচ্চে গোঁসাই বাড়ি—এতক্ষণ যুগলো ময়রার দোকান বসেচে। সেই কতদূরে সেই গ্রামের চড়কতলায় চড়ক পুজো হচ্চে। বাবার সেই শ্লোক 'যোষা দোষাপ্পাদস্মনুদিনং নিত্য বোধ তপস্বী' [?]কথা মনে পড়ল। ওখান থেকে এলুম সুবোধের বাড়ি [—] রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ। জ্যোৎস্নায় বসে স্পেশাল [?]সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সিন্‌হা, সুবোধ ঘোষ, কালিদাস মিত্র সবাই কথা বলি। কথায় কথায় ধরা পড়ল কালিদাস মিত্র বনগাঁর সুরেন উকিলের কাকা। রাত ১২।। টা পর্যন্ত গল্প।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৩। ১লা বৈশাখ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার। দশমী। চাঁইবাসা

আজ ১লা বৈশাখ। ১৩৫০ সাল পড়ে গেল। আর বছর এই দিন চালকীতে। আজ চাঁইবাসাকল্যাণী মহিলা সমিতির সভানেত্রী হবে, চিঠি দিয়ে গেল। বেলা ১২টা পর্যন্ত কল্যাণী গল্প পড়লে, আমি 'দেবযান' পড়লুম। ভবানী সিং ও শান্তি এল, আমি মাসিমাকে চিঠি লিখে দিলুম কাল টাটা হয়ে ঘাটশিলা যাচ্চি।

দুপুরে সুবোধের বাড়ি খেয়ে আমি গল্প করি। কল্যাণী ও সুবোধের স্ত্রী সভায় বেরিয়ে চলে গেল, কল্যাণী সভানেত্রী। আমরা a.r.p. sports দেখতে গেলুম। আজ বৃহস্পতিবার—এতক্ষণ গোপালনগরের হাটে মনো রায় বিড়ি বিক্রি করচে, এই কথাই মনে হল। পরের বৃহস্পতিবারে বা রবিবারের হাট আমরা গিয়ে করবো বারাকপুরে। কোথায় চাঁইবাসা, কোথায় গোপালনগর ! আমরা নলিনী মিত্রের বাড়ি বসে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করি। সুন্দর বৈকাল, মিনফুলের সুগন্ধ বাতাসে। ভগবান সম্বন্ধে চিন্তা করি মনে মনে। তাঁরই কৃপায় এখানে আজ বেড়াচ্চি। নইলে গোপালনগর স্কুলে পড়ে থাকতুম। সভা হল, ?বক্তৃতা করলে। 'ডাকঘর' অভিনয় হল। রাত ১২টায় সভা থেকে ফিরে দেখি কল্যাণী সভা থেকে ফিরেচে। বাবার পুত্রবধূ মোটরে সভানেত্রী হয়ে ফিরে এল।

১৬ই এপ্রিল, ১৯৪৩। ২রা বৈশাখ, ১৩৫০। শুক্রবার। চাইবাসা। টাটা

সকালে উঠে কোল্‌হান পার্কের পুকুরে স্নান করচি, এমন সময়ে পরেশ সান্ন্যাল দেখি আসচে। সে সিগারেট দিলে, ধরিয়ে তার সঙ্গে গল্প করি। তারপর চা খেয়ে বসে আছি, সুরেশ সরকার এসে কল্যাণীকে ওর বাড়ি নিয়ে গেল। একটুপরে আবার সুরেন এসে আমাকে নিয়ে গেল ডেকে ছেলেকে আশীর্বাদ করতে। কল্যাণীকে নিয়ে নিভাননীদের বাড়ি দিয়ে এলুম। তারপর কালিদাস মিত্র এসে বিলেতের পাওয়ার স্ট্রীটের গল্প জুড়লে। সুবোধের গাড়ি এল ১২-৩০টায়। আমরা উঠে সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে টাটা আসচি। কুদাদা শৈলশ্রেণীর মধ্যে সৈন্যেরা গোলা ছুঁড়চে। গাড়ি থামিয়ে দিলে। তারপর টাটা ঢুকে আশুদের বাড়ি মোটর এল। মি. সিন্‌হা সেখানে ঘরে বসে বই পড়চে। আমরা খেয়ে আড্ডা দিই। কল্যাণীকে ওরা আদর করলে খুব। বেলা ৪টার সময়ে মোটরে বেরিয়ে পড়ি। রাজদা'র সুন্দর শৈলমালার ছায়া পড়েচে, নিমফুলের সুগন্ধ সারা পথে। হাটতোলা বলে একটি গ্রাম কল্যাণী দেখে বল্লে—কি চমৎকার ! কেবল বলে, কি সুন্দর পথ, জগতে কত সৌন্দর্য। আমি ভাবচি ইছামতীতে নৌকা ভাসচে, কুঠীর মাঠে ছায়া পড়েচে। সুবোধদা এসে গল্প করচে লিচুতলায়। হ্যাঁ, আজ চাঁইবাসা থেকে নববর্ষের প্রণাম জানিয়ে পত্র দিয়েচি মন্মথদাকে। দূর থেকে সিদ্ধেশ্বর শৈলশৃঙ্গ থেকে ভাবলুম—দেশে এসেচি। কল্যাণীকে বলি—ওই দ্যাখো দেশে এসেচি। বহুদিন আগে শরতের সন্ধ্যায় ইছামতীতে নৌকায় বসে গৌরীকে একথা বলেছিলুম মনে পড়ে। কোথায় পানিতরের নদীতীর, আর কোথায় সিংভূমের শৈলশৃঙ্গ ! রাত্রে সুবোধের সঙ্গে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে নববর্ষের প্রণাম জানাই।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৪৩। ৩রা বৈশাখ, ১৩৫০। শনিবার। ঘাটশিলা

সকালে উঠে সুবোধের গাড়িতে ধলভূমগড়। মিলিটারি ট্রাকে দেখি নুটু যাচ্চে—পাশ দিয়ে চলে গেল। আমরা চলে গেলুম চাকুলিয়া ছাড়িয়ে ভগবানের বিভিন্ন রূপ দেখতে দেখতে বেঁক (?)। কত সবুজ গাছপালা। ভক্তি লীলা আশ্রয় করে ভক্ত থাকতে চায়, সে মুক্তি চায় না—পড়লুম চৈতন্যচরিতামৃতে। মস্ত কথা। দুপুরে ফিরেচি—সর্বত্র শুনি চাউল মিলচে না। চাকুলিয়া হাট থেকে তিনসের ধান টাকায় কিনে নিয়ে যাচ্চে। নুটুর বাসায় খোঁজ করি, সে আসেনি। চলে এলুম বাড়িতে। স্নানাহার করে সুবোধের সঙ্গে গল্প। একটু ঘুমিয়ে নিই। সুবোধ চলে গেল মোটরে। তারপর কালবৈশাখীর ঝড় ও বৃষ্টি এল। আমি বার হয়ে ফুলডুংরি

গেলুম। তারপর দুপুরে হাত মুখ ধুয়ে কলোনির মাঠের বাড়িটাতে বসলুম। শান্ত মন, জ্যোৎস্না উঠেচে। ভগবানের স্মরণ করি অগ্নিতে, তিনি সর্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট। "Monkey making must not be made the business of life."

১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৩। ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৫০। রবিবার।

নুটু আজ সকালে এল না। আমি বসে বসে কত বই পড়লুম। মদন ঘোষের 'বদনে হাসি' ত্রৈলোক্যবাবুর লেখা। Sinha সাহেবের পত্র এল—তাতে লিখেচে, "Do not forget this humble devotee of yours"। স্টেটে গেলুম ৪টাতে গুট্‌কেকে নিয়ে। ইন্দুবাবু ও ডাঃ বোস চা খাওয়ালে, তারপর ছায়াবৃত পথে হেঁটে ডাক্তারখানা। নিরঞ্জনবাবুকে দেখতে গেলুম, অসুস্থ তিনি, শুয়ে আছেন। সেখান থেকে বাড়ি হয়ে দ্বিজুবাবুর বাঁধের পাড়ে জ্যোৎস্নারাত্রে বেশ বসে থাকি। নুটু এল, তার সঙ্গে নানা গল্প, বিশেষ করে চাঁইবাসার গল্প।

১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩। ৫ই বৈশাখ, ১৩৫০ সোমবার।

সকালে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করি। বৈকালে ফুলডুংরি বেড়াতে গিয়ে কতক্ষণ বসি। কাল এখান থেকে চলে যাবো—এই পাহাড়ে, এই বনের মধ্যে বসে তাঁকে চিন্তা করি। ব্রহ্মই তিনি হয়ে আছেন। রাত্রে দ্বিজুবাবুর ফুলবাগানে জ্যোৎস্নায় খানিকটা বসি। বেশ লাগল। নুটু এল অনেক রাত্রে।

২০শে এপ্রিল, ১৯৪৩। ৬ই বৈশাখ, ১৩৫০। মঙ্গলবার। পূর্ণিমা

আজ সকালে উঠে গরুর গাড়ি করে রওনা। ট্রেনে ভিড় নেই—নুটু ও গুট্‌কে এসে উঠিয়ে দিয়ে গেল। দিব্যি ট্রেন চলেচে, খরস্রোতা পার হল, ধলভূম এরোড্রোমে ম্যাগনোলিয়া আইসক্রিমের বাক্স এসে পড়ে আছে। খড়কপুর স্টেশনে বিজয় কুণ্ডু ভাত দিয়ে গেল দুজনের। বাংলাদেশ পড়ল খড়কপুর ছাড়িয়েই। সবুজ ঘাস দেখে ও টলটলে জল দেখে কল্যাণী বলচে—ইছামতী টানচে। আজই চলো বারাকপুরে যাই। আমারও তাই ইচ্ছা হল। সবুজ কোমল, শ্যামল বাংলা মার রূপ দেখে কি আনন্দ [-] এতকাল রুক্ষ [রুক্ষ] পার্বত্য প্রদেশ থেকে এসে। হাওড়া স্টেশনে বৌমার বাবা ও জনু এসে কল্যাণী, উমা ও বৌমাকে নিয়ে গেল। আমি মিত্র ও ঘোষ ও অপূর্ববাবুর সঙ্গে গল্প করি। কৃষ্ণদয়াল এল, রাত্রে ঢাকুরিয়ায় গৌরীর বাসায় যাই। গজেন ও সুমথের বাড়ি হয়ে প্রবোধ সান্ন্যালের বাড়ি ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করি। সুন্দর ফুলের সুবাস, গাছপালার সৌন্দর্য।

২১শে এপ্রিল, ১৯৪৩। ৭ই বৈশাখ, ১৩৫০। বুধবার। কলিকাতা

সকালে Lake-এ বেড়াতে গিয়ে সবুজ ঘাসের ও বনের সৌন্দর্য আমায় অভিভূত করলে—আর টলটলে জল ইছামতীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। অপূর্ব সৌন্দর্য বাংলাদেশের বটে। সুশীলবাবু ও আমার ল' কলেজের class friendটির (সেই যে মোটামতো ছোকরা) সঙ্গে দেখা। সুশীলবাবু বলে গেলেন চা খেতে। বাণী রায়ের বাড়ি গেলুম, তার মা ও বাবা দেখা করে গেলেন। চা খাওয়ালেন। অমি সম্বন্ধে কথা হল পাশের ঘরে বসে। ওখান থেকে বাণী রায় ফোন করে দিয়েচে অমরবাবুর বাড়িতে। মিত্র ও ঘোষের দোকানে অমরবাবুর পত্র এসে হাজির ২৫শে বৈশাখ join করতে উত্তরপাড়ার সভাতে। গিরিনের ভাই উমেশবাবু ১০০টাকা দিলে ও কান্নাকাটি করলে ভাইপোর মৃত্যুতে। নৃপেন ঘোষ এসে বসল। 'পথের পাঁচালী'র proof দেখা হচ্চে। D.M. হয়ে মিত্র ও ঘোষে এলুম। ভবানী সিং ও শান্তি এসেছিল, দেখা হয়নি। প্রবোধ এসে বসেচে। সন্ধ্যায় ননীর বাড়ি গেলুম সাঁতরাগাছি—দুটি মেয়ে এসে অটোগ্রাফ নিয়ে গেল। রাত্রে ননীর ওখানে ভীষণ জলঝড়। মাঠাবুরু ও বামিয়াবুরু বন ভ্রমণের গল্প করি।

২২শে এপ্রিল, ১৯৪৩। ৮ই বৈশাখ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার। কলিকাতা

সকালে চা খেয়ে ননীর সঙ্গে গল্প করি। ওখানে থেকে চলে এলুম বাসে—সেই শ্যামশোভা বাংলাদেশের। চোখ জুড়িয়ে গেল। সঙ্গীর বাড়ি গেলুম, তারাশঙ্করও সেখানে। উত্তরপাড়ায় ওদের মোটরে যাবো ঠিক হল। সেখান থেকে D.M. হয়ে রমাপ্রসন্নের বাড়ি ও আবার মিত্রালয় এবং'ভারতবর্ষ' আপিস। ফণীবাবুর সঙ্গে উপন্যাস সম্বন্ধে কথা। অপূর্ববাবু বল্লেন, 'মৌচাকে' লেখা দিতে। ট্রেনে ভাটপাড়া। শ্যামনগর থেকে মতি কাকার ছেলে যাচ্চে ম্যাট্রিক সেন্টার দেখতে। তাকে বললুম—ব্যাগটা বয়ে নিয়ে চল। ভম্বলের বাড়ি গেলুম।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৪৩। ৯ই বৈশাখ, ১৩৫০। শুক্রবার।

আজ সকালে উঠে খাওয়াদাওয়া সেরে ট্রেনে রাণাঘাট হয়ে বনগ্রাম আসচি। মাঝের গাঁ স্টেশনে জগোকে ৫ টাকা দিলাম। ঐ গোপালনগর স্টেশন, ঐ মাদলার পুল—সেই শ্যামল, কোমল বাংলাদেশ। দেখে প্রণাম করি। কত কাল পরে পিপাসিত চক্ষু জুড়িয়ে গেল—কোথায় সেই মাঠাবুরু, নাকটিটাঁড়ের বন, শঙ্খ নদী, শোভা (?)কাঁড়দাবুরুহস্তীমুণ্ডের মতো বৃক্ষলতাহীন মানভূমের টাঁড়, আরশা পাহাড়ে আলোর মালা যা দেখলুম অবনীবাবুর বাড়ি থেকে, আর কোথায় এই দারিঘাটা, মাৎলার বিল, দারেমের বটগাছ ! বনগাঁয়ে নেমে মন্মথদা ও যতীনদার বাড়ি [-] লিচুতলায় বনভ্রমণের গল্প করি। আমার মাঠাবুরুর পত্র পেয়েছিল বল্লে। চাঁইবাসার পত্রও পেয়েছিল। মিতের বৌ খুব যত্ন করলে ওদের। চালকী নামল (?)খ্যাঁদা ডাব দিলে, এঁচড় দিলে। অনেকদিন পরে বারাকপুরের পুণ্যভূমিতে এসে প্রণাম করি কল্যাণী, উমা ও আমি। বাড়ি এসে দেখি ন'দিদি ও পিসিমা বসে গল্প করচে। তখুনি কালবৈশাখীর ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হল—আর সন্ধ্যা পর্যন্ত। ঝি এল নাপিতবাড়ি থেকে তাকে নিযুক্ত করলুম। হাবু ও খুকু, দেবেন, খোতন—সব এল। করুণা এল। সেই অনুর্বর সিংভূম আর এই অপূর্ব শ্যামল বাংলা পল্লী। কত পাখি, কত গাছপালা—কি সবুজ চারিদিকে ! সবুজের মেলা। বারবার প্রণাম করি। ইন্দুর বাড়ি ও শ্যামাচরণদার বাড়ি গল্প করি। রাত্রে ভীষণ শীত। বারাকপুরের বাড়িতে শুই অনেকদিন পরে।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৩। ১০ই বৈশাখ, ১৩৫০। শনিবার।

সকালে উঠে সেই অপূর্ব শ্যামলতা চারিদিকে। সুসার কাকা এসেচেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে মতিকাকার বাড়ি গিয়ে বসি। মতিকাকা একটা বেল দিলেন। অনেক গল্প। নদীতে স্নান করবার সময় জলের নির্মলতা দেখে ভগবানের উপাসনার দিকে মন গেল। সিংভূমের ও মানভূমের অনুর্বর প্রস্তর মরুর পরে এই শ্যামলতা ! ফুচুকে নিয়ে বিকেলে ভূষণ মাঝির ক্ষেতের ওপাশে যেখানে নিবারণ আর বছর বেগুন করেছিল সেখানে গিয়ে বসি। নির্মল নদী জল, সুন্দর শ্যামলতা তাঁর কথাই মনে এনে দেয়। সন্ধ্যায়ইন্দুর বাড়ি গল্প করি। তারপর গিয়ে বসলুম কুঠীর মাঠের সেই স্থানটিতে ঘাসের ওপর। তখন সন্ধ্যা নেমে আসচে। সেই মাঠের মধ্যে নাবাল জমিটার ধারে—যেখানে 'আরণ্যক' লিখতুম।

গৌতম বুদ্ধের প্রবন্ধ লিখতে একটি ম্যাট্রিকের ছেলে লিখচে—"কেহ ভগবানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি (বুদ্ধ) বলিতেন ভগবান সর্বত্র আছেন, তিনি সর্বজ্ঞ। তাঁহাকে অন্তরের একান্ত আকূতি পাঠাইয়া ডাকিলে যে কেহ ভগবানের উপলব্ধি করিতে পারে।"

Great words from a matric student !ছেলেটার নাম দেখলুম শ্রীধরচন্দ্র রায়, cal 433.

২৫শে এপ্রিল, ১৯৪৩। ১১ই বৈশাখ, ১৩৫০। রবিবার। বারাকপুর

সকালে উঠে লেখাপড়া করি। তারপর নদীজলে স্নান সেরে আসি। ঘুমিয়ে উঠে ছায়াভরা বীথিতল দিয়ে বনগাঁ। কোকিল ডাকচে, পাখি ডাকচে—বেলা ২।।টা ঝম ঝম দুপুরে—অথচ ছাতা খুলতে হল না সারাপথ। এত দেশ বেড়িয়ে এলুম কোথাও এরকম নেই। বিদেশে না বেরুলে এই শ্যামল সৌন্দর্যের মূল্য বোঝা যায় না। একটু গাছের ছায়ার জন্যে ওসব অঞ্চলে এতদিন মন তৃষিত ছিল, একটা ভালো গাছ দেখলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতুম যেন কত বড় সম্পদ। আর এদেশেযেদিকে চাও, বিশ্বরূপ শ্যামল কোমল আসন পেতেচেন।

বনগাঁ লিচুতলা যাবার আগে S.D.O.-র বাড়ি [—] সেখানে বসে চলে এলুম। মন্মথদা ও যতীনদার সঙ্গে আড্ডা। রাত্রে সুরেন ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে গল্প করি। আবার চলে এলুম লিচুতলায়। কেমন নতুন নতুন লাগে, কোথায় চাঁইবাসার কোলহান পার্ক, রোরো নদীর ধার, টাটা—রাজদ' পাহাড়ের পথে হাড়তোপা (?)গ্রাম—আর কোথায় এসে বেড়াচ্চি আবাল্য সুপরিচিত বনগ্রামে। সতীশকাকা হরিদা জয়কৃষ্ণ এল। হরিদাকে ওঁর ভাগনে দক্ষিণেশ্বরের কথা বললুম। বন্ধুর বাসায় টরুর সঙ্গে ও বন্ধুর সঙ্গে বেদান্ত আলোচনা রাত্রে।

২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩। ১২ই বৈশাখ, ১৩৫০। সোমবার।

সকালে উঠে জুজু (কচার মেয়ে) চা দিয়ে গেল বিছানায়। আহা, সোনার চাঁদ ছেলে মেয়ে রেখে কচা কোথায় চলে গেল ! টরু চলে গেল যশোর। যতীনদার বাড়ি এসে বসেচি—পুঁটিদিদি ও জগোর সঙ্গে দেখা। কালোর সঙ্গে দেখা। পুঁটিদিদির বিধবা বেশে দেখতে হয়েচে যেন আমার মেনকা পিসিমা। বিনয়দা এসে গল্প করলে, তারপর আমি সন্দেশ কিনে বারাকপুর ফিরি। বৈশাখের সুন্দর প্রভাত, বেলা ৮।।টা, সারা পথে ছায়া, পাখির কলগীতি, বনফুলের বিশেষত

তুঁতফুলের সুবাস। পথে যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই দাঁড় করিয়ে গল্প করে। ভোঁদা, গোপালনগরের দুজন ছাত্র, বলু ডাক্তার, মাস্টার পঞ্চার ছেলে—সব যাচ্চে বনগাঁ। বাড়ি এসে খেয়ে দুপুরে বকুলফুল কুড়িয়ে কল্যাণী ঘরের মেজেতে আমার নাম আর ওর নাম লিখলে। উমা খুকু বেড়াতে এল। সুসার কাকা চা খেলেন। জেলি এসেচে বাড়ি, সে কেবলই গল্প করচে।

নদীর ধারে একা বসেচি নিবারণের পটলের ভুঁইয়ে। ওপারে মেঘস্তূপের রাঙা শিখর যেন কোন্ তুষারাবৃত শৈলমালার মতো দেখাচ্চে। কিংবা দেবলোকের পর্বত। ফিরে রাতে ইন্দুর বাড়িতে ফণিকাকা ও আমি গল্প করি।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৩। ১৩ই বৈশাখ, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে সেই মাঠে বেড়াতে গেলুম ও নদীর ধারে—যে মাঠে প্রথম বেড়াতুম ১৯২৯ সালে গ্রীষ্মাবকাশে। তারপর শান্ত নদীজলে স্নান করে আসি। তেঁতুলতলার ঘাট, একদিকে ঘাটের ধারে ফণিকাকার জমিতে শিরিষ গাছ, চট্‌কা গাছ, আরো সাঁইবাবলা, ওপারে সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ। কোকিল ডাকচে অনবরত চারিদিকে। ভালো লাগে খুব। বৈকালে যাই গোপালনগর। মল্ল মাস্টারের বাড়ি চা খাই ও গল্প করি। জিতেন দফাদার এল, তার সঙ্গে মির্জা সাহেবের কথা বলি।

ঝড় উঠল, গৌরের দোকানে গল্প করতে করতে পালিয়ে এলুম। পথে রাধাবল্লভ বোষ্টমের ছেলে তার বাবার মৃত্যুর কথা বল্লে। গাড়াপোঁতার মেলায় গিয়েছিল, সেখানে ভেদবমি হয়। হেঁটে বাড়ি আসতে মোল্লাহাটির ঘাট পার হয়ে আর হাঁটতে পারে না। রাত্রে মারা যায়।

সন্ধ্যা হয়েচে।একখানা গরুর গাড়িতে হাজারি ঘোষ ধান বুনে আসচে। বুনোপাড়ায় দেখা। আজ শক্তিপদ রাজগুরুর, হাওড়া সভাপতিত্বের ও অমরবাবুর পত্র এসেচে উত্তর দিলুম। শ্যামাচরণদার বাড়ি বসে গল্প করে মেঘঝড় দেখে ছুটে এসে কাঠ তুলি। কাঠ ভিজে গেলে জ্বলবে না।

২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৩। ১৪ই বৈশাখ, ১৩৫০। বুধবার।

এ ডায়েরিটাতে জানুয়ারি মাস থেকে এ ক'মাস 'বারাকপুর' কথাটা লেখা নেই পাতায় কারণ এ পর্যন্ত গাঁয়ে আসাই ঘটেনি। সকালে মাঠে বেড়িয়ে এসে লিখি। ইন্দু রায় এল। দুপুরে এল রাণাঘাট থেকে দুটি ছেলে খগেনমামার পত্র নিয়ে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের জন্যে। বৈকালে কল্যাণীকে নিয়ে পলতা তুলতে যাই নিবারণের বেগুন ক্ষেতে। তারপর কুঠীর গড়ানে জমিটার ওপর বসে থেকে নদীজলে এসে নামি দুজনে। মাছ ধরি। উঠে এসে চা খেয়ে ইন্দুর বাড়ি গিয়ে বসি ও গল্পকরি। বেশ হাওয়া। পুঁটিদিদি এসেচে, তার মুখে অনেক রাত পর্যন্ত রামপদ কি করে মারা গেল সে গল্প করে। জনক রোডে গিয়েছিল কিভাবে—ইত্যাদি।

স্নান করতে গিয়ে ফণিকাকার ভুঁইয়ের গাছপালার শোভা দেখে বিস্মিত ও পুলকিত হই। প্রতিপদে ঘাটশিলার অঞ্চলের বৃক্ষলতার দৈন্য ছায়ার অভাব আর এই বঙ্গপল্লীর শ্যামল প্রাচুর্য্য [প্রাচুর্য] লক্ষ্য করি। ছায়া...ছায়া...সিন্‌হা চাঁইবাসাতে হরদয়ালের বাড়ির গোটাকতক আসান গাছের ছায়া দেখিয়ে বলেছিল—দেখুন কেমন আমাদের চাঁইবাসা ! আর এই বারাকপুর ! একে ভালো করে চিনলুম আজ ও দেশ থেকে এসে।

২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩। ১৫ই বৈশাখ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

আজও সকালে উঠে মাঠে বেড়িয়ে আসি। নদীতে স্নান করে এলুম। সেই সুন্দর অনুভূতি। নদীজলে নামলুম সন্ধ্যায়—ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্পগুজব করি।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৩। ১৬ই বৈশাখ, ১৩৫০। শুক্রবার। কলিকাতা

সকালের গাড়িতে কলকাতা যাবো বলে বেরুলাম। আমার অনেক ছাত্র ট্রেন থেকে নামল, তারা ফুল দিলে। মেঘলা সকাল, ট্রেনে ইন্টার ক্লাসে শচীনের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই। মিত্র ও ঘোষের দোকানে কৃষ্ণদয়াল এল। নিচের মেসে খেলুম। বরেন লাইব্রেরি সেরে ইউনিভার্সিটির মিটিং-এ যাই। রেজিস্ট্রারের ঘরের সামনে সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা হল, তারপর সরোজ রায়চৌধুরী, কৃষ্ণদয়াল, মহাদেব রায় একসঙ্গে হলে গিয়ে বসি। অজয় ভট্‌চাজ, গোপাল হালদার সবাই আছে। বিভাস ও সরোজ চা খাওয়ালে, সেই আমাদের পুরোনো দোকানে পুরোনো জায়গাটিতে গিয়ে। রাত্রে বুদ্ধদেবের বাড়িতে, সে নেই। পরিমল গোস্বামী আছে—তার বাড়ি চা খাই ও শক্তিপদ রাজগুরুর মেসে গিয়ে থাকি।

১লা মে, ১৯৪৩। ১৭ই বৈশাখ, ১৩৫০। শনিবার।

সকালে উঠে রমাপ্রসন্ন ও ছাত্রের বাড়ি। মিতের মেসে চা খাই, কানাই সাহার বাড়ি গিয়ে দেখা হল না। মিত্র ও ঘোষ থেকে হেমেন্দ্র দত্তকে ফোন্ করে কাপড় আনাই। মিল থেকে। ইউনিভার্সিটিতে বল্লে এক ছোকরা ক্লার্ক—আপনার নাম কাটা গিয়েচে। ওপরে দেবীবাবুর কাছ থেকে এক চিঠি আনালুম তার নামে। খুব খাতির করে আর সবাইকে বসিয়ে রেখে আমায় কাগজ দিলে। বিকেলে রমাপ্রসন্নের বাড়ি গল্প করে সুইনহো স্ট্রীটে। মায়াদি ও বেলু খুব খুশি। ওদের নিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বাণী রায়ের বাড়ি গেলুম। বাণী রায়ের মা বল্লেন কল্যাণী তো আমাদের ঘরের মেয়ে। বাসায় এসে ওপরের তলায় বাড়িওয়ালা [র] মেয়ে অনীতা, অমিতা ও গীতার সুন্দর গান শুনলুম।

২রা মে, ১৯৪৩। ১৮ই বৈশাখ, ১৩৫০। রবিবার।

সকালে উঠে মায়াদিকে নিয়ে নীরদবাবুর বাড়ি ও সেখান থেকে ঢাকুরিয়ায়প্রবোধ সান্ন্যালের বাড়ি। সেখানে গজেন, সুমথ, গৌরী প্রভৃতির সঙ্গে চা ও চপ খাই। বাসে ফিরি, পথে ফণি বর্মা ও ধীরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা। বাসায় ফিরচি, কল্যকার ভদ্রমহিলা মেয়ে তিনটিকে নিয়ে পিকনিকে যাচ্ছেন। বাসে শেয়ালদ' নেমে রমাপ্রসন্নের বাড়িতে গৌরের সঙ্গে গল্প করি, পুরোনো দিনের মতো। ছাত্রের বাসায় এসে বরিশাল এক্সপ্রেসে গাড়ি করে খাতাপত্র নিয়ে বাড়ি। সারাদিন খাইনি, কল্যাণী চা ও খাবার নিয়ে এল। নদীতে নাইতে গেলুম—স্নিগ্ধ সবুজের মেলা, আম পেকেচে গাছে গাছে। অপরাহ্ন মায়াময়, নদীজল মায়াময়। ভরত বলত সোনার বারাকপুর ! ইন্দুর বাড়ি বসে গল্প করি।

আজ যখন আসচি নদী থেকে, সেই কানা জেলে বৌয়ের নাতনীকে তার মা মেরেচে। ছিরে পুকুর ধার দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্চে। এই ঘটনাটি এই দিন ঘটত—মহাকালের ব্যবধানে।

৩রা মে, ১৯৪৩। ১৯শে বৈশাখ, ১৩৫০ সোমবার। বারাকপুর

সকালে উঠে অতি সুন্দর শ্যামল গাছপালা ও মাঠের মধ্য দিয়ে বেড়িয়ে এলুম। ১৯২৯ সালে এই মাঠে বেড়াতে এসেছিলুম। নদীজল সুন্দর, নির্মল। স্নান করে আসবার পূর্বে খাতা দেখি। দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে আবার কাগজ দেখি। কল্যাণীকে নিয়ে গিয়ে উত্তর মাঠে বেড়াতে যাই। সোঁদালি ফুল ফুটেচে মাঠে। কল্যাণী ও আমি এক জায়গায় বসলুম। ও বলে—মানকু, বারাকপুর আমাদের কি সুন্দর ! ভরত বলত, বিভূতিদা, এ আমাদের সোনার বারাকপুর। বাণী রায় ও মায়াদির গল্প করি। নদীজলে স্নান করতে নামি, ওপারে রাঙা মেঘস্তূপ। ভগবানকে ধন্যবাদ। বিশ্বরূপের অনন্ত রূপের দৃশ্য সর্বদা দেখচি। রাত্রে হাজারি ঘোষের ভাইবৌ সম্বন্ধে শালিশি পরামর্শ কত বিচার হল। কোথায় চাঁইবাসার সুবোধের বাড়ি, কোলহান সুপারিন্টেন্ডেন্ট—D.E.O.-রা বসে। গল্প করচি। আর কোথায় পাঁচীর বাড়ি, মতিকাকা-গজন বসে শালিশী করচি অনেকরাত পর্যন্ত। শালিশির সময় এক মাগী সেই ছেলেবেলার নাককাটা পাগলা মুসলমানকে তালাক দিলে। বল্লে—ঘর ছেড়ে ক'হাত ভুঁই গিয়েলাম মুই ও [।]

৪ঠা মে, ১৯৪৩। ২০শে বৈশাখ, ১৩৫০।মঙ্গলবার।

সেই মাঠে বেড়াতে গেলুম যা ছিল ঘাটের পথের শিমুল গাছটার সামনে। খাতা দেখি। নদীজলে স্নান করি ওপাড়ার ঘাটে। দুপুরে উঠে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' পড়ি। চলি বিকেলে কল্যাণীকে নিয়ে কুঠীতে বেড়াতে। কুঠী ছাড়িয়ে মাঠে দুজনে বেড়িয়ে আসি। কুঠীর সেই জায়গাটা, কি সুন্দর নরম সবুজ ঘাসে ভরা ওপারের মাঠটা ! বসি দুজনে। একটা জংলি ডুমুর গাছ থেকে ডুমুর পাড়ি। পলতার ক্ষেত থেকে পলতা তুলি দুজনে। কল্যাণী আঁচল ভর্তি করে ডুমুর আর পলতা নেয়। বলে—মান্‌কু বেশ চমৎকার আমাদের বারাকপুর—নয় ?বলি—হাঁ, ভরতও এই কথা বলত। নদীজলে নেয়ে ফিরি। সন্ধ্যায় ইন্দুদের বাড়ি ও হরিপদদার কাছে যাই। আজই এসেচে।

"তবুও চিত্ত অহেতু আনন্দেতে
বিশ্বনৃত্য লীলায় উঠেচে মেতে
সেই ছন্দেই মুক্তি আমার পাবো
মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাবো"

এই লীলাখেলাই জীবন, এই দেখে আসচি কত বছর ধরে।

৫ই মে, ১৯৪৩। ২১শে বৈশাখ, ১৩৫০। বুধবার।

ভোরে বাগানে সব আম কুড়ুচ্চে জেলেপাড়ার মাগীরা—যেমন চিরকাল কুড়িয়ে আসচে। খাতা দেখি বেড়িয়ে এসে। লিখি। হাবুর সঙ্গে ওপাড়ার ঘাটে ঘুরে এলুম। দুপুরে জগো এল, কল্যাণী ও উমা নারানদা ও সইমার বাড়ি বেড়াতে গেল। বৈকালে কল্যাণীকে পেছনে নিয়ে কতদূর চলে গেলুম। কুঠীর হাউজঘর পেরিয়ে একটা শিমুল গাছতলায় তুলো পড়ে আছে—ছড়িয়ে। দুজনে তুলো কুড়ুই। গাঙের ধারে গিয়ে বসি, চারিধারে শ্যামলতা, সোঁদালিফুল ফুটেচে—মেঘ করেচে দেখে উঠে এসে মাঠে বসি। অদূরে সেই খুকুদের নিয়ে চড়ুইভাতি করার জায়গাটা—রান্নার ইটগুলো [ইঁটগুলো] এখানে পড়ে।

একটা এরোপ্লেন গেল মাথার ওপর দিয়ে আলো জ্বেলে। নক্ষত্র উঠেচে দুটো, তখনো আমরা মাঠে বসে। বৈঁচি খাই। তারপর স্নান করে ফিরি। ঘাটে উপীন সীতে জেলের ছেলে। একটা নৌকার চোয়াড় [?]কে চুরি করে নিয়ে গিয়েচে, সে সম্বন্ধে কথা বলচে। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক লম্বা চিঠি দিয়েচে 'অনুবর্তন' এর সমালোচনা করে।

বিকেল বেলা পেছনের বোয়াকে পিসিমা ন'দি বসে মানু ও কল্যাণীর চুল বাঁধচে ও গল্প করচে। বেশ পরিচিত বাংলাদেশের দৃশ্যটি।

সাতুকাকার বাড়ি গিয়ে গল্প করি। ইন্দু রায়ের ওখানে বসি। কচা কবে দারিঘাটায় আমবাগানে বারোয়ারির সময় বারবনিতাদের ঘরে গিয়েছিল, সেই গল্প করলে। জিতেন কামারের মা বিলবিলে নেমে খোকা খুড়োর বৌকে বলচে—আমার পয়সা ছ'আনা কি রেখে গিয়েল ?ঐ সে বুড়ি বলে যাচ্চে। সেই জিতেনের কামারের মা, আমার বাল্যকালে যে চাল দিত আমাদের।

৬ই মে, ১৯৪৩। ২২শে বৈশাখ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

খাতা দেখি। নদীজলে স্নান করে এসে 'দেবযান' লিখি। হাটে গেলুম, সেখানে সিন্‌হা ও সুবোধের পত্র পাওয়া গেল। নিভা, লীলা ও বেলাও পত্র দিয়েচে। হাট থেকে পত্র এল। নুটু চিঠি দিয়েচে পেঁচো ও গোপালকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। বৈকালে নদীতীরে কতক্ষণ বসে ভগবানের কথা চিন্তা করি। নদীজলে চোখের সমতলে কালো জলে চোখ রেখে দেখি কি অপরূপ রূপ বিশ্বরূপের ! ও দেশ থেকে এসে এখন ভালো করেই অনুভব করচি একথা। ভগবান এসব অপূর্ব বনপ্রকৃতির সৌন্দর্য দেখাবেন কাকে ?এ দেখবার চোখ কি আছে সকলের ?আমি যদি না দেখি। তবে যশোর জেলায় এত আনন্দ করে এমন খুসি হয়ে এসব দৃশ্য দেখবে কে ?

শ্যামাচরণদার বাড়ি গিয়ে পুরোনো দিনের গল্প। মাখম মাস্টারের কথা, বিনোদ মাস্টারের কথা। ১৩০৯ সালে চন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে মারা গিয়েছিলেন আষাঢ় মাসে। দুখীরাম রায় মারা গিয়েছিলেন তার আগে। ১৩০৮ সালের মাঘ মাসে শ্যামাচরণদার পৈতের কয়েকদিন আগে খুব বাদলাবৃষ্টির দিনে ওদের গরুজ লেজ কে কেটে দেয়। বাল্যের সেই বিখ্যাত ঘটনা।

৭ই মে, ১৯৪৩। ২৩শে বৈশাখ, ১৩৫০। শুক্রবার।

চমৎকার সকাল। আমি বসে লিখচি, বিলবিলের জলে বোষ্টম বৌ বাসন মাজচে। জেলির মার সঙ্গে কেদার ?ছেলে ও হাজরা যুগীর নাতি ঝগড়া করচে যে কেন আমবাগান সে বিক্রি করেচে। দিব্যি পাখি ডাকচে। সুরেন রাম নিমন্ত্রণ করে গেল। (বিভূতিদের ৪১নং পাথুরিয়াঘাটার নীচের ঘরে বসে লেখা। [ )] দুপুরে গেলুম সুরেন রায়ের বাড়ি। কামিনী গোয়ালিনীদের ভিটে, কৃষ্ণচূড়া গাছটার ওদিকে। গল্প করে চলে এলুম। তারপর নিমন্ত্রণ খাই গজনের সঙ্গে। খেতে বেলা গেল। নদীজলে স্নান করি। ভগবানের অনুভূতি। রাত্রে কল্যাণী ঘুমুতে দেয় না। কাপড় শুকুতে দেওয়া নিয়ে ওকে বললুম—তাও দেখি জেগে আছে। আমায় বলচে আমার খোকাটি—

রাত্রে কল্যাণী ঘুমুতে দেয় না। বল্লে—তুমি আমার খোকা—একেবারে খোকাটি। একটু গল্প কর—

৮ই মে, ১৯৪৩। ২৪শে বৈশাখ, ১৩৫০। শনিবার।

সকালে উঠে স্নান সেরে খেতে বসেচি। কল্যাণী বলচে গরম ভাত দিচ্চি, একটু অপেক্ষা কর। আমি বলচি না, আমার ট্রেন চলে যাবে। অমনি ওর চোখে জল এল। বল্লুম—কিছু না। ও বল্লে—তুমি মা বোনের সেবায় অভ্যস্ত নও কিনা তাই এমন হয়েচে। রানাঘাটে বিনুর বাড়ি চা খাই ও বনভ্রমণের গল্প। কলিকাতায় পৌঁছে গজেনবাবুদের দোকানে খুব গল্প। তারপর কাত্যায়নী বুক স্টল হয়ে D. M. Library। সেখান থেকে হেঁটে বিভূতিদের বাড়ি। চাঁদিবাবুর সঙ্গে গল্প আপিসে বসে। ২ বছর পরে রামবাবু, রবীনবাবু প্রভৃতি এল। ও, কতকাল পরে আবার এদের বাড়ি এলুম। সেই মাঠাবুরু আর

নাকটিটাঁড়ের forest আর এই। ওপরের বৈঠকখানায় বসে বনভ্রমণ শোনাই। ছোট বুড়ি এল। কত গল্প করলে। খাওয়ারসময় অরুণ ও ছোট বুড়ি দাঁড়িয়ে এটা খান, ওটা খান করতে লাগল। ছোট বুড়িকে দেখে মনে হয় ও যেন আমার মেয়ে। কল্যাণী যে বলে, আমার ছেলের বৌকে এই দেবো। মেয়ের নাম রাখবো মৃণু। আহা, কোথায় রইল (?)আনন্দ আর মৃণু ?এখনো আসে না কেন ?ওপরের বাথরুমটায় স্নান করা এক অপূর্ব ব্যাপার। নীচের ঘরে শুই এসে। মন্মথ এসে বসল। ছোট বুড়ি বল্লে—রমাদিকে আনবেন।

৯ই মে, ১৯৪৩। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫০। রবিবার। কলিকাতা—উত্তরপাড়া

এটাও বিভূতিদের বাড়িতে লেখা। রাত ৪-৩০। নীচের ঘর। আজ সকালে উঠে স্নান সেরে উঠতেই মিষ্টি নিয়ে এল। এই ঘরের সঙ্গে কতকালের সম্বন্ধ। নাকটিটাঁড়ের forest এর কথা ভাবি এখান থেকে। চণ্ডীর সঙ্গে গাড়িতে হাওড়ার পুল। স্টেশনে গিয়ে দেখি Prof. Biswas টিকিট করেচেন। তাঁর সঙ্গে এসে দেখি প্ল্যাটফর্মে সুবর্ণদেবী, নীরদবাবু, বুদ্ধু, বেগুন, গজেন, সুমথ, গৌরী—প্রভৃতি। আড্ডা দিতে দিতেচলি। উত্তরপাড়া পৌঁছে রাজবাড়িতে নিয়ে গেল গাড়ি করে। রমেন এল, অমরবাবু এলেন। মস্ত টি-পার্টি। অতুল গুপ্ত, সজনী ও আমি একসঙ্গে। প্রফুল্ল সরকার বল্লে—একটা অনুযোগ আছে স্যার। একটা বই দিতে হবে। অতুলবাবুর গাড়িতে সভাস্থলে গিয়ে দেখি মহাদেব রায় দাঁড়িয়ে। তাকে অতুলবাবুর মোটরে এনে চা খাইয়ে নিয়ে গেলুম অমরবাবুর বাড়ি থেকে। বাণী রায়ের সঙ্গে দেখা সভাস্থলে। সভার পরে এক বাড়িতে নিয়ে গেল। সঙ্গে হাওড়ার সভার জন্যে লোক গেল। আশার ছেলে ডেকে নিয়ে গেল। আশা এসে গল্প করলে—সবাইকে বল্লে—এই দ্যাখ আমার ভাই। ওখান থেকে অমরবাবুর বাড়ি আড্ডা। বাসে গঙ্গার ধার দিয়ে হাওড়া। সেখানে সভা। সভার পরে শক্তিপদ রাজগুরু পৌঁছে গিয়ে গেল বিভূতিদের বাড়ি। রাত ১২টা পর্যন্ত সেখানে গল্প ও আড্ডা। শেতল (?)নীচের ঘরে শুইয়ে দিয়ে গেল।

১০ই মে, ১৯৪৩। ২৬শে বৈশাখ, ১৩৫০। সোমবার। কলিকাতা—বারাকপুর

সকালে উঠে পিছনের বাথরুমে ইলেকট্রিক জ্বেলে স্নান করলুম। চাকরকে উঠিয়ে বলি—কাপড় ঠিক করে দে। আসচি যখন, ললিত উঠচে ওপরের রোয়াকে। বল্লুম—ললিত ভালো আছো ?বল্লে—হ্যাঁ বাবু। কতকালের ললিত ! তখনো খুব ভোর। কোনো দোকান খোলে নি। হেঁটে রবীনের বাড়ি। সেই টাকপড়া লোকটি বল্লে—রবীনের সঙ্গে দেখা হয়েচে ?বল্লুম—হ্যাঁ। রবীনের সঙ্গে কানাই সাহার বাড়ি। ওদের নিয়ে মিতের মেস। মিতে আর সে মিতে নেই। বসে বসে টেন্ডার লিখচে। ব্যবহারে হৃদ্যতা নেই। উঠে মিত্র স্কুলে কৃষ্ণদয়ালের ওখানে। কৃষ্ণদয়াল নীচে এসে ডেকে নিয়ে গেল। অনেককাল পরে ৬০নং মৃজাপুর স্ট্রীটে উঠলুম। কতকাল আসিনি। মাস্টারেরা এল, আজ ওদের ছুটি। খুলবে ২৫শে জুন। ওখান থেকে এসে লক্ষ্মীর পট কিনে ট্রেনে। কানাই সুটকেস বয়ে নিয়ে এল। ট্রেনে সরোজ উকিল ও আমি একসঙ্গে। সরোজ মেয়ের বিয়ে দিচ্চে তাই নিয়ে বলতে বলতে এল। চাঁইবাসার সুধী এল এই ট্রেনে। ট্রেন থেকে নেমে সরোজের সঙ্গে পথ দিয়ে আসতে দেখি একখানা গরুর গাড়ি যাচ্চে অম্বরপুর। তাতেই উঠে চলে আসি। চালকীর কাছে নামি একটু হাঁটবার জন্যে। ধুলো উড়িয়ে গাড়িখানা চলে। দিব্যি ষাঁড়া গাছ, সেওড়া গাছ। শান্ত পরিবেশ। কোথায় মিত্র স্কুল, বিভূতিদের বাড়ি, আর কোথায় শ্যামল পল্লীগ্রাম। ফণিকাকা বল্লে ঢুকেই, নারাণদা মারা গিয়েচে কাল সকালে। তিনু ও মদন এল দুপুরে। বিকেলে কল্যাণীকে নিয়ে কুঠীঘাটে কতক্ষণ বসি ও সন্ধ্যায় নদীজলে স্নান করি। রাত্রে ইন্দুর বাড়ি। ইন্দু দাহ করে ফিরল 'হরিবোল' দিয়ে তখন রাত দশটা। শুনলুম খাওয়ায় নি বলে ওদের সঙ্গে নারাণদা'দের মনোমালিন্য হয়েচে। শ্রাদ্ধে নাকি কেউ যাবে না। এসব বারাকপুরের নিজস্ব সম্পদ চিরকালের।

১১ই মে, ১৯৪৩। ২৭শে বৈশাখ, ১৩৫০। মঙ্গলবার। ষষ্ঠী

সকালে উঠে খাতা দেখি ১২ খানা। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে বসি। স্নান করতে যাচ্চি হেড এক্সমিনারের উপদেশাবলী ডাকে এল। বাড়ি এসে পড়ে তেল মেখে স্নান করতে গিয়ে দেখি চড়কতলায় ওপাড়ার রাধাবল্লভ বোষ্টমের ছেলের বিচার হচ্চে। সে আমবাগান একজনের কাছে বিক্রি করে আবার আমাদের গাঁয়ের কেলো মোছলমানের ছেলের কাছে বিক্রি করেচে। স্নান সেরে বাড়ি এসে খেয়ে বিশ্রাম করি। তিনু এল বিকেলে। আমরা দুজনে নদীতে স্নান করে এলুম—বেশ মেঘের দৃশ্য ওপারের—সেই সাঁইবাবলা গাছের। কল্যাণী ও আমি বলাবলি করি যুগীদের বুড়ি রোজ এসে ভাত চায় কেন ?বলি, গরিব লোক, এই দিন—খিদে পায়। পথের ধারে বসে আছি—থানার জমাদার সাইকেলে যাচ্চে। আমায় দেখে নামল। বল্লে—

আসথুঁলি ডাকাতি হয়ে গেছে তাই দেখতে গিয়েছিলুম। সন্ধ্যায় গিরিনদার বাড়ি গেলুম। নারাণদাকে গঙ্গায় যারা নিয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে ঘোঁট হচ্চে, ওরা নাকি খেতে দেয় নি। রাত্রে সতীশ ও হাজারি ঘোষের ভাইবৌয়ের বিচার হল রাত ১টা পর্যন্ত। গিরিনদা বল্লেন—তিনি বাঁচবেন না, হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যাবেন—যেন ইছামতীতে দেওয়া হয় তাঁকে।

১২ই মে, ১৯৪৩। ২৮শে বৈশাখ, ১৩৫০। বুধবার।

সকালে উঠে খাতা দেখি ১২ খানা। একটু বেরিয়ে দোকানে বসে বলি forest officer আসচে, একটু অভিনন্দনের ব্যবস্থা কর। সিনহাকে চিঠিও দিই। স্নান সেরে আমি আমাদের পাড়ার ঘাটে—একটু বিশ্রাম করে 'অনুবর্তন' লিখে যোগ করি। দুপুরের পর ঘুমিয়ে উঠে খাতার নম্বর enter করি। হাজারি ঘোষ ও অমূল্য মুহুরি এল। আমি ও কল্যাণী ফুচুকে নিয়ে কুঠীর ঘাটে গিয়ে বৈঁচি তুলি। দিব্যি সোঁদালি ফুল ফোটা মাঠে বসে গল্প করি কুঠীর ওপারে যেখানে খুকু ও আমরা বনভোজন করেছিলুম ১৯৩৫ সালে। সে ইট [ইঁট] এখনো পড়ে আছে। নদীজলে স্নান সেরে বাড়ি ফিরি। রাত্রে ইন্দুর ওখানে আড্ডা।

১৩ই মে, ১৯৪৩। ২৯শে বৈশাখ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

প্রকাণ্ড একখানা এরোপ্লেন মহাশব্দে খুব নীচু দিয়ে উড়ে গেল আমাদের গ্রামের শান্ত জীবনধারার ওপর দিয়ে। এখনো খুব সকাল। বিলবিলের ধারের গাছতলায় ছেলেমেয়েরা ঠায় বসে আছে, ঝড় হচ্চে, আম কুড়ুবে। একটা ছোট মেয়ে ঝগড়া করচে জেলেবুড়ির সঙ্গে। জেলে বুড়ি বলচে—তুই যে ও আমটা কুড়িয়ে নিলি ?মেয়েটা বলছে—ও গা নীড়িয়েছে ?বলুক ও ?প্যালাম তো নেব না ?প্রত্যেক আমতলায় গেঁজে হাতে বালকবালিকা ও স্ত্রীলোক। চা খাচ্চি, যুগী বুড়ি এসে নালিশ জানালে—তার নাতনী শক্তিকে তার স্বামী অভিলাষ নেয় না, মারে, দুটো ভাত দেয়না।—তুমি বাবা এর বিচার কর। আমাকেও দেয় না, বলে যুজ্যের ভাত, তোকে দেব না। যা—

আমি বেলা পর্যন্ত মার্কশিট লিখি। হাজারি এসে বলতে লাগল—১৩০৮ সালে কিভাবে হাজারি সিংয়ের সঙ্গে প্রথম দোকান করে। স্নান সেরে এলুম খুব বেলায় ওপাড়ার ঘাট থেকে। ফকিরচাঁদ নেমেচে জলে। বিশ্রাম করার পরে লিখি। কল্যাণী ও উমাকে নিয়ে কুঠীর মাঠে শিমুল তুলো কুড়োতে গেলুম। উমা বৈঁচি তুলল। মেঘ করে এল, কিন্তু বৃষ্টি নেই। শ্যামাচরণদার বাড়ি বসে পুরোনো গল্প। গ্রামের সেকালের ছড়াটা :

কমল কাস্তে, জয়া দেঁড়ো, রামা দিদি দিনুবাবু।

দাসী পিসিমার বাবা ছিলেন কমল রায়, তিনি ছিলেন চাষা, কাস্তে নিয়ে থাকতেন।

তাঁর ছোট ভাই দীনু ছিল বাবু; ও রাম ছিল রসুইয়ে বামুন, তাই নামে রামা দিদি দ্বারিক কাপালির বাড়িতে ছিচরণ ন্যায়রত্নের টোল ছিল। প্রাণকৃষ্ণ রায় ও বাসুদেব রায় ছিল দুই ভাই। অম্বিকা রায়ের ঠাকুরদাদার বাবা ও জ্যাঠা। বাসুদেব রায়ের আমলে ভাত (?)বাড়ির বাগান বলে।নেত্য ঠাকুরুণের দৌহিত্র হচ্চে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক। ফণিকাকার সঙ্গেও গল্প করি ত্রৈলঙ্গস্বামী সাধুর।

কল্যাণী ঠেস্ দেওয়ালে কতক্ষণ পর্যন্ত গল্প করে। বলে—মান্‌কু, তোমায় জিনিস আনতে বল্লে এমন আনো যে দেখে কষ্ট হয়। "মানকু আমার মস্ত বড় বীর, মস্ত পালোয়ান, খস্‌খসে যেন কাশ্মিরী আলোয়ান" এই ছড়াটা বলে। কল্যাণী আজ ঘরে আবার পুঁথির ও মায়ের কড়ার পাশে লক্ষ্মী পেতেছে সন্দেবেলা। ধুনো প্রদীপ দিয়েচে, ধূপ আনবো কলকাতা থেকে।

১৪ই মে, ১৯৪৩। ৩০শে বৈশাখ, ১৩৫০। শুক্রবার।

উঠে মার্কশিট লিখি ও খাতা দেখি। বেলা হয়ে গেল, দোকান থেকে জিনিস কিনে এনে স্নান করে এলুম ওপাড়ার ঘাটে। দুপুরে সামান্য ঘুমিয়ে উঠে আবার খাতা দেখি ও মার্ক লিখি। নদীর ঘাটে স্নান সেরে আসি দুজনে। ইন্দুর বাড়ি গল্প করি। ফকিরচাঁদের গরু ধরেচে রোমজান্। এই সংক্রান্ত আলোচনা ভালো লাগল না। কল্যাণী রাত্রে কিছুতেই ঘুমুতে দেয় না। কেবল বলে মান্‌কু, একটা গল্প বলো।

১৫ই মে, ১৯৪৩। ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। শনিবার।

সকালে উঠে সয়ারামকে ডেকে খাতা ওর সাইকেলে ঝুলিয়ে কলকাতা গেলুম ভোরের ট্রেনে। ৯টার সময় পৌঁছাই। রবীনের বাড়ি খাতার বোঝা রেখে ইউনিভার্সিটিতে বসে নুটুকে চিঠি লিখি। গজেনের দোকানে গজেন দই ও সন্দেশ

আনালে। কাত্যায়নী বুক স্টল ও D.M.M.C.-তে গিয়ে বসি। রবীন এল—তাকে ইউনিভার্সিটিতে পাঠাই খাতা আনতে চিত্তবাবুর নামে চিঠি দিয়ে। নিজে গেলুম, ঈজিচেয়ারে বসলুম গিয়ে ছেঁড়া জামা গায়ে সর্বত্র। নিয়ে এসে দেখি কৃষ্ণদয়াল বসে। তার সঙ্গে গল্প। বিকেলে ঊষার বাড়ি গেলুম কবির রোডে। ঊষা আমায় দেখে কি খুশিই হল ! অজিত—ওপরে পাঠিয়ে দিলে। ঊষা বলতে লাগল আপনাকে ভালো লেগেছিল ভালোবেসেছিলাম (?)এখন-তখন কত সজনীকে বলেচি পাঠিয়ে দিতে। সজনী বোধ হয় সেটা চায় না যে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। বিকেলে সেখান থেকে বার হয়ে একটা বেঞ্চিতে বসি—তারপর শক্তিপদ রাজগুরুর মেসে এসে স্নান করি। রাত্রে ভীষণ গরম ও ছারপোকা। বিকেলে ঊষার বাড়ি যাওয়ার আগে সুধাংশুদের আপিসে গিয়ে দেখি অরবিন্দ বসে।

১৬ই মে, ১৯৪৩। ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। রবিবার। কলিকাতা ও বারাকপুর

সকালে উঠে মেসের আবহাওয়া থেকে খাতাপত্র নিয়ে বেরিয়ে ধর্মতলার মোড়ে ৮ নং বাস কিছুতেই পাই না। একঘণ্টা পরে এল—উঠে দেখি হাওড়ার সেই জ্ঞানবাবু বসে। ভালোই হল। আমি examiner-এর বাড়ি চিনতুম না—তার সঙ্গে গেলুম। বিভাস এল—আরো পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সবাই প্রণাম করে, বলে—বিভূতিবাবু কেমন আছেন ?আমি কাউকে চিনি না। সরোজ ও পরিমল এল। তাদের সঙ্গে কতক্ষণ গল্প করি। সময় নেই, সেখান থেকে বেরিয়ে বাসে শেয়ালদ'। রবীনের বাড়ি থেকে খাতা নিয়ে ১০-১৫-এর ট্রেনে রওনা। বনগাঁ আসবার আগে খুব ঘুমুই। হেঁটে এলুম হরিদার বাড়ি। সেখানে ভোজ, S.D.O., মনোজ, প্রফুল্ল, সতীশ কাকা, নিশিদা সবাই। খেয়ে একখানা গরুর গাড়ি পেলুম। তাতে বাড়ি। বরোজপোতার বনের মধ্যে দিয়ে এলুম জীবনে এই প্রথম। কল্যাণী চুল বাঁধচে। দুজনে নদীঘাটে স্নান করে আসি। ও ভালো ধূপ এনেচি তাই জ্বালালে। সন্ধ্যায় নিয়ে গিয়ে দেখালে কেমন লক্ষ্মী পেতেচে—ধূপের গন্ধ বেরুচ্চে। বন্ধু এসেচে—তার সঙ্গে গল্প করি। সুধীর মাস্টার এসেচে, ধান দেওয়া হবে। কল্যাণী ও আমি ঠেস্ দেওয়ালে জ্যোৎস্নায় বসে কত কথা।

১৭ই মে, ১৯৪৩। ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০। সোমবার। বারাকপুর

জিতেন কামারের মা মারা গিয়েচে এতদিন পরে পরশু সকালে। আজ যখন সন্ধ্যায় ইন্দুদের বাড়ি বসে, তখন'হরিবোল' দিয়ে লোক ফিরে এল ওকে দাহ করে। পুরোনো দিনের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ ঘুচে গেল। সকালে খাতা রেখে কল্যাণীর সঙ্গে স্নান করে এলুম। স্নিগ্ধ কালো জলে তিনি যেন খেলা করচেন। বিকেলে আবার দুজন মাঠে বেড়াতে যাই। ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল, পথে বিল্বপুষ্পের সুগন্ধ। সুন্দর জ্যোৎস্না ভেঙেচে নদীজলে—কি অপূর্ব শোভা ভগবানকে ডেকে বল্লুম—তোমার নিত্য সঙ্গী হয়ে থাকতে চাই—ঐ সন্ধ্যাতারার মতো রহস্যের মধ্যে, জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের উদার ব্যাপ্তির মধ্যে, বনপুষ্পের সুবাস ও বিহঙ্গকাকলীর মধ্যে আমায় তোমার খেলার সঙ্গী করে রেখো যুগে যুগে। তুমি আপনমনে বিশ্বের বনতলে নবীন কিশোর সেজে বনফুলের মালা গলায় উদাসী হয়ে বেড়াও—কে তোমায় পোছে ?কেউ না। সবাই ধন, জন, মান, যশ নিয়ে ব্যস্ত। কে দেখেছে ওই জ্যোৎস্নাময়ী নিশার অপূর্ব মনমাতানো শোভা ?আমায় দেখবার চোখ দিয়ো জন্মে জন্মে। বারবার আসতে যেতে কোনো আপত্তি নেই আমার—তবে তুমি মহাশিল্পী, তোমার প্রসাদ যেন লাভ করি—এই চোখ নিয়ে যেন আসি। ইন্দুর ওখানে পরলোকতত্ত্বের আলোচনা করি—ওর বৌ শুনতে চাইলে। মহাদেব রায়ের পত্র পেলুম আজ।

১৮ই মে, ১৯৪৩। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে খাতা দেখতে দেখতে একটি ছেলে যীশুখ্রিস্টের জীবনী লিখেচে দেখে অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ, পাখির কলগান ইত্যাদির মধ্যে বসে কি সুন্দরই লাগল। ৺নারাণ বাঁড়ুয্যের আজ শ্রাদ্ধ—তাদের বাড়ি গিয়ে বসি। তারপর ফিরে এসে কল্যাণীকে নিয়ে স্নান সেরে ঘরের মধ্যে পড়চি—তিনু এল, জেলি এল। তারপর নিমন্ত্রণ খেতে গেলুম, মতিকাকা পরিবেশন করলেন। এমন সময়ে কল্যাণীর চিঠি গিয়ে হাজির, ঊষা এসেচে। ছুটতে ছুটতে এলুম। ঊষাকে দেখতে গজন, অমূল্য, পচা, ছেলেপুলে বহু এল। ঊষা চশমার খাপ এনেচে একটা। অনেক গল্প করলে। ঊষা যে এভাবে এখানে আসবে স্বপ্নের অগোচর। কতক্ষণ বসল—রান্নাঘরে নিজে গিয়ে লুচি ভাজলে ও বেলে দিলে। কল্যাণী ও আমি নদী দেখিয়ে আনলুম। ঊষা দেখে খুব সন্তুষ্ট হল। ১৯৩৬ সালে আমি এখান থেকে প্রথম চিঠি দিই এলাহাবাদে। তখন খুকু আছে—বা তার সঙ্গে খুব ভাব। সেই ঊষার কতদিন যোগাযোগ ছিল না—হঠাৎ সে আসবে এখানে তা ভাবিনি। সে চলে গেল ঘোড়ার গাড়িতে। আমরা গল্পগুজব করলুম। ইন্দুর বাড়িতে জ্যোৎস্নারাত্রে। মি. সিনহা কাল আসবেন।

১৯শে মে, ১৯৪৩। ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। বুধবার।

আজ সকালে উঠে খাতা দেখি। একটু বেলা করে স্নান সেরে আসি। ঘুমিয়ে ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করচি, কেউ এল না। বেলা গেল। কোথায় মি. সিনহা ?এমন সময়ে ইন্দু বল্লে, ঘোড়ার গাড়ি এল একখানা। মায়াদি ও মি. সিনহা এসেচেন। মি. সিনহাকে নিয়ে কুঠীর মাঠে ও কাটাখালির পুলে বেড়াই জ্যোৎস্নারাত্রে। ঠেস দেওয়ালে বসে কত গল্প করি। সত্যনারায়ণের সিন্নি খেতে নিয়ে যাই গঙ্গাহরি ও কালোবাবুর বাড়ি। জ্যোৎস্নাতে নদীতে স্নান করি তিনু, মি. সিন্‌হা।

২০শে মে, ১৯৪৩। ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার। পূর্ণিমা

সকালে উঠে S.D.O.-কে লিখে দিই। সিন্‌হাকে গ্রাম দেখাই। গোসাঁই বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে ফিরি। নদীতে স্নান করে ফিরি। হাটে যাই এমন সময় রতিকান্ত বল্লে, S.D.O. এসেচেন। ছুটতে ছুটতে এলুম। S.D.O.-কে মায়াদি ও কল্যাণী বসিয়ে রেখেচে। বন্ধুও এসেচে সঙ্গে। ওদের চা খাইয়ে গল্প করিয়ে ছেড়ে দিই। সভা হল চড়কতলায়, মতিকাকা সভাপতি। অনেক রাত্রে (রাত দশটা) নদীতে স্নান করি তিনু, মি. সিনহা ও আমি। সাঁতার দিয়ে ওপারে অনেকরাত পর্যন্ত গল্প।Art ফিল্ম ও আনন্দবাজারের প্রফুল্ল সরকারের চিঠি পেলুম গোপালনগরের হাটে গিয়ে। মহেন্দ্র সেকরার দোকানে বসে চিঠিখানা পড়লুম।

২১শে মে, ১৯৪৩। ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। শুক্রবার।

সকালে উঠে সিন্‌হাকে উঠিয়ে আমরা নদীর ধারে গেলুম। আমি গেলুম ওপাড়ার ঘাটে। সেখানে ফণি দেখি দাঁড়িয়ে। তাকে বল্লুম—দ্যাখো তো মি. সিনহা আসচেন কিনা ?ফিরে দেখি ও এসে সাজগোজ করচে। চা খেয়ে ওরা চলে গেল। আমার কাছে লালমোহন, বুধো, মনু রায়, কালো [,] পাঁচু এল ধানচালের মীমাংসা নিয়ে। তারপর খাতা দেখি। দুপুরে কল্যাণীকে নিয়ে নদীর ঘাটে স্নান করে এসে খুব ঘুমুই। বৈকালে মার্কশিট লিখি ও খাতা দেখতে প্রায় সন্ধ্যা। কল্যাণী আমার সঙ্গে নদীর ঘাটে গেল। গলা দেখিয়ে দিয়ে বলে—মান্‌কু, হার আনিস্‌। মান্‌কু, হার এনো।...অন্তত দশবার বলবে ছেলেমানুষের মতো।

আমার মান্‌কু মস্ত বড় বীর।

মস্ত পালোয়ান—

সুন্দর নদীজল। ফিরে এসে চা খেয়ে ইন্দুর বাড়ি যাই। সেখানে অনেক লোক এল, গল্পগুজব হল।

২২শে মে, ১৯৪৩। ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। শনিবার। কলিকাতা

সকালে উঠে কল্যাণীকে বলি—ওঠো মান্‌কু। ওর আলিস্যি লেগেছে কিনা—ও বলে, মান্‌কু আজ আর যাসনে। তারপর ওঠে, চা করে। স্নান করে বেরুই। ট্রেনে কলিকাতা। রবীন দাঁড়িয়েছিল, হাত থেকে পুঁটুলিটা নিলে। সুইনহো স্ট্রীটে সিংহ ও মায়াদি নেই। আমি ঊষার বাড়ি গিয়ে দেখি ওরা নেই। সিন্‌হাকে নিয়ে আর্ট ফিল্‌ম, M.C., মিত্র ও ঘোষ ও প্রবাসী। ও চলে গেল—এলুম D.M.-এ। সেখানে কত খাবার খেয়ে কাত্যায়নী বুক স্টলে। গিরিন আজ এল। সজনীর বাড়ি তারাশঙ্কর এল। সবাই মিলে হল্লা করে বেরিয়ে প্রথমে কাজির ফন্ড ওঠাবার জন্যে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট। সজনী বলচে—বাংলাদেশের কথাসাহিত্য একেবারে জ্বল্‌জ্বল্‌ করচে। যোগেশ বল্লে—ত্রয়ী। সেখানে থেকে নিরুক্তায়ন। প্রেমেন, মানিক ইত্যাদি সবাই। সভা করে আমি বাসায় এসে কানুমামাকে নিয়ে ঊষার বাড়ি। সেখানে ঊষারা কাল চলে যাবে—বহুলোক আসচে। সজনী এল। ঊষা কাছে বসে গল্প করলে। একটি লোক বল্লে—বিভূতি না ?আমি বলি, কে ?সে বল্লে—অশ্বিনী। ৬০, মুজাপুরের অশ্বিনী। আমি তাকে টেনে এনে বলি—প্রথম বিয়ের ঘড়িটি দাও। ১৭ বছর পরে দেখা পেয়েচি।

ওখান থেকে ফিরি অনেক রাত্রে। হৈ হৈ সারাদিন। ওরা flush খেলচে একগাদা নোট বাজি রেখে। অজিত ও বন্ধুবান্ধব। হায় হায়, এই কি জীবন ?কোথায় কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ, কোথায় বকুল ফুলের সৌরভ !

২৩শে মে, ১৯৪৩। ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। রবিবার।

আজ সকালে উঠেচি, তখনো জ্যোৎস্না। প্রতিমা ঠাকুরের 'নির্বাণ' পাঠ করি। পড়তে পড়তে চোখে জল এল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বহুপুণ্যে এক প্রাচীন দিনের ঋষি এসে জন্মেছিল সেই বংশে।

পাশে সুরেশ চক্কত্তির বাড়ি। মহাদেব রায় এল, পরিমল এল, বিভাস ও সরোজ এল। সুরেশ খিট্‌খিটে মেজাজের বৃদ্ধ—বল্লে, এখান থেকে উঠে ওদিকে গিয়ে বসুন। পরিমলকে পাশের ঘরে এনে খুব গল্প। মহাদেবের সঙ্গে বাণী রায়ের বাড়ি। সেখানে চা খেয়ে গল্প। বাণী রায়ের মা বই উপহার দিলেন। বাণী রায় ফুল তুলে দিলেন। কানুমামার বাড়ি মহাদেবকে খাইয়ে সোজা রওনাশেয়ালদায়। বৈঠকখানা বাজারে জিনিস কিনে ট্রেন ধরে বনগাঁ। সেদিন সিন্‌হা ও মায়াদি ওই ট্রেনে এসেছিল। গোপালনগরের গাড়িতে এলুম গোপালনগর। ভাণ্ডারখোলার সুশীল কত দুঃখ করতে লাগল ওর সেজো ভাই সংসারের সব হস্তগত করেচে। ওকে ভাগ দেয় না। নাকি টাকার শোকে মারা গেল। স্টেশনে নেমে গ্রামে হাট করি, মাছ কিনি। সাধনের ছেলে পেঁচো স্টেশন থেকে ব্যাগ ও উমার বড় পুতুলটা নিয়ে এল বাড়িতে। হেডমাস্টার, ননী মাস্টার, সুধীর মাস্টার ও হরিপদদাকে S.D.O. আসবার ও মিটিং-এর কথা বলি। তখনো বেলা আছে। কাঁটাল গাছের গায়ে রাঙা রোদ। এসেই কল্যাণীকে নিয়ে বাড়ি থেকে ঘাটে। বাবার দেওয়া চক্কত্তিদের দরুণ সেই জমিতে বসলুম। ওপাড়ার ঘাটে গেলুম ওকে নিয়ে। বিশ্বরূপের বাণী সর্বত্র। Flush খেলচে, ঐশ্বর্য নিয়ে ব্যস্ত কলকাতার বড় লোকেরা—দেখে এলুম—নবীন কিশোর উদাস, বালস্বভাব—ভালোবাসা না পেয়ে অন্য দিকে চলে যান—কেউ তাঁকে পোঁছে না।

ইন্দুর বাড়ি বসে গল্প করি—ইন্দু আমডোবের দত্তমশায়ের গল্প করে। সে খুব সৌখিন ছিল। ডবল নাগরার ভাত খেত। বড় ঘুম পেল শুনতে শুনতে। পা টলচে। শরীর বড় ক্লান্ত। বাড়ি এসে ঠেস দেওয়ালে ঘুমুই, রাত্রে কল্যাণী কত বল্লে—ও মান্‌কু, মান্‌কু গল্প বলো। আমি চোখই চাইতে পারলুম না। ও রাগ করে ওপাশে শুল। আবার এসে আমার গায়ে হাত দিয়ে বলচে—

মান্‌কু আমার মস্ত বড় বীর

মস্ত পালোয়ান—

খস্‌খসে এক কাশ্মীরি আলোয়ান

মান্‌কু, একটা গল্প বলো না ?

একটা জ্যোতিষী কাল বলেচে—আপনার এ বৌও মরে যাবে, জ্যোতিষী আর কেউ নয় আমাদের দ্বারেশ। তাই কেবল ভাবচি। হরিপদ ভারতী চিঠি দিয়েছেন আজ—তোমার বাবা কথকতা করে জনগণকে মাতিয়েছিলেন, সেই ধর্মপ্রাণ ৺মহানন্দের বংশধর তুমি। তাঁর ছেলের বিয়ে হবে—নিমন্ত্রণ করেচেন।

২৪শে মে, ১৯৪৩। ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। সোমবার।

মার কথা মনে পড়ে আজ সকালে চোখে জল এল। খাতা দেখি বসে। স্নান সেরে এসে খেয়ে আবার পড়ি গিরিবালা দেবী'র বই। বিকেলে গিয়ে বসলুম নতিডাঙার সেই জলি ধানের ক্ষেতে। অর্থাৎ সুন্দরপুরের পথে যেতে সেই অপূর্ব স্থানটি ! চমৎকার ছবি সেখান থেকে চোখে পড়ে। কাটাখালির পুলটি—ওপারের বটগাছের সারি, একখানি ছইওয়ালা গরুর গাড়ি এই শান্ত অপরাহ্নে ধীরে ধীরে পুল পার হয়ে এদিকে আসচে, ডাইনে নতিডাঙার বৃদ্ধ বটের প্রসারিত শাখাপ্রশাখা, মাকাললতার ঝোপ। সামনে আরামডাঙার মাঠে আউশ ধানের জাওলা, নীচের বাঁওড়ে জলি ধানের ক্ষেত—বাঁয়ে মরগাঙের বাঁকে আরোসবুজ, কলাতলার দোয়ারে জল দেখা যাচ্চে। বিশ্বরূপের ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলুম। যিনি অগ্নিতে জলেতে সর্বত্র আছেন, তাঁর কথা চিন্তা করলুম। এই অপরূপ দৃশ্যেও তিনি। কুঠীর জঙ্গলে একঝাড় সোঁদালি ফুল ফুটেচে, হাত জোড় করে বল্লুম—আমার দেবতা, তুমি এখানেই আছ ?এই বনতলে আকাশের তলে তোমার মন্দির—তোমায় নমস্কার, হে দেব। নদীতে স্নান করলুম। ইন্দুর বাড়ি হরিপদদা, কালো [,] পাঁচু ও ফণি কাকা বসে গল্প করি। রাত্রে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি। ১ মাস এসেচি—তার মধ্যে এই প্রথম বৃষ্টি হল। এসেচি ২৩শে এপ্রিল।

২৫শে মে, ১৯৪৩। ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

আজ সকালে কাদাঘাটের পথে। ঠাণ্ডা দিন। খাতা দেখতে বসেচি—হরিপদদা ডাক দিলে, সে ৺পুরী যাবে, সব ঠিক করতে ডেকেচে। খাতা দেখতে দেরী হল—নাইতে গিয়ে কল্যাণীকে খুববকলুম ধোপা মাগীকে ১৷৷০ আনা দেবার জন্যে আমার হাতবাক্স থেকে, কারণ সে আমার কাছে ৷৷০ আনা ফাঁকি দিয়ে নিয়ে রেখেচে। আজ অনেকদিন। কল্যাণী সরলা, অত না বুঝেসুজে পুরো তার দিয়েচে। এই নিয়ে ও বকুনি খেল। বরোজপোতা ডোবার ধারে। স্নান সেরে খাতা দেখি বেলা ৪টা পর্যন্ত। তারপর বেলেডাঙার ওপারে সেই যে জায়গায় ঊষার পত্র পড়তুম বসে—সেখানে গেলুম। বক চরচে দাম দলে, কচুরীপানায় ফুল ফুটেচে—কল্পনা জাগল ভগবান সম্বন্ধে অনুভূতিসমূহ একত্রীভূত করে একখানা বই করবো।

স্নান করলুম মংলা ও আমি। কল্যাণী, মানু ও উমা খানিক আগে গা ধুয়ে গিয়েচে। ঘাটের পথে কল্যাণী যখন কলসি-কাঁকে জল আনতে যায়—সে দৃশ্য এই গ্রামের বহু বিস্তর পুরোনো দিনের বন্ধুদের সঙ্গে ওকে এক করিয়ে দেয়। রাত্রে হরিপদদার বাড়ি গোপালনগর ফাঁড়ির পুলিশ এসেচে—তার সঙ্গে ইন্দু, ফণিকাকা, আমি সবাই বসি, গল্প করি পরোটা মাংস খাই। এঁটো সর (?)কৃষ্ণকে নিবেদন করি।

২৬শে মে, ১৯৪৩। ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। বুধবার।

সকালে উঠে ১৭ খানা খাতা দেখি। স্নান করে এসে Sri Ashutosh Memorial Volume পড়ে একটা মৌচাকের লেখা লিখে চালকী বেরুবো—এমন সময়ে বন্ধু এল। চড়কতলায় মিটিং—হাজারি ঘোষের কেস্ নিয়ে। রাত ১২টা পর্যন্ত। অনেকরাত্রে দেখি বন্ধু এসে ডাকচে, সঙ্গে মধু কামার ও গুড়ে জেলে। তাকে অনেক বুঝিয়ে নলে নাপিতের বাড়ির দিকে রওনা করি। আবার ভোরে মাঠ থেকে এসে দেখি বাড়িতে 'চা খাবো' 'চা খাবো' করচে। আমি নদীর ঘাটের পথ দিয়ে ফণি কাকার বাড়ি। সেখানে মহা গুলতান। হাজারি ঘোষের বিচার হল। রতিকান্ত শুয়েছিল, তাকে তো মারতে যায়—অতিকষ্টে ঠেকাই। সুধীরদা এল—আমায় ডেকে পাঠালে। বন্ধুকে বনগাঁ যাওয়ার কথা বলে দিয়ে বাড়ি এসে ৯।।০টার সময় খাতা দেখতে বসি। দুপুরে খুব ঘুমুই। কাশীনাথ এসে একখানা চিঠি দিচ্চে, তাকে তাড়া ?এক গরুকে বেঁধে গেল সারারাত আমার বাড়ি, অমূল্য মুহুরির ধান খেয়েচে, তার বিচার হবে। কল্যাণীকে নিয়ে বিকেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম। কলা বাগানের পাশের মাঠে দিব্যি সোঁদালি ফুল ফোটা Forest glade, সেখানে বসে গজনের মা সেলাইয়ের কল দেয় না ইত্যাদি গল্প। রাঙা মেঘ নামল আকাশে—ওপারে সাঁইবাবলা গাছটার পাতার ফাঁকে ফাঁকে রাঙা রোদ মিশে আছে। কল্যাণী বল্লে, মান্‌কু তোমাকে আদর করতে ইচ্ছে হচ্চে। কি কালো জল ! বিশ্বরূপের অসীম রূপের এক দিক। কালো নদীজলে দেখলুম তাঁকে। তিনি জল হয়ে আছেন, ওপারের গাছপালা হয়ে আছেন। রাত্রে ইন্দুরায়ের বাড়ি গল্প। আমার উঠোনে সব গরু বেঁধে দিয়ে গেল—ধান খেয়েচে দুটো গরু—অমূল্য মুহুরির মাইন্দর ও রোমজান। খুব হাওয়া।

২৮শে মে, ১৯৪৩। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। শুক্রবার।

রোজ সকালে উঠে আমতলা দিয়ে যাই নদীর ধারের দিকে, যদি দুএকটা আম পাই—কিন্তু হাজারি জেলেনিকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না এ বিষয়ে। আমার সামনে তেঁতুলতলীর একটা আম আজ খপ করে সে তুলে নিলে। কেমন মজা লাগে এই অদ্ভুত জীবনধারার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলতে। কত কাল কেটে যাবে, হাজারি জেলেনির আম কুড়ানো ব্যাপারটা তখন কত তুচ্ছ হয়তো হয়ে যাবে—কিন্তু আজ সকালে সেটাই আমার কাছে খুব বড় একটা দুঃখ। কেন অত ভোরে সে আমতলায় আসে, কেন একটু আগে আমি আমতলায় পৌঁছাই নি ?হরিপদদা কোমড়ে মাছ আনতে গেল। হরিপদদার বাড়ি মাছ কুটলে কল্যাণী। তারপর সন্ধ্যার আগে আমরা নাইতে গেলুম সবাই মিলে। ছোট্ট মাঠটায় সবাই মিলে বসি। মহাদেব রায়ের পত্র এল, ১০ই এর আগে রওনা হওয়া হবে না।হরিপদদা কুমোরপাড়ার কাছে গিয়ে গজনের সঙ্গে কি একটা হৈ-হৈ করলে। বিশ্বরূপের কত ধরনই দেখি। রাত্রে বড় গরম। নদীতে নাইতে গিয়ে আজ রাঙা মেঘের কি চমৎকার দৃশ্য !

২৯শে মে, ১৯৪৩। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। শনিবার।

সকালে রোয়াকে কাগজ দেখতে বসেচি॥, মেঘান্ধকার আকাশ দেখে উমা আমি ও কল্যাণী প্রাণপণে শুকনো কাঠগুলো তুলতে লাগলুম। কল্যাণী আমতলা থেকে বেছে বেছে কাঠের কুচোগুলো ঝুড়ি করে তুললে—তারপরেই ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি নামে। সারাদিন সমানে বাদলা। নবীন মেঘসজ্জা দেখে এতদিন পরে মনে কি আনন্দ ! যুগে যুগে প্রকৃতি একইরকম আছে— বদলাচ্চে মানুষে। হরিপদদা ও গজন, অমূল্য প্রভৃতি এল। ধান চালের দোকান নিয়ে কথা। বিকেলে কল্যাণীকে নিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় মাঠে বেড়াতে যাবার আগে যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—সেটা হল নদীতে বৃষ্টি মাথায় নাইতে গিয়ে। সাঁতার দিয়ে গেলুম। শ্যামল বৃষ্টিসিক্ত তরুশ্রেণী, নলখাগড়ার ঝাড়, উলুবন। উর্ধ্ব [ঊর্ধ্ব] মুখে আবৃত্তি করলুম [,] য দেবা' গ্নৌ য 'স্নু' যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ (?)" বৈদিক ঋষিদের এই কবিতা যেদিন প্রথম রচিত হয়েছিল, দৃশ্যদ্বতী [দৃশদ্বতী] তীরে, এমনি বৃষ্টি নেমেছিল। নিদাঘতপ্ত দিনগুলির ওপর এমনি নবীন নীল মেঘসজ্জা, এমনি নদীজলে নেমে ঋষি তাই মন্ত্র পড়েছিলেন। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল গাথা। আজও তেমনি সেই গাথা কতযুগ পরে বাংলার এক ক্ষুদ্র পল্লীনদীর জলে নেমে একজন লোকের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্চে। সত্যিকার জিনিস কখনো মরে না, নষ্ট নয় না, হারিয়ে যায় না।

কল্যাণীকে নিয়ে কুঠী পেরিয়ে ওপারের নাবাল মাঠটাতে জলের ওপর বেড়াই, বৈঁচি তুলি। মেঘের দৃশ্য অপূর্ব, সবুজ উলুবন, ক্রমে বেলা পড়ে পশ্চিম দিগন্ত রাঙা মেঘে ছেয়ে গেল। ওপারে সেই সাঁইবাবলা গাছটার ডালপালা সেই মেঘের আভায় রাঙা হয়ে উঠল। অনেক রাত পর্যন্ত গিরিনদা ও ইন্দুর বাড়ি আড্ডা। খুব ব্যাঙ ডাকচে—রাত্রে অগণিত জ্যোতিলোক, ব্যাঙের কলরব ও ঝিঁঝিঁর ডাক—বিশ্বরূপের এ আবার কি মূর্তি ! এই অন্ধকারে তারাভরা আকাশতলে বসে এই ভেককলরবমুখর গ্রাম্য পল্বলকে যেন বিশ্বের প্রতীক বলে মনে হল—শত সহস্রকণ্ঠে তিনি কথা বলচেন—তাঁর বাণী বিরুদ্ধ ভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাইরে আসতে চাইচে—প্রথম বর্ষায় তাঁরইআনন্দ বাণী ধ্বনিত হচ্চে শতসহস্রকণ্ঠে।

৩০শে মে, ১৯৪৩। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। রবিবার।

সকালে উঠে খাতা দেখি ৮ খানা। নাইতে গিয়ে মাঠে গেলুম—যে মাঠখানায় বসে কুঠীর সেই গাছটা দেখা যায়। কি যে সুন্দর শোভা হয়েচে তা বলবার কথা নয়। মেঘলা দুপুর, সজল হাওয়া বইচে, ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল দুলচে—বৃক্ষশীর্ষাগ্রা শ্যামসজ্জায় দাঁড়িয়ে—সে যে কি অপরূপ দৃশ্য ! বিশ্বরূপের অনন্ত রূপের এক অতি মধুর রূপ। নদীজলে নেমে মুখ থেকে আপনি বেরিয়ে গেল—যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে, যিনি শোভন এ ক্ষিতিতলে [ক্ষিতিতলেতে], যিনি তৃণ তরু ফুল [ফুলে] ফলেতে, তাঁহারে নমস্কার।

বিকেলে হাটে যাবার আগে হরিপদদার ছেলে সয়ারামকে দেখতে এল এক ভদ্রলোক। সেখানে ডেকে নিয়ে গেল। ভদ্রলোকটি রেলওয়ের ডাকবিভাগে কাজ করেন। আমি ৪১, মৃজাপুর স্ট্রীটে সেই যে ১৯২২ সালে যে ভদ্রলোক ছিলেন এবং রেলওয়ে মেল সার্ভিসে কাজ করতেন—তাঁর খবর জিগ্যেস্ করলাম। নামটা মনে ছিল না। তিনি বল্লেন—বিমলা করনজাই ?বললুম—ঠিক ঠিক, ওই নাম বটে। ২২ বছর আগের কথা। তিনি নাকি কলকাতাতেই আছেন। হাটে গেলুম। হাট থেকে এসে সবুজ মাঠ বনের মধ্যে মেঘ-থমকানো আকাশের তলা দিয়ে নেমে এলুম।

৩১শে মে, ১৯৪৩। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। সোমবার।

সকালে উঠে স্নানাহার সম্পন্ন করে নৌকো করে বনগাঁয়ে গেলুম। সঙ্গে এক নৌকোতে অমূল্য, মনু যায়, গজন, ফকিরচাঁদ ও লালমোহনের জামাই। কি সুন্দর কালো নদীজল, দুধারের সবুজ গাছপালার ছায়া পড়েচে জলে—আগে আগে এই নদী আমার কত আনন্দের ও আদরেরছিল, ছকু পাড়ুইয়ের নৌকো করে নদীপথে না গেলে (?)বার লাইব্রেরিতে মন্মথদা, সতীশ কাকার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বন্ধুর ওখানে ও যতীনদার ওখানে।S.D.O.'র বাড়ি গেলুম মনু খুড়োকে নিয়ে। সেখান থেকে যতীনদার বাড়িতে আড্ডা দিয়ে বাজারে পটলের দোকানে ও অনিলের দোকান। ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি এল সন্ধ্যাবেলা। ঘুটঘুটে অন্ধকার-এ নৌকো করে চলে এলুম। দুধারে ঘন অন্ধকার, মাথার ওপরে কিছু মেঘ, কিছু নক্ষত্র। মাঝি হচ্চে আদাড়ির (?)নাতি নীলু। নীলু বলে—আজ্ঞে আগে মাধবপুরের গোঘাটা। ক্রমে চালতেপোতার বাঁক ছাড়াল। চালকীর ঘাট ছাড়ল। বেজায় কাদা হয়েছে পথে। অন্ধকার রাত্রে যাতায়াতের বড় কষ্ট। যাবার সময় কল্যাণী দাঁড়িয়ে সলজ্জভাবে আস্তে আস্তে বল্লে—মান্‌কু, খাবার আনিস্ বনগাঁ থেকে।

ওরই কথানুযায়ী রসগোল্লা আনি।

১লা জুন, ১৯৪৩। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে জলে থৈ থৈ করচে চারিধারে। বৃষ্টিবাদলা নেমেচে যা এ বছর। সারাদিন বৃষ্টি আর বাদলা। খাতা দেখচি, তিনু এসে বক্‌বক্ শুরু করলে। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে বসি স্নানের পূর্বে—তারপর একাই নেয়ে এলুম। কল্যাণী জয়মঙ্গলবার করেচে, কিছু খাবে না এবেলা। আমি পাগলা জেলের মার কাছ থেকে চার আনা দিয়ে একপোয়া চিঁড়ে কিনে আনাই। কাল উমাকে নিয়ে গেছে। ওর দিদি খেঁদী—আর একগাদা আম কাঁটাল দিয়ে গেছে। কে কত খায় ?

সারাদিন বৃষ্টিবাদলে কোথাও যাইনি। কল্যাণীরা দল বেঁধে গেল পাঁচী যুগিনীর বাড়ি কালীপুজো দেখতে। এল যেমন, অমনি ভীষণ বৃষ্টি নামল—সে বৃষ্টি সারা সন্ধ্যা—অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত। সন্ধ্যার আগে অন্ধকারে আমাদের বাড়ির পেছনে বৃষ্টিভেজা বাঁশবনের পথে বেরুলাম। অপূর্ব রূপ এখানে বিশ্বরূপের, জনহীন গ্রাম্য বাঁশ আমবন, মেঘান্ধকার বর্ষণমুখর সন্ধ্যা, ভেককুল নীরব, জোনাকী জ্বলে না,—তিনি যেন অবর্ণনীয় উদাসীনতা নির্জনতার রূপ দিয়েচেন এখানে। এ একটা creation-এ রূপ যে দিতে পারে, এ ভাষায় যে কথা বলে—সে মহাশিল্পী। আকাশের দিকে হাত তুলে বললুম বৈদিক ঋষিদের সেই মুগ্ধবাণী—য (যো) দেবা'গ্নৌ [দেবোঽগৌ] যোঽপ্সু, য [যো]বিশ্ব [বিশ্বং] ভুবনমাবিবেশ—ইত্যাদি।

কল্যাণী ফিরে এলেই বলবে—রাম রাম বলো মান্‌কু—অর্থাৎ আমি ভূত কিনা।

উমা চালকীতে—সুতরাং বর্ষাসন্ধ্যায় কোথাও না বেরিয়ে রান্নাঘরে বসে গল্প করি। খুকুদের দিকের জানলাটাতে বসে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টিধারামুখর সন্ধ্যায় কালো জলে-ভেজা বকুল গাছটার দিকে চেয়েছিলুম। ওখানে খুকু বসে থাকত এমনি সন্ধ্যায়, আমি এখানে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে ওর গান শুনতাম। নতুবা ওদের দাওয়ায় বসে গল্প করতুম।

২রা জুন, ১৯৪৩। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। বুধবার।

সকালে কল্যাণীর সঙ্গে ঝগড়া করে ইন্দুর বাড়ি গিয়ে বসে রইলুম—চা খেলুম না। ও চা তৈরি করে বসেছিল, নিজেও খাইনি [খায়নি], লক্ষ্মীকে জল দিয়ে কত বেলায় যখন আমি ফিরেচি ঢক্‌ঢক্ করে এক গ্লাস জল খেলে। নদীর জল খুব বেড়েচে—ঘাস-ডোবা জল। কেউ বুঝতে পারবে না বারাকপুরের লোক ছাড়া—'ঘাস ডোবা' জল কাকে বলে। তীরভূমির তৃণাবৃত অংশগুলিও ডুবে গিয়েচে জল বেড়ে। কল্যাণীর সঙ্গে ঝগড়া মিটে গেল—ও গেল নলে নাপিতের বাড়ি চিঁড়ে কুটতে। পিসিমা, হাবুর মা, মানু, ফুচু, বুধো, মুংলী সবাই মিলে নৌকোয় বেড়াই বিকেলে, আজ এতদিন পরে এইমাত্র রোদ উঠেচে। ফুচুর মা কল্যাণীকে বলচে—কাকীমা, কাঠগুলো রোদে দেও, তা আমি শুনবো না। আমাদের পাড়ায় বধূরূপে দেখেচি মা, সইমা, জ্যাঠাইমা, ন'দি—এঁদের। ন'দি তখন ছেলেমানুষ বৌ। তারপর এলেন খুকুর মা, মেজ খুড়িমা ছোট খুড়িমা—এঁরা। তারপর শ্যামাচরণদার স্ত্রী, নেড়ার স্ত্রী, গৌরী, কালার স্ত্রী—এঁরা। এখন পাড়ার বৌ হচ্চেন কল্যাণী, ফুচুর মা আর মেয়ে হচ্চে মানু খুকু।

কল্যাণীকে নিয়ে মাধবপুরের মাঠে উঠে দাঁতন ভাঙা হল। নদীজলে আজ অদ্ভুত রঙিন মেঘস্তূপের দৃশ্য। ওপারের সাঁইবাবলা গাছটাতে রাঙা মেঘ যেন আটকে পড়েচে। আকাশের রং যেন ইন্দ্রনীল, নদীজলে পড়েচে তার ছায়া—সে কি অপরূপ দৃশ্য ! বিশ্বরূপের অনন্ত রূপের এ এক রূপ। নীল আকাশের দেবতার উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিই—তারপর কল্যাণীকে নিয়ে বাড়ি আসি। ঠেস্ দেওয়ালে বসে চা খাই। ঘরে আম কাঁটাল বোঝাই। পাকা কাঁটাল ও আমের গন্ধ ভুরভুর করচে। রাত্রে হাজারি ঘোষের বৌয়ের বিচার হল, তার দেওরের কাছ থেকে গহনা ও টাকা নিয়ে তাকে দেওয়া গেল।

৩রা জুন, ১৯৪৩। ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

সকালে প্রতিদিনের মতো নদীর ঘাট থেকে বেড়িয়ে এলুম—খাতা দেখতে বসি ৮ খানা। লালমোহন এল কালকার মোকর্দমার বিষয় নিয়ে। চুল [ছেটে] ছেঁটে দিলে নলে নাপিত। একটা পুরোনো মোকর্দমার কাগজে ইন্দু রায়ের বাড়িতে দেখি লেখা আছে :—উত্তরে পরমেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় [,] গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দুঃখীরাম রায়—ইত্যাদি। তারিখ ১২৮১ সাল, লেখক হরি রায়, অর্থাৎ পোড়া হরি। এখন চতুর্থ পুরুষের রাজত্বকাল নয়—তৃতীয় পুরুষের রাজত্ব চলচে। এই ৭০ বছরের মধ্যে। নদীজল স্নান [,] করতে গেলুম। বৈকালে নৌকোপথে কাঁচিকাটা। সবাইপুরের নদীর দৃশ্য, গাছপালা, শ্যামলতা-এর তুলনা কোথায় ?আরামডাঙার খালের মধ্যে নৌকো ঢুকিয়ে একটা পীরের দরগা পর্যন্ত গেলুম। অনেকগুলো ঝাঁকড়া গাছ, তলাটা অন্ধকার, পুরোনো ইঁটের দরগা—কতকাল পরে খালের মধ্যে নৌকোয় ঢুকি। সেই সিমন্ সাহেব এসেছিল যে বছর মানুর বিয়ে হয়—১৯৩৩ সালে—১১ বছর আগে। ইন্দুর বাড়ি গল্প করি বিকেলে। রাত্রে কল্যাণী কিছুতেই ঘুমুতে দেবে না। মান্‌কু, একটা গল্প কর। ওর আবার বড় ভয়। সন্ধ্যাবেলা একা থাকতে পারে না।

৪ঠা জুন, ১৯৪৩। ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। শুক্রবার।

ভোরে উঠে বাঁশবনের পথ দিয়ে যাও, দ্যাখো—পাগ্‌লা জেলের মা এবং হাজরি জেলেনী আমতলায় আম কুড়ুচ্চে। পাগলা জেলের মা বল্লে—"দাঠাকুর, এই দেখুন এই ক'টা আম—তার দুটি ঘেয়ো। আম ফুরিয়ে এল এ বছরের মতো। ক্ষীরপুলিতে দু'পাঁচটা আছে।" কতকাল থেকে এরা আম কুড়ুচ্চে জষ্টি মাসের পাখি-ডাকা ভোরে। ১৬/১৭ বছর ধরে আমিই দেখচি আর ছিল মধু (?)কামারের বিধবা বোন। সে মরে গেছে। ক্ষুদ্র পল্লীটির ইতিহাস যদি কেউ লেখে, এদের নাম সে ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা থাকবে এদের সময়ানুবর্তিতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণের জন্যে এই আম কুড়ুনো সম্পর্কে। এই মহাজঙ্গলের মধ্যে বসে, বুনো শূওর, ভূত উপেক্ষা করে শেষরাত্রে উঠে এসে আম খুঁজচে। ধন্যি সাহস।

খাতা দেখি ৮ খানা। স্নান সেরে একটু ঘুমুই। বিকেলে নতিডাঙা ছাড়িয়ে কতদূর চলে যাই মোল্লাহাটির পথে। গোয়ালাদের দোকানে বিড়ি খাওয়ালে। ইন্দুরায়ের বাড়ি গল্প করি সন্ধ্যায়।

কলাতলার দোয়ার পর্যন্ত গেলুম। পাকা খেজুর ছড়ানো পথের ধারে। বড় বড় বটগাছের সামনে আরামডাঙার আকাশে বক উড়চে—ঈষৎ নীলাভ আকাশ সাদা মেঘে ভরা। সূর্যাস্তের দেরি নেই। মি. সিনহা ও শান্তি এইমাত্র পত্র

দিয়েচে, বারাকপুর বড় ভালো লেগেচে তার। অন্যদিকে নতিডাঙার বড় বটগাছ ও বাঁকের দৃশ্য বড় ভালো দেখাচ্চে। নদীজলে নামি সন্ধ্যায়। বড় গুমট। বিশ্বরূপের অনন্ত রূপ, সব রূপই ভালো। জয় হোক হে নীলাকাশের দেবতা। হঠাৎ মেঘের দিকে চেয়ে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে এই সন্ধ্যায় এক অদ্ভুত অনুভূতি এল। জীবনের বিস্তৃতি ও অমরত্ব সামনে দেখলুম। যুগে যুগে বিশ্বে বিশ্বে অপ্রতিহত জীবনধারা অমর ও শাশ্বত মানবাত্মার বিজয় অভিযান শত দুঃখ সুখ প্রেম বিরহের ছন্দে ধ্বনিত হোক। জয় হোক হে বিশ্বদেব।

৫ই জুন, ১৯৪৩। ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। শনিবার।

সকালে পাগলার মা ও হাজারি আম কুড়ুচ্চে খুব ভোরে প্রতিদিনের মতো। নদীতে হাতমুখ ধুয়ে খাতা দেখতে বসি—৮ খানা দিনে। ফণিকাকার বাড়ি গল্প করি স্নানের পূর্বে। স্নান করতে দেরি হল। বিকেলে হর, জেলি, তিনু ও আমি নৌকো করে কাঁচিকাটার দিকে যেতে উঁচু পাড়টার নীচে নৌকো থামিয়ে সোজা মাধবপুর। কতকাল পরে মাধবপুর গেলুম ! ভরত ও আমি গিয়েছিলুম ৩০/৩২ বছর আগে বাল্যকালে। পার্বতীর বাড়ি যাবো বলে বেরুলুম—সেবারও যাই পার্বতীর বাড়িতে। পার্বতী বাড়ি নেই বলে একটা স্কুল মতো খড়ের ঘরে বসি। বসিরহাটের একটা ছোকরা সেখানে বসে, সে প্রসাদ, কালুকে চেনে। অনেক কাঁঠালগাছে কাঁঠাল ধরে আছে থোলো থোলো। বহুদেশ বেড়িয়েছি—মাধবপুর এতদিন পরে বেড়ালুম। সন্ধ্যায় নদীজলে স্নান করে ফিরি। দুটি নক্ষত্র উঠেচে। এক ফালি চাঁদ। চিল্কাহ্রদে নৌকোয় বেড়াবো সামনের শনিবারে এই জ্যোৎস্নায়। আজ ইছামতীতে নৌকোয় বেড়াতে বেড়াতে সেই কথা মনে হচ্চে।

৬ই জুন, ১৯৪৩ ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। রবিবার।

আজ সকালে খাতার পর্ব মিটে গেল এ বছরের মতো। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। মার্কশিট পর্যন্ত লেখা হয়ে গেল। কুঠীর মাঠে বেড়াতে বার হই স্নানের পূর্বে। গুয়োথলী গাছটার তলায় রোজই আম কুড়িয়ে পাই—কাল ও [কালও] পেয়েছি দুটো—তল্‌তলে গাছপাকা। আজ কুঠীর এপাশে পেয়ারাতলীর মাঠটাতে বসি একটুখানি। আগে আগে ইউনিভার্সিটির খাতা যেদিন শেষ হোত—তার কতদিন পরে বারাকপুরে এসে এসব জায়গায় আসতুম। আর এবছর এখানেই খাতা শেষ করে আজই মাঠে বার হয়েচি। আশ্চর্য লাগচে। নদীজলে স্নান করি, পিসিমা ঘাটে। আজই আবার 'দেবযান' আরম্ভ করলুম দুপুরের পরে। ভীষণ গুমট আজ। পুরী ও ওয়ালটেয়ার যাবো বলে কল্যাণী ও উমা আমতলার পাঠ তুল্লে প্রাণপণে সারা সকাল ধরে। বিকেলে 'দেবযান' আরম্ভ করে দিলাম—তারপর মেঘভরা বিকেলে হেঁটে গেলুম নতিডাঙার বটতলা পেরিয়ে মরগাঙের ধারের সেই জলি ধানের ক্ষেতে। সুন্দর, অদ্ভুত দৃশ্য ! কি শ্যামলতা ! কি শান্তি ! যিনি সূর্যে নক্ষত্রে নিওন, হিলিয়াম গ্যাসের আগুন জ্বেলে রেখেচেন তিনিই এই অপূর্ব শ্যাম-শান্তি-ভরা তৃণতরু, দৃশ্যের সৃষ্টি করেচেন—তিনিই অগ্নিতে, তিনিই জলেতে—অদ্ভুত Contrast !সূর্যের বিশাল অগ্নিকটাহের সৃষ্টি শুধু এই শ্যাম শান্ত বনশোভার প্রাক্-আয়োজন মাত্র। আগুন কেন ?না জল তৈরি হবে বলে। বিশ্বদেবের রূপের নতুনত্ব দেখলুম নদীজলে যখন নাইতে নেমেচি—ঘন কালো মেঘ করে এসেচে কুঠীর দিকে। উড়ে আসচে—নব মেঘসজ্জার কি রূপ ! প্রণাম করলুম কতবার। ভীষণ বৃষ্টি এল। সুরেন ধোপা কাপড় দিতে এসে গাইলে, 'চেয়ে দেখ ঐ মহাপ্রস্থান'—যাত্রার গান, ছেলেবেলায় শোনা। 'পরশুরামের মাতৃহত্যা' পালার গানখানা। গোপালনগরের যাত্রার আসরে শোনা।

৭ই জুন, ১৯৪৩। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ সোমবার।

সকালে উঠে গল্পের বই পড়ি। খাতা নেই। হরিপদদার বাড়ি গিয়ে কথাবার্তা বলি। স্নান করে এলুম—তারপরই দুপুরের পরে ঝমঝম বৃষ্টি-অনেকক্ষণ ধরে—পথঘাট ভেসে গেল। আম কুড়ুতে বেরুল। ইন্দুদের বাড়ি যাওয়ার আগে খোকা খুড়োর শ্বশুরের সঙ্গে গল্প করি। ইন্দুর বাড়ি গল্প করে বাড়ি এলুম সকাল সকাল। বাঁধাছাদা [ছাঁদা] হল।

৮ই জুন, ১৯৪৩। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। মঙ্গলবার। চতুর্থী

উমাকে গাড়ি ডাকতে পাঠালুম। তারপর রওনা। সয়ারাম সঙ্গে গেল। তিনু রানাঘাট যাচ্চে আমাদের সঙ্গে। লালমোহন যাচ্চে সাইকেলে, সে বল্লে অত তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে হবে না। জাম পড়েচে গোপালনগর স্টেশনের কাছে—আমাদের দিলে। স্কুলের ছেলেরা খাতির করলে।খিনুদের বাড়ি গেলুম রানাঘাটে। চা ও খাবার খাই। ট্রেনে কলকাতা—সঙ্গে ভাদ্দন ও বাঁদুর ছেলেটা। মিলিটারির লোকেরা জায়গা দিলে। কল্যাণীদের ওয়েটিং রুমে বসিয়ে আমি M.C. গজেন খেয়ে (?)ওদের নিয়ে গেলুম বালিগঞ্জে। বাণী রায়ের ও সইয়ের বাড়ি হয়ে সন্ধ্যায় ফিরি। রাত্রে অণিমা মেয়েটা এসে গল্প করে। অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে ট্রামে দেখা। কল্যাণীকে দেখালুম।

৯ই জুন, ১৯৪৩। ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। বুধবার। কলিকাতা

সকালে খাতা দিতে যাই সুরেশবাবুর ওখানে। কৃষ্ণদয়াল, মহাদেব, বিভাস, সরোজ সবাই। মহাদেবের সঙ্গে চারু বিশ্বাসের বাড়ির সামনে দিয়ে দ্বারিক ঘোষের দোকানে খাবার খাই দুজনে। এক (?)সামনের দোকানে ওর সঙ্গে গেলুম। ভীষণ গরম সেখানে। হরেন কোত্থেকে এসে হাজির সেখানে জিগ্যাস করতে করতে। বাড়ি এলুম—খেয়েই ২টার বাসে মিত্র ঘোষ। মহাদেবের সঙ্গে সজনীর 'শনিবারের চিঠি'র অপিস্। বাণী রায় ফোন করলে। এক মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে আমরা শান্তি পালের দাদার সিনেমাতে গিয়ে খাবার ও চা খেয়ে গল্প করে বেরুই। পথে গিরিনের সঙ্গে দেখা করে পাঁচীর বাড়ি এলুম। পাঁচী গিয়েচে খোট্টা বাড়ি বেড়াতে। সেখান থেকে তাকে ডেকে কথা বলে যাচ্চি, কানু ঘোষের লেনে দেখি এক বাড়িতে যমুনা [—] অন্নপূর্ণার বোন। তার সঙ্গে কথা বলে বুদ্ধদেবের খোঁজ নিয়ে বাসে উঠবো, মনে হল P.C.Roy-কে দেখি না ?দেখা পেলুম। মহাপুরুষের কানে কে যেন বল্লে—ইনি পথের পাঁচালীর বিভূতিবাবু। অমনি উনি চোখ বুজে বল্লেন—immortal ! immortal !আমার চোখ দিয়ে জল এল। বল্লুম—মনে আসে সেই last great war, সেই আমরা যুদ্ধের সম্বন্ধে আলোচনা করতুম। উনি হাসলেন। কি বল্লেন, ভালো বোঝা গেল না। ক্ষীণ সুর। বল্লেন—৮২ বছর বয়সে আর কি চাস্ ?বল্লুম—কাল আপনার বৌমাকে আনবো। বল্লেন—হাঁ ওখান থেকে এসে মিতের মেস্ হয়ে কেষ্টধনের বাড়ি। সুধীরের সাথে দেখা—সত্যর ভগ্নিপতি সুধীর— তার স্ত্রী বলেচে—দাদা আসেনি কতদিন। বাসে সন্ধ্যায় বাড়ি।

১০ই জুন, ১৯৪৩। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার। ষষ্ঠী কলিকাতা

সকালে উঠে কল্যাণীকে নিয়ে প্রথমে রমাপ্রসন্নের বাড়ি, তারপরে Sir P.C.Roy-এর কাছে গেলুম। আচার্য রায় ওকে মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বল্লেন—বৌমা, অত আদর কোরো না। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা পাঁচীর বাড়ি যাই—পাঁচী দেখে খুসি। চা খাওয়ালো। বাড়ি এসে জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা। বাসে রওনা হাওড়া স্টেশনে। ট্রেন ভীষণ লেট্ করে ছাড়ল—সেকেন্ড ক্লাসে কোনো ভিড় নেই—বেশ ঘুমিয়ে যাওয়া গেল।

১১ই জুন, ১৯৪৩। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। শুক্রবার।

কটক—পুরী Last date for submitting university papers.

ভোর হল রূপসা জংসনে—কিন্তু ঘুম ভেঙে উঠে দেখি দিব্যি শ্যামশ্রীমণ্ডিত বাঁশবন, দেখে মনে হল, এখনো কি বাংলাদেশে আছি নাকি ?একজন বল্লে না এটা বালেশ্বর জেলা। যতই ট্রেন এগিয়ে চলে, ততই গাছপালার সবুজ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই—হঠাৎ বাংলাদেশের যশোর জেলার মাঠবনের পেছনে দেখা দিলে পাহাড়, শৈলমালা। নতুন দৃশ্য বটে। ব্রাহ্মণী নদীর উভয় তীরে বন পাহাড়ের একত্র সমাবেশ, মহানদী ও ঘাট্জুড়ি নদীদ্বয়ের দৃশ্যও অতি চমৎকার। সেকেন্ড ক্লাসে হঠাৎ বড় ভিড় হয়ে গেল—ক্রমে এল কটক, ভুবনেশ্বর—তারপর মালতীপাটপুরের নারিকেলবৃক্ষশ্রেণী, ঘন শ্রেণীবদ্ধ গাছপালা। তারপরই পুরীধাম। বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে পথেই। গজেনবাবু, সুমথবাবু এসে নামিয়ে নিলে। রিক্সায় যেতে যেতে প্রথমে সমুদ্র দর্শন হল—অনন্তের এ রূপ কতকাল দেখিনি। বীচিবিক্ষোভময় সমুদ্র উত্তাল হয়ে আছড়ে আছড়ে পড়চে। কল্যাণী তো দেখে রিক্সা থেকে হাঁ করে চেয়ে রইল একদৃষ্টে। গজেন কি একটা লাইব্রেরিতে বল্লে—এসে গেছেন। শুনলুম কাল নাকি সভার ঠিক হয়ে গেছে। গজেনবাবুর বাড়ি গিয়ে মহাপ্রসাদ খাওয়ালে। ৺জগন্নাথের মন্দির দর্শন করে এলুম। চৈতন্যমহাপ্রভুর স্তম্ভ পর্যন্ত দেখা গেল। প্রাচীন। ভারতবর্ষ এখানে এখনো বেঁচে আছে—অন্ধকার গর্ভগৃহগুলিতে লোহার শেকল বাঁধা প্রদীপ জ্বলচে। সমুদ্রের তীরে বসে কত রাত পর্যন্ত আমরা গল্প করলুম—গজেন, সুমথ, মহাদেববাবু।

১২ই জুন, ১৯৪৩। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। শনিবার। অষ্টমী ৺পুরীধাম

সকালে উঠে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি। আমরা গজেনবাবুর ওখানে গেলুম। বীরেন রায় এলেন—চা খাই সবাই। ফিরে এসে তেমনি ঝড় ও বৃষ্টি। সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেচে, উমা বল্লে—ঐ দেখুন মামা সমুদ্র কেমন হয়েচে। সমুদ্রের দৃশ্য সত্যই অতি ভয়ঙ্কর। একজন নুলিয়া আমায় সমুদ্রে স্নান করাল। প্রত্যেকে ডাঙায়। বারকয়েক এমন পড়ে শ্রান্ত হয়ে পড়লুম। প্রসাদ এল বেলা ৫টার সময়। খেয়ে সমুদ্রতীরে বেড়িয়ে এলুম কল্যাণী, আমি, উমা ও মহাদেববাবু। তারপর গজেনরা এল, ওদের সঙ্গে হরিদাসের সমাধি দেখতে গিয়ে বড় ভালো লাগল। শান্ত স্থান, শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে হরিদাসকে এখানে বালুতটে বালুর মধ্যে প্রোথিত করেন। অতি সুন্দর স্থান। পুরুষোত্তম মঠে বেড়িয়ে এলুম—সেখান থেকে একদিকে ঝাউবন, একদিকে নীল সমুদ্রের দৃশ্য অতি মনোহর। বিকেলে ক্লার্ক হলে সভা। ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করলেন। তিনি বল্লেন—আশার বাণী দেখতে পাচ্চি, বিভূতিবাবু পুরাতন ও নূতনের মধ্যে সেতু রচনা করেচেন। জ্যোৎস্না উঠেচে,

অনেকের সঙ্গে আলাপ হল—S.D.O. মি. পাতিলের সঙ্গে। সবাই মিলে একটি চমৎকার রেস্টোরেন্টে চা খেতে গেলাম। সেই জ্যোৎস্নায় সমুদ্রতীর দিয়ে সবাই ফিরি। কল্যাণী সারাদিন অনেক ঝিনুক কুড়িয়েচে।

১৩ই জুন, ১৯৪৩। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। রবিবার। ৺পুরীধাম

সকালে উঠে শুনচি ভীষণ বৃষ্টি চলচে, কাল রাত থেকে শুরু হয়েচে—আমরা বাইরে থেকে ভেতরে শুতে গিয়েছিলাম। গজেনবাবুর মা এসে ডাকচেন—বৌমা, বৌমা—আমি বল্লুম, কি ?উনি বল্লেন, বৌমাকে পাঠিয়ে দাও সমুদ্রে স্নান করতে। আমি যাচ্চি। ওরা তো সমুদ্রে স্নান করে এসে খুব খুসি। তারপর কল্যাণী ও আমি ৺মন্দির বেড়াতে গেলুম। একটা মঠ পড়ল, ছাতার মঠ। সেটা থেকে বেরিয়ে গোবিন্দজীর মঠ দেখে বেরুচ্চি, মহাদেববাবু ও তার স্কুলের asst. headmaster প্রতাপবাবু ডাকচেন। সবাই একসঙ্গে এমার (?)মঠ দেখতে গেলুম। এমার মঠ ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বিশেষ অর্থবান মঠ। একটি পাঠাগার আছে শুনলুম, প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদি আছে। তারপর শ্রীমন্দিরে অনেকক্ষণ গিয়ে রইলুম। গজেনের মা গিয়েচেন। তাঁর সঙ্গে রত্নবেদী পরিক্রমা ও দর্শন ইত্যাদি হল। নানাভাবে সেই বিরাট মন্দিরের গম্ভীরা, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগসমূহ দর্শন করলুম। লক্ষ্মীঠাকুর (?)বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি বহু স্থান সেই সঙ্গে দেখলুম। ১২॥০ টায় স্নান করে ঘুমুচ্চি, সুমথবাবু এল, প্রতাপবাবু এল। তখনো প্রসাদ আসেনি। প্রসাদ এল ৪॥০ টার সময়। খেয়ে গজেন সুমথ [,] মহাদেববাবু ও আমি বেরুলাম স্টেশন রোডে। সেই দোকানে চা খেয়ে এক জুতোর দোকানে বসে আছি, গালুডির হরিপদ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। সে এখন দেশে আছে। বল্লে, বেড়িয়ে বেড়িয়ে জীবনটা নষ্ট করলুম, বিভূতিবাবু। রাত্রে ফিরে এলুম।

১৪ই জুন, ১৯৪৩। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। সোমবার। দশমী। পুরী

আমার ওখানে বৃন্দাবন মল্লিক, প্রতাপবাবু, খগেনবাবু, সুমথবাবু আরো অনেকে বসে খুব আড্ডা। অনেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

সকালে উঠে বসে লিখচি, গালুডির সেই হরিপদবাবু এল। প্রতাপবাবুও এল। সবাই মিলে গজেনবাবুর ওখানে গেলুম—বীরেন রায় পুঁতির মালা, হাতির দাঁতের কাজ ইত্যাদি তোষালি নগরের antiquity দেখালে। কল্যাণীকে উপহার দিলে একটা বরাভয়কর টুক্‌রা, একটা পাথর, সমুদ্রের শঙ্খ। বিকেলে সমুদ্রে স্নান করলুম—ঢেউ আসে, ডুব দিই—নুলিয়া সঙ্গে ছিল। শঙ্কর মঠে গিয়ে একটি অপূর্ব গোপাল মূর্তি দেখে বড় ভক্তি হল। দোর খুলে চুপি চুপি সে ঘরটাতে গিয়ে বসেচি, মহাদেববাবু গজেনবাবুকে বলচে অভীষ্ট দেবতা কিনা ?ভূপেন সান্ন্যালের বাড়ি গিয়ে যোগী গুহা দর্শন ও অধ্যাত্ম আলোচনা। তারপর ফিরে এসে দেখি কল্যাণীরা মন্দির থেকে 'রুক্মিণী হরণ' দেখে ফিরে এসেচে। ওদের নিয়ে নানক মাঠে যাবো, এমন সময়ে রিক্‌সা থেকে নেমে এক ভদ্রলোক বল্লে—বিভূতি বাঁড়ুয্যে লেখক এখানে থাকেন ?আমি বল্লুম—আমিই। বল্লে, খুরদা রোডে মিটিং হবে পরশু, সেখানে যেতে হবে সব। তারপর আমরা সবাই বেরিয়ে আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে চা খেয়ে লাইব্রেরিতে আড্ডা দেই ও ঝাউবনের ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নায় চক্রতীর্থে সমুদ্র দেখি। বালির ওপর কতক্ষণ বসে। বীরেন রায় আমার বাসা চলে এলেন। কত রাত পর্যন্ত আড্ডা। ভিক্ষু পাণ্ডা এল অনেক রাতে।

১৫ই জুন, ১৯৪৩। ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০। মঙ্গলবার। ৺পুরীধাম

সকালে উঠে লিখি ডায়েরি। সামনের ঘরের বুড়োবুড়িকে নিয়ে বন হরিদাসের মঠ, পুরুষোত্তম ও শঙ্কর মঠ ঘুরিয়ে আনি। কি অসংখ্য চন্দন ফুলের গাছ বালির ওপরে ! ভূপেন সান্ন্যালের বাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল। গজেনবাবু প্রভৃতির সঙ্গে খেলুম। ভূপেনবাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের গল্প করলেন—অমন দেবতুল্য উদার লোক আর কখনো দেখেন নি। ভূপেনবাবুর সাদা দাড়ি ও উদার বড় বড় চোখে যখন এসব বলছিলেন—তখন দূরে নীল সমুদ্রের সঙ্গে মিলিয়ে বেশ লাগছিল। হু হু হাওয়া বইচে। শঙ্কর মঠে গোপালবিগ্রহ আবার দর্শন করি। কেমন একটি পুষ্পচন্দনের সুবাস ঘরটিতে। বিশ্রাম করে কল্যাণীদের নিয়ে মন্দিরে যেতে যেতে এক স্থানে 'প্রহ্লাদ চরিত্র' কথকতা হচ্ছে, কিছুক্ষণ শুনে সিদ্ধ বকুল দেখতে গেলুম। হরিদাস ঠাকুরের পর্ণকুটির ছিল এই বকুলগাছ তলায়। মোহান্তের সঙ্গে আলাপ হল—বড় ভালো লোক। কলকাতার একটি সুন্দরী মহিলাকে হঠাৎ 'মা' বলে ফেল্লুম, তাঁর ওপর এমন ভক্তি ও টান হয়ে গেল। সেখান থেকে মন্দিরে গিয়ে নৃসিংহদেবের মূর্তি দেখে উঁচু চাতালে গিয়ে বসি। হু হু হাওয়া বইচে। বিকালবেলা। ওরা বলচে বারাকপুর যাবো। আমি ও ভাবচি নতিডাঙার সেই জায়গাটির কথা—ঠিক এমনি বিকালে। ওখান থেকে বার হয়ে পাণ্ডা ঠাকুরের বাড়ি এসে বসি। মুচিপাড়া ফিরে আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে চা খেয়ে সমুদ্রের বালুতটে বসি। গজেনবাবুর ওখানে এসে আড্ডা ও গল্প, বীরেন রায় প্রভৃতি সবাই, অনেক রাত পর্যন্ত। গালুডির হরিপদ ডাক্তারের সঙ্গে বিকেলে আবার মন্দিরে দেখা।

১৬ই জুন, ১৯৪৩। ১লা আষাঢ়, ১৩৫০। বুধবার। (বারাকপুরে আজই ফিরে লিখচি)

সকালে রামকৃষ্ণ লাইব্রেরিতে 'দেবযান' পড়বার কথা। গজেনবাবুদের সঙ্গে বার হয়ে বীরেন রায়ের বাড়ি ও সেখান থেকে রমাভিলা গিয়ে কে এসেচে ডাকাডাকি করি। ১৯২৩ সালে রমাভিলাতে আসবার কথা। ১৯২৪ সালে নরেন এল পুরী, আমি গেলুম ভাগলপুরে। বিভূতি তখন ছোট, সেই রমাভিলাতে এতকাল পরে বসলুম। ওদের কথা মনে হল। কোথায় আজ সিদ্ধেশ্বর ও অক্ষয়বাবু !

লাইব্রেরিতে কালিদাস উৎসব হল ১লা আষাঢ়। কতদিন আগে বারাকপুর থাকতে খুকুকে বলতুম, 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'। বকুলতলায় বসে প্রিয়রঞ্জন সেনের দাদা কুমুদবাবু বক্তৃতা করলেন। ওখান থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরবার পথে রাধাকুমুদবাবুর গৃহপ্রবেশ হচ্চে সেখানে বসে আড্ডা দিই। বাড়ি এসে স্বামিজী দেখা করতে এল, গজেনবাবু এল, সুমথ ও বৃন্দাবন মল্লিক এবং বীরেন রায়। স্টেশনে এলুম। এর আগে চা খেয়েচি আনন্দ ভাণ্ডারে। রাণাঘাটের এক ভদ্রলোক, নাম দুর্গাচরণ সিংহি, হাজারি প্রামাণিককে চেনে। Second Class-এ কল্যাণী ও উমা, FirstClass-এ আমি, বৃন্দাবন মল্লিক ও অন্যান্য লোক এবং তুষারকান্তি ঘোষ সবসুদ্ধ খুরদা রোডে সভা করতে এলুম। ড. সরকারের বাড়িতে অতিথি। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। রাধাকুমুদ বাবু ও তুষারকান্তি ভূতের গল্প করলেন। বেশ সভা। আমি বক্তৃতা করতে উঠচি, সবাই হাত তালি দিলে। বক্তৃতান্তে 'ডিটেকটিভ' অভিনয় করলে ওরা। আবার ১লা আষাঢ় ও কালিদাসের গুণকীর্তন। যখন পুরী থেকে বেরিয়ে আসি পাণ্ডাটা এসে পয়সাকড়ি চুকিয়ে নিলে। অনেক ভাতডাল পড়ে রইল। খুব গরম। বাইরে শোয়া গেল।

বেশ পুরী দেখা হল। সমুদ্র বহুবার করে দেখেচি।

১৭ই জুন, ১৯৪৩। ২রা আষাঢ়, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার। খুরদা রোড—কটক—বালেশ্বর

স্নান সেরে ট্রেনে উঠি। বৃন্দাবনবাবু আগেই চলে গেল। রাধাকুমুদদা গেলেন পুরী সকালে। আমরা সারাদিন ট্রেনে ভুবনেশ্বরে নক্সভমিকার জঙ্গলের অদ্ভুত শোভা ও মনসা গাছ যেখানে সেখানে। কি সব ফুল ফুটেচে জঙ্গলে। কাঠজুড়ি ও মহানদী থেকে দূরের নীল শৈলমালার দৃশ্য ও মহানদীর তীরে কটক সহরের দৃশ্য অতি সুন্দর। বেলা তিনটে পর্যন্ত ঘুমুই। আজ লিখচি বাসায় শুয়ে বসে, কাল এই সময় বালেশ্বর। কয়েকটি টমি উঠল অমরদা রোডে। তাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। গান গাইলে মহাদেববাবু সারা রাস্তা। ওরাও গাইলে, বেটোফেন, মোৎসার্ট সম্বন্ধে আলোচনা হল। একজন গায় :— ? |Zizigi | Zizazig (?) Bang Bang. সারারাত ঘুম নেই। শঙ্কর মঠের সেই গোপালবিগ্রহের কথা মনে পড়ে। কল্যাণীকে মেচেদা স্টেশনে জল দিয়ে এলুম। খড়কপুর স্টেশনে ট্রেন এলে খাবার দিয়ে গেল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েচি।

১৮ই জুন, ১৯৪৩। ৩রা আষাঢ়, ১৩৫০। শুক্রবার। কলিকাতা—বারাকপুর

ভোর হল রামরাজাতলা। আমরা সোজা বাসে শেয়ালদা এলুম। কিছু জিনিসপত্র কিনে মিতের মেসে মিতের সঙ্গে গল্প করে আসি। কল্যাণীকে সেই দোকানে গিয়ে চা খাওয়াই। ট্রেনে যত আসি, ততই মনে হয় কোথায় পুরীর সমুদ্রতীর, সেই 'আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'—কোথায় পুরুষোত্তম মঠ, ভূপেন সান্ন্যালের বাড়ি—কোথায় গুমো—বনগাঁ। গরুর গাড়ি করে আসতে আসতে এই চালকী ওই পোলতা—অবশেষে বারাকপুরের পথে নামল। ফণি কাকা ঘুমুচ্চে, ডাকলুম—ও ফণি কাকা ! খুকু হাবু ছেলের দল ছুটে এল। ইছামতীতে স্নান করতে গেলুম উমা, কল্যাণী ও আমি। নয়নানন্দকর দৃশ্য বটে। আজই নেমেছি রামরাজাতলা, আজই বেলা দুটোতে ইছামতীতে স্নান করচি। বড় রোদ। কতক্ষণ ধরে স্নান করলুম এতকাল পরে। ইলিশমাছ কিনেছিলাম কল্যাণী ও আমি বৈঠকখানা বাজার থেকে। সেই মাছ রান্না হল—মাছ, ভাত, ঝোল। উপাদেয় রান্না রেঁধেচে কল্যাণী। খুব বৃষ্টি হল। খুকুরা ঝিনুক নিয়ে হৈ চৈ করচে।

১৯শে জুন, ১৯৪৩। ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৫০। শনিবার। পূর্ণিমা

আজ সকালে কিছুক্ষণ লিখেচি, হরিপদদা ও ইন্দু রায় [.] নলে নাপিত এল। হরিপদদার গাজার [গাঁজার] গাছ কেটেচে তুলসীর ভাই পাঁচু। তাই নিয়ে হরিপদদা মদ খেয়ে চেঁচামেচি করচে। ওদের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হল। উপেন জেনেও খেলে। স্নান করে আসবার পূর্বে আমি সুরেন রায় ও ফণি কাকার বাড়ি বসে তামাক খাই ও হরিপদদার কীর্তি শুনি। সে সাঁওতাল জন এনে কাঁটাল গাছ সব কেটে ফেলেচে পাঁচুদের ওপরে নাকি রাগ করে। স্নান করে এলুম। ঘাটে কেউ নেই, কূলে কূলে ভরা জল, শ্যামল বর্ষা, সতেজ গাছপালা সর্বত্র। কৃষ্ণনাম জপ করে হরিদাস ঠাকুর নাকি উদ্ধার হয়েছিলেন। এই উদ্ধার হওয়ার অর্থ আমি বুঝি না। নীল আকাশে রৌদ্র ঝলমল করচে, মাঠে যখন একটু বসেচি,

প্রজাপতির কি নর্তন বৃক্ষে বৃক্ষে। দুপুরে চৌকীতে শুয়ে আছি, পেনো এসে ডেকে নিয়ে গেল। হরিপদদাদের রান্নাঘরে কতকাল পরে গেলুম। গাছ কাটার মীমাংসাকরি কত কষ্ট করে। মদ খেয়েচে বেজায়। শুয়ে আছি কি সংক্রান্ত কথা হচ্চে। রোদ মিলিয়েকি সব নীরদ মেঘপুঞ্জ বাঁশ বনের মধ্যে উঠল। চালকী গেলুম ভীষণ বৃষ্টির পরে। সারাপথ কি চমৎকার বর্ষার মেঘের দৃশ্য ! মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্ন [অপরাহ্ণ], সবুজ গাছপালা। জাহ্নবীদের বাড়ি গিয়ে গল্প করি, দুধ খাই। দিদিদের বাড়ি বসে গল্প করি। জিতেনদা অত ভক্ত, আপনার বোনকে কিছু খরচ পাঠায় না। দিদি কত দুঃখ করতে লাগলেন। ক্ষান্ত কত দুঃখ করলে। সন্ধ্যার সময় বাড়ি চলে আসি। ফণি কাকার বাড়ি বসে তামাক খেয়ে চলে এলুম। জেলি এসেচে। বসে গল্প করে।

কল্যাণী রাত্রে কত আদর করে। আমার বুকে মাথা রেখে শোও মানকু। তুমি ঘুমিয়ে পড় সকাল সকাল, আমার সঙ্গে দুটো গল্প কর না।

২০শে জুন, ১৯৪৩। ৫ই আষাঢ়, ১৩৫০। রবিবার। বারাকপুর

সকালে উঠে কিছু লিখে ফণি কাকা ও সুরেন রায়ের বাড়ি গিয়ে বসি। তারপর ও-পাড়ার ঘাটে স্নান করি। অতি সুন্দর নদীজল—ভগবানের উপাসনা যেন এই শ্যামল বৃক্ষলতায় ও নদীজলে সম্পন্ন হয়। শুকরো বুড়োরে বল্লাম—তোমার সময় আসচে যে ! ও বল্লে, আমাদের জটেমারির কুঠীতে আমি কাজ করেচি বাবু, নীল বেচেচি। খুব মেঘ করে এল, কিন্তু বৃষ্টি হল না। মেঘলা বিকেলে গোপালনগর গিয়ে মল্লার ওখানে বসে আড্ডা দিই। হাট করি। রাত্রে কল্যাণী ও আমি ভগবানের সম্বন্ধে কত চর্চা করলুম। কেউ শুই না। জ্যোৎস্না উঠল মেঘ কেটে গেলে। অনেক রাত্রে তখন শুই। সীতানাথ কাকার কেমন প্রতিপত্তি ছিল, ইন্দু রায় বসে বসে গল্প করে ওর বাড়ি। ওর বাড়িতে এক মজুর ছিল, সে নাকি বাংলা মুলুকের সব জায়গা বেড়িয়েছিল— কোথায়, না বাহাদুরপুর— (গোয়াড়ির ওপারে। 'আর যাতি সাহস হল না')—বেশ গল্প।

২১শে জুন, ১৯৪৩। ৬ই আষাঢ়, ১৩৫০। সোমবার।

Last date of submitting university papers.

সকালে রোদ উঠেছিল, আজ বহুদিন পরে সকালে সুসার কাকাদের চারাবাগানে বেড়াতে গেলুম। আগে এখানে মাঠ যখন ছিল, তখন আসতুম—১৯০৩ সালের কথা। ১৯০৩, ১৯০৪, ১৯০৫ সালের—তিন বৎসরের কথা। আমার যা কিছু অমূল্য বাল্যস্মৃতি—তা এই তিন বৎসরের। মাছ ধরতে যেতুম হাবু, ফুচু, মংলা। বেলেডাঙার পুলের ডানপাশে কচুড়ি (কচুরি) পানা তুলেচে—সেখানেই বসি। ওপারে আমডাঙার খেজুর গাছ। জলি ধান চৌকী দিচ্চে, বাবুই পাখি তাড়াবার জন্যে কটাকট শব্দ করচে। মেঘাচ্ছন্ন বিকেল। বিশ্বরূপের এ এক অপূর্ব রূপ। যেদিকে চাই, সেদিকে অপরূপ সৌন্দর্য, এ জায়গা থেকে কিছুদিন অন্যত্র যাওয়া ভালো। পলতা ক্ষেতের নীচে নদীজলে স্নান করতে নামলুম বিকেলে। কালো জল, তীরে জলজ চোঁচড়া ঘাস ও টোকাপানা, কচুরীপানা, পাখি ডাকচে, মাছের ঝাঁক সাতার দিচ্চে। এসে ডাক্তারের বাড়ি চা খাই ও গিরীনদার সঙ্গে গল্প। ইন্দুর বাড়ি এসে গল্প করচি—খুব মেঘ উঠল পশ্চিমে।

২২শে জুন, ১৯৪৩। ৭ই আষাঢ়, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে নদীর ধারে বেড়িয়ে এসে লিখি। তারপর হরিপদদা ডাকতে পাঠালে, গঙ্গাহরির জমি নিয়ে সেই মামলার আপোষ মীমাংসা করবার জন্যে। তারপর স্নান করে আসি—মেঘলা বর্ষার দিন। থমকানো মেঘে আকাশ কালো, অথচ গরম নেই। দুপুরের পর পচা রায়কে নিয়ে মরগাঙে মাছ ধরতে গেলুম—সঙ্গে কেতো ও অন্তে—হরিপদদা'র দুই ছেলে। মরগাঙে মাছ ঠোকরাল না বলে মাঠের মধ্যে দিয়ে উঠে এসে বসলুম জটে মারির জোলের নীচে গাঙের ধারে। কত গল্প করে পচা রায়—এক বৃদ্ধ বাসে মেয়ে নিয়ে আসতে আসতে টায়ার ফেটে যাওয়ার দরুন বিপদে পড়েন। তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দিতেই মেয়ের সঙ্গে প্রস্তাব করেন—ইত্যাদি। সুন্দর অপরাহ্ন [অপরাহ্ণ],সবুজের মেলা, নির্মল জলা নদী—যেদিকে চাই বিশ্বরূপের অপরূপ সৌন্দর্যের বাণী। সারা বিশ্বভুবন জুড়ে কোথায় সে মহাশিল্পীর মহাপ্রতিভার অবস্থান খুঁজে না মিলবে ?তিনি সবখানে। সব জুড়ে তাঁর বিরাট প্রকাশ। সন্ধ্যায় ফিরে এসে চা খেয়েচি—ঠেস দেওয়ালে বসে, ঘোর বৃষ্টি এল। আজ অম্বুবাচী। ২ বাটি চিঁড়ে দিয়ে গেল পাগলা জেলের মা। সত্য আর ন'দি বসে গল্প করতে লাগল। ন'দির সঙ্গে নগেন খুড়োর বৌ কথা বলচে না, সত্যকে জায়গা দিচ্চে না—এই সব। খুব বৃষ্টি সারারাত ধরে।

২৩শে জুন, ১৯৪৩। ৮ই আষাঢ়, ১৩৫০। বুধবার।

শেষ রাত থেকে ঘোর বাদলা। ছাতি মাথায় দিয়ে জলের ওপর দিয়ে সকালে উঠে গাজিতলার মাঠে বেড়াতে যাই। ফিরচি ফণিকাকা বসে ঝন্টু (?)কামারের বাড়ি। তামাক খেয়ে বাড়ি এসে দেখি অন্ত ও হাবু পড়চে। সত্য ও তিনু এল। বৃষ্টি আরো ঘনতর হয়ে এল। সত্য ও তিনু নানা গল্প। চা খেয়ে বলাইকে বনগাঁ পাঠালুম সুরেনের কাছে চিঠি দিয়ে মতিকাকার মেয়ের Case সম্বন্ধে। স্নান করে কি তৃপ্তি টলটলে কূলে কূলে ভরা কালো নদীজলে—শ্বাস ডুবে আছে জলে। আজ অম্বুবাচী—জল বেড়েচে কত। কতকাল এসময়ে বারাকপুর থাকবার সৌভাগ্য ঘটেনি। ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ, তিনি আমায় তাঁর এই সৌন্দর্যভূমিতে এসময়ে সুস্থিরভাবে বাস করবার সুযোগ দিয়েচেন। চোখের ক্ষমতা আরো যেন বেড়েচে—অনেক দেখতে পাচ্ছি এখন। চোখ খুব খুলেচে—আগে যা দেখতুম তার চেয়েও দৃষ্টি উন্মুক্ত ও দূরপ্রসারী। সারা দুপুর লিখি ও Somerset Maugham-এর গল্প পড়ি। কল্যাণী চমৎকার পায়েস করেচে দুপুরে। ইন্দু রায়কে ডাকিয়ে খাওয়ালুম। হরিপদদার বাড়িতে লীলাদির ছেলে এসেচে, সেখানে দেখা করতে গেলুম ও জিতেন কামারের বাড়ি যাই চাউল কিনতে। অনুকূল জেলে বসে আছে কামারের দোকানে, হাতে দুটো মুচকুন্দ ফুল [—]বাল্যের সেই বড় গাছটার তলায় ও বসে। বল্লুম—দে দুটো। ছারপোকার ওষুধ। রাত্রে যতীন পরামাণিকের গাছের বিচার হল।

১৯৩৫ সালে আজও আমি বাড়ি। খুকু রোজ যায়। বলত—বসুন বসুন, ১১টার গাড়ি যাচ্চে—মানে রাত্রে।

২৪শে জুন, ১৯৪৩। ৯ই আষাঢ়, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

১৯৩৫ সালে আজ এখনো স্কুল খোলে নি। আগামীকাল বাগানগাঁ গিয়েছিলুম। সকালে বৃষ্টি। গাজিতলায় গিয়ে নদীতে নামতে পারিনে। মনখুড়োরা নদীর ধারে বেড়া দিয়ে আটকেচে। কত কষ্টে নামি জঙ্গল ঠেলে, তা আবার ঘাট নেই। মুখ ধুয়ে এসে লিখি রোয়াকে। বৃষ্টি পড়চে, ঠেস দেওয়ালে বসবার যো নেই। হরিপদ ডেকে পাঠালে ইন্দুদের বাড়ি। সজলের কাকা অর্থাৎ মতি কাকার মেয়ে খুকুকে বলার ছেলে কি বলেছিল, তাই নিয়ে মার দিয়েচে—সেই দায়ে আলোচনা। গৃহহীন কাকে বলে, আমি জানি ১৮ বছর ধরে। এখন এত কেন লাগে। স্নান করে এলুম মেঘলা নদীজলে। একটু শুয়ে আবার লিখি ও হাটে যাই, সঙ্গে হাবু, ফুচু, মংলা, সত্য। Circle officer-এর সঙ্গে কথা হল, সুধীরদা আলাপ করিয়ে দেন। দিব্যি মেঘলা বিকেলে সবুজ তৃণাস্তৃত প্রান্তর ও দারিঘাটার পুলের কাছের অদ্ভুত আকাশ ইন্দ্রনীল রংয়ের। শুকরো মুসলমান (নুটুর 'সয়া' অর্থাৎ বন্ধু) আজ লোক খাওয়ালে। ঝুমরার বাগানের কাছে দলে দলে মাল পাড়ার লোকে ভাত তরকারি গামছায় বেঁধে আসচে। বলে—বড় খেইয়েচে। গোস্ত আর ভোলার ছক্কা। নিবারণের পটলের ক্ষেতে সবুজের মেলার মধ্যে গিয়ে বসে ভগবানের কথা ভাবি। কৃষ্ণনাম জপ করে আনন্দ পাই। ১৯৩৫ সালের ডায়েরিতে লেখা আছে ঠিক আজ (?)তারিখে বা ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে—'অনন্তের অধিদেবতা' আছেন সর্বত্র। তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারি নে—যেদিকে চোখ যায়, সর্বত্র তিনি। God consciousness অনেকদিন জাগ্রত হয়েচে আমার। নদীজলে স্নান করতে নামি। সেই সাঁইবাবলাগাছটা রাঙা হয়েচে গোধুলির [গোধূলির] রোদে। ওবেলা কল্যাণী ও আমি নাইতে এসেছিলুম। পুরীর কাপড় কেচে, যত রাজ্যের ছাড়া কাপড়, আমার ঘাড়ে চাপিয়ে বলে—এগুলো নিয়ে চলো মান্‌কু। ওর মহাপ্রসাদের পত্র আজ এল মেচেদার নিকটবর্তী সেই গ্রাম থেকে। রাত্রে ইন্দু রায়েরবাড়ি গল্প—নুটুর চোখে ঘোড়ায় চাট্ মেরেছিল ছেলেবেলা, সে গল্প। ও বল্লে আমার মনে আছে মেজদা। কল্যাণী বলে—খুকুটা কোথায় গেল মান্‌কু ?

২৫শে জুন, ১৯৪৩। ১০ই আষাঢ়, ১৩৫০। শুক্রবার।

সকালে বেড়িয়ে এসে লিখচি, ইন্দু এল, টেবলু নাপিতকে ডেকে চুল কাটা হল। স্নান করে এলুম চুল কেটে এবং ভগবানের অসীম করুণার দান নদীজল ও শ্যামল গাছপালাকে প্রাণভরে উপভোগ করলুম। এসে লিখচি, গোপাল সাধু এসে জানালে মঙ্গলবারে মধুসূদন স্মৃতিসভায় আমায় সভাপতিত্ব করতে হবে। অনেকক্ষণ রইল। আমি খেয়ে বিশ্রাম করে ইন্দুর সঙ্গে বনগ্রাম গেলুম। বেশ ঠাণ্ডা ছিল, যদিও রোদ উঠেচে। সবুজ গাছপালা, পাখির ডাকের মধ্যে দিয়ে ইন্দুর মুখে বৌ-কথা-ক পাখির গল্প শুনতে শুনতে বনগাঁ যাই। প্রথমবার লাইব্রেরিতে পোস্ট কার্ড কিনে মৌচাক আপিসে পত্র দিই। স্কুলের মধ্যে দিয়ে হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে বলি এই সময় ১৯০৮ সালে আমি প্রথম স্কুলে ভর্তি হই। যতীনদাকে ডেকে মন্মথদার ওখানে আড্ডা। বন্ধুর ওখানে দেখি লালমোহন বসে। ফণিকাকা ও মধু বন্ধুর ওখানে যাচ্চে। গোপাল সাধুর লাইব্রেরি দেখাতে নিয়ে গেল। তারপর রওনা। পথে মিতে সঙ্গে। বল্লে, বারাকপুর গিয়েছিলুম, মিতেনী চা খাওয়ালে। কুচা গজা কিনি ভরতের দোকান থেকে। সন্ধ্যায় বাড়ি ইন্দুর বাড়ি বসে রাত্রে গল্প করি। চুঁচড়ার এক মেয়েকে সাপ জড়িয়ে নাকি দাঁড়িয়ে আছে—এসব শুনি। অন্ন (মনু রায়ের মেয়ে) এল টর্চ হাতে, তার আশীর্বাদ।

২৬শে জুন, ১৯৪৩। ১১ই আষাঢ়, ১৩৫০। শনিবার।

আজ স্নান করতে গিয়ে রোদে মাঠে বসেছি—আর বছরের মতো লাল ভেরেণ্ডা গাছে প্রজাপতিগুলো উড়ে বেড়াচ্চে, কল্যাণীকে ওদিক দিয়ে ঘাটে পাঠিয়ে দিয়েছি—হঠাৎ চোখ গেল কুঠীর মাঠের দিকে—কি অদ্ভুত নীল মেঘের শোভা ! গাছের মাথা, ঘাসবন এমন একটা অপরূপ শ্রী ধারণ করেচে প্রতিফলিত মেঘালোকে। অমন দৃশ্য কতকাল দেখিনি। চোখে জল এল, বিশ্বস্রষ্টার এ সৌন্দর্য কে দেখচে ?এ কি রূপ অপরূপ। কল্যাণীও দেখেচে—সে বলচে, বারাকপুর ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। এ সত্যি চমৎকার দেশ। কালো মেঘের ছায়া পড়েচে ইছামতীর জলে। সাধনের ছেলে পাঁচু, কল্যাণী, মংলা ও আমি একসঙ্গে নাইচি। বাড়ি আসতেই ভন্নাবৃষ্টি। এত টন জল ঐ মেঘে কিভাবে ছিল, ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাচ্চে—কি সৌন্দর্যজ্ঞান ও wisdom সেই স্রষ্টার। বাড়ি আসতেই বৃষ্টি এল—বসে বসে লিখি। ফণিকাকার বৌ একফালি কাঁটাল নিয়ে এল। আরো অনেক ছেলেমেয়ে এসে সারা দুপুর চেঁচামেচি ও আড্ডা দিলে। বিকেলে সুরেন রায়ের বাড়ি বসে ওর জামাইয়ের সঙ্গে গল্প। চালকীর মাঠ পর্যন্ত বেড়াতে গেলুম মেঘাচ্ছন্ন বর্ষাসন্ধ্যায়। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়চে। মাকাললতার পাতা ঘন সবুজ দেখাচ্চে। গাজিতলার বাঁকে নদীতীরে উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ করে ঈশ্বরের উপাসনা করি। ছুটতে ছুটতে ফণিকাকার বাড়ি। ব্যায়াম হল। ওবেলা বলাই কাঁটাল কেটেছিল বলে ফণিকাকা গাছে উঠে কাঁটাল কাটলে আমায় সাক্ষী করে। বলাই এল সন্ধ্যায় কাগজ দেখাতে। কল্যাণীকে খুব বকলাম—কিন্তু ও আবার রাত্রে কত গল্প। ঊষার চিঠি এল লাহোর থেকে।

২৭শে জুন, ১৯৪৩। ১২ই আষাঢ়, ১৩৫০। রবিবার। বারাকপুর

সকালে নদীতে মুখ ধুয়ে বসে লিখি। তারপর ইন্দু কাল কলকাতা থেকে এসেছে শুনেসেখানে গিয়ে বসেছিলুম। কল্যাণীকে নিয়ে স্নান করতে গিয়ে ও বল্লে, বরোজ পোতায় বাঁশের কেঁড় চাপা দিতে হবে। বাবার মৃত্যুর দিন যে বাঁশঝাড়টায় বসেছিলুম, সেটা ওকে দেখাব। নদীতে স্নান করে বড় তৃপ্তি—আজ নীল আকাশ, খুব রোদ। হাবু, মংলা, সত্য সব একসঙ্গে স্নান। বিকেলে হাটে গেলুম, ঊষাকে চিঠি লিখি বহুদিন পরে। মল্লার ওখানে বসে গল্প করি, চা খাই। সন্ধ্যায় এসে কল্যাণীকে নিয়ে যখন ঘাটে গা ধুতে গেলুম—সেই চরম অনুভূতির অবস্থা। আকাশে নক্ষত্র উঠেচে, জঙ্গল শান্ত, নির্জন। অপূর্ব অন্ধকার নেমে আসচে। প্রজাপতি উড়চে দেখলে আনন্দ হয়। দু-চারটি নক্ষত্র দেখে কি আনন্দ। বাড়ি এলুম টর্চ জ্বেলে—কারণ অন্ধকার হয়েচে অত্যন্ত বাঁশতলায়। পচা রায়ের বাড়ি গিয়ে শুনি সে মনু রায়ের মেয়ের আশীর্বাদে গিয়েচে সুরেন রায়ের বাড়ি। অথচ আমাকে বলেনি।

২৮শে জুন, ১৯৪৩। ১৩ই আষাঢ়, ১৩৫০। সোমবার।

সকালে আমি লিখি। উমা ও কল্যাণী নেয়ে এল। ছেলেরা এল—মাইকেলের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান করতে বল্লুম। 'স্বামী শিষ্য সংবাদ' পড়ি বিবেকানন্দের। দেবসাহিত্য কুটিরের গল্প লিখি। বিবেকানন্দ বলেচেন, "একটা জিনিস খুব আগ্রহ নিয়ে করচে দেখলে ভগবানের কৃপা হয়, পরের জন্যে খাটলে শরীরে সিংহের বল আসে। [.] এসব বড় সত্য কথা। দুপুরে বলার বাড়ি আমীন এল, বনগ্রামের ক্লাসফ্রেন্ড সদার দাদা। সেখানে বহু লোক উপস্থিত। ঝগড়া বিবাদ ছাড়া এ গ্রামে কিছু নেই। মালসী বলে এক কাঁটাল গাছ নিয়ে ঝগড়া। ফকির, অমূল্য, ইন্দু, মদন সব উপস্থিত। মাছ ছেঁকে [তোলা] হল। বহুকাল পরে বলা বোস্টমের বাতাবী লেবুতলায় গেলুম। কতকাল যাইনি। কেন বা যাবো ?বোধ হয় ১৯১৬/১৭ সালের পর কিংবা তার আগেও যাইনি।

তারপর গোপালনগর স্কুলের সব ছাত্র এসে হাজির। বহু ছাত্র। মাস্টারেরা এল—ননী, দত্ত, সুদর্শন ও পণ্ডিত মহাশয়। চড়কতলায় মধুস্মৃতি উৎসব হল—যা কখনো বারাকপুরে হয়নি। সত্য, বুলু, প্রমোদ ও শিবু—খুব খেটেচে। ভগবান ওদের মঙ্গল করুন। গান গাইলে বুলু ও গোপালনগরের নিতাই। আবৃত্তি করলে সত্য বুলু ইত্যাদি। শেষে 'বন্দেমাতরম' গান হল। সভান্তে ওদের সব চা খাওয়ানো হল—চলে গেল মাস্টারেরা। ইন্দুর বাড়ি বসে ফণিকাকা ও আমি গল্প করি। ঠেস দেওয়ালে বসে কল্যাণী নানারকম কবিতা আবৃত্তি করে অনেক রাত পর্যন্ত। অনেক কবিতা জানে। রাত দুটো পর্যন্ত জেগে কবিতা আবৃত্তি করা গেল।

২৯শে জুন, ১৯৪৩। ১৪ই আষাঢ়, ১৩৫০।মঙ্গলবার।

সকালে উঠে লেখা শেষ করে স্নান করে আসি। বনগাঁয়ে যাবো বলে সকালে সকালে (তাও ১২টার কম নয়) খেয়ে একটু ঘুমিয়েছি। সত্য, বুলু, শিবু ওরা নৌকো ঠিক করে এল। ঘুমিয়ে উঠে তামাক খাচ্চি—তিনু ও ইতু এল, ওরাও বনগাঁ যাবে। তিনু ছাতা সেলাই করতে লাগল। এমন সময় মেঘ জমে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি [।] দুদিন থেকে আজ রোদ ও গরম ছিল। বেশ

গুমোট হচ্চিল দুপুরে। কল্যাণী ও আমি একটা চেলা মাছ ধরেছিলাম সকালে নদীতে গিয়ে, সেটা ভেজে খাওয়া গেল। যাহোক, এদিকে তো ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি সুরু হল—কোথায় বা নৌকো, কোথায় বা কি ! বৃষ্টি থামল ৪টার সময়। তখনো টিপ টিপ চলেচে। বনগাঁয়ে যাবো না ধার্য করলুম এমন সময়ে সাইকেলে করে এক ছোকরা এসে নাছোড়বান্দা। বলে—সভা wait করচে আপনার জন্যে। যেতেই হবে। তখন ৬॥টা। ৫টায় সভা announce করা হয়েচে। যাহোক নলে নাপ্তির গাড়িতে তখনি সত্য, বুলু, রওনা। রাত ৮॥ টার সময়ে গিয়ে পৌঁছেছি। ভোলানাথবাবু আমায় বসিয়ে সরে এক পাশে বসলেন। বক্তৃতা দিয়ে তখনই আবার উঠি গাড়িতে। তিনু এল ভীষণ বকতে বকতে।

৩০শে জুন, ১৯৪৩। ১৫ই আষাঢ়, ১৩৫০। বুধবার।

এই বর্ষার শ্যামল নদীতীর, এই মাকাললতার কচি তনু, উড়ন্ত প্রজাপতি ফণিকাকার বাড়িবসে তামাক খেয়ে বোয়া ধানের জমি কেনার কথা আলোচনা—এসব ১৯০৯ সাল থেকে আর হয় নি। সেই থেকে আজ ৩৫ বছর কেন সারাজীবনই—কেননা ১৯০৯ সালের পর জীবনে জ্ঞান হয়ে হয় তো অতি সামান্য দিনই এ ভোগ করেচি—তখন জ্ঞান হয় নি, কত ছোট তখন আমি। এবার আর আর বছর—এই দুবছর ধরে ১২ই আষাঢ় এর পরে এসব ভোগ করচি। ভগবানকে ধন্যবাদ এজন্যে।

দুপুরে স্নান করে মৌচাকের জন্যে 'বনে পাহাড়ে' লিখি। একটু ঘুমিয়ে উঠেচি, ভীষণ বৃষ্টি এল। কি কালো মেঘের শোভা ! কল্যাণী ঘুমুচ্ছিল, ওকে ওঠালুম, দেখ মেঘের কি শোভা। ফণিকাকা জমি কেনার কথা বলেছিল চালকীতে। বিকেলে ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নামল। ২ ঘণ্টা বৃষ্টি হওয়ার পরে সামান্য একটু থেমে গেল। ফণিকাকার বাড়ি গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত রইলাম জমির জন্যে। ওরা কেবল বিঘে, বাঁশুই, বাওড়া চাষ—এই সব কথাই বলে। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে বসে ওর গরু কিনে আনার কথা শুনি। গঙ্গা পারে গিয়ে যামিনী সা বলে একটা জায়গা দিয়েছিল, ওরা ছিল—সে কথা। রাত্রে কল্যাণীকে বকি কেরোসিন তেলের জন্যে। সে কাঁদে অনেকক্ষণ ধরে। তারপরই মান্‌কু বলেকাছে ঘেঁষে আসে। ওর মন গঙ্গাজলে ধোয়া।

১লা জুলাই, ১৯৪৩। ১৬ই আষাঢ়, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে গল্পটি লিখে শেষ করি, ইন্দুর বাড়ি বসে গল্প করি। হাটে গেলুম না। কল্যাণীকে নিয়ে কুঠীর নদীর ধারে বসে রইলুম বিকেলে। মেঘ থমকানো আকাশের নীচে সবুজ ধরণী, পাখির গান। ভগবানের স্তোত্র আবৃত্তি করলুম। কুঠী দিয়ে চলে এসে জলে নামি। কি চমৎকার আকাশ। সেই সাঁইবাবলা গাছটার ডালে ডালে ফাঁকে রাঙা গোধুলির [গোধূলির] আলো। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে বসে গল্প করি—ধানের জমি সম্বন্ধে জিতেন কামারকে বলি। চালকীতে জমি। সকাল সকাল খেয়ে শুই।

২রা জুলাই, ১৯৪৩। ১৭ই আষাঢ়, ১৩৫০। শুক্রবার। কলিকাতা

ভোরে উঠে স্টেশন। কবিরাজ আমার সঙ্গে গেল। কলিকাতা পৌঁছে প্রথমেই সেই উৎপলেন্দুর সঙ্গে দেখা। থিয়েটারি উৎপলেন্দু। পরপর কুশল প্রশ্নাদি হল, আমি দেবসাহিত্য কুটিরে গল্প দিয়ে অপূর্ববাবুর বাড়ি। দেখা পেলুম না। বুদ্ধদেবের বাড়িতে বসে আড্ডা দিই। এলুম। M.C. ও মিত্র ও ঘোষ। তারপর গিরীনের দোকান। সেখানে বসে খাচ্চি, প্রবোধ সান্ন্যাল এল। গোপালনগরের কবিরাজ মশাই খাচ্চে—সে তার ছেলের জন্যে ঘুঁটে বয়ে এনেচে গোপালনগর থেকে। আবার M.C.। অপূর্ববাবু সঙ্গে নিয়ে অমিয় ব্যানার্জির দোকানে গেল। কলকাতার মদ ও বেশ্যা সংক্রান্ত এমন কতগুলি গল্প বল্লে, যে সত্যই মনে হল কলকাতা নরককুণ্ড। জলের ধারে বসে ভগবানের নামজপ করি। বাসে বালিগঞ্জ। নীরদবাবু বসে দাদাশ্বশুরের ও মায়াদির সঙ্গে গল্প করচে। কতক্ষণ বসে দুজনে বাইরে গল্প। নীরদবাবুকে পৌঁছে দিলুম। ভগবানের অনুভূতির কথা বলি। উনি মিসেস চৌধুরী বলে একটি মহিলার বাড়ি চলে গেলেন। অনীতা এসে গল্প দেখালে রাত্রে।অনীতাকে ওর গান শোনাতে বল্লুম।

৩রা জুলাই, ১৯৪৩। ১৮ই আষাঢ়, ১৩৫০। শনিবার।

সকালে চা খেয়ে বালিগঞ্জ থেকে বেরিয়ে অপূর্ববাবুর বাড়ি। সে নির্মলার গল্প করলে। নৃপেন ঘোড়দৌড়ের জুয়ো খেলে গল্প করলে। হেমেন রায়ও। গিরিনের ওখানে টাকা নিয়ে পাঁচীর বাড়ি। হরিপদ, পঞ্চার মা ও পাঁচী খেতে বসেচে—এই ট্রেনে বনগাঁ যাবে। ওখান থেকে নীচে এসে সাতুকাকার সঙ্গে গল্প করি। D.M.-এ বসে অনেকক্ষণ গল্প, চা, মামলেট্ আনালে। ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস এল, বল্লুম, তোমার বইগুলো দেখিয়ে নিয়ো। ওখান থেকে মিত্র ও ঘোষ ও

M.C. ।অমিয় ব্যানার্জির বই revise করতে দিলে। অপূর্ববাবু খাওয়ালে পুঁটীরামে। দুজনে কলেজ স্ট্রীটে বাজার করি। আমি বাসে বুদ্ধদেবের বাড়িতে এসে পরোটা খাই। বরেন ঘোষাল এল বই নেবে বলে। শেয়ালদতে এসে দেখি ৯-২৫এ গাড়ি। ভীষণ গরম। ট্রেনে কৃষ্ণের নাম করতে করতে খুব জমে গেল। রাণাঘাট এল রাত ১২টা। নরেনদার শালা পেছন থেকে বল্লে—ও বিভূতিদা ![?]বসিয়ে খিনুদের বাড়ি। রাত ১০॥ টা পর্যন্ত খিনুর সাথে গল্প। খিনু নীচের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩। ১৯শে আষাঢ়, ১৩৫০ ।রবিবার।

ট্রেনে ইন্টার ক্লাসে আমি ও নরেনদার শালা বেশ ঘুমাই। ভোর পর্যন্ত। গোপালনগরে নেমে ঘোড়ার গাড়ি করে বাজার পর্যন্ত। বাড়ি আসতেই সত্য ও হাবু, ফুচু এল। এখানে বর্ষাদিনের সজল ঠাণ্ডা দিন। ইন্দুর বাড়ি গল্প করে নদীতে নেয়ে এসে বড় তৃপ্তি। দুপুরে খেয়ে ঘুমুই। হাটে যাই, মল্ল মাস্টারের ওখানে গল্প করচি, বৃদ্ধ সুরেন রায় বলে গেল, আজ ছেলের পক্ষ থেকে আপনাকেআশীর্বাদ করতে যেতে হবে। ফণিকাকা, রাখাল মাস্টারের শালা, হাবু, ফুচু—নলে নাপিত—একসঙ্গে হাট থেকে ফিরি। কালো মেঘের কি শোভা। বৃষ্টি মাথায় কল্যাণীকে নিয়ে নদীজলে নামলুম। অপূর্ব শোভা। কালো মেঘ উড়ে আসচে। দুজনে ভগবানের উপাসনা স্তোত্র 'তুমি অগ্নিতে তুমি জলেতে,' গান গাই একবুক জলে দাঁড়িয়ে। এমন সময়ে পাকা রাস্তার গাছের সারি বা চটকাতলার চটকাগাছটার দিক থেকে ঘন কালো মেঘ উড়ে এল—সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি এল। সেই বৃষ্টি মাথায় নির্জন পথ দিয়ে দুজনে আষাঢ় সন্ধ্যায় বাড়ি এসে লক্ষ্মী, বাবার পুঁথি ও মায়ের কড়া প্রণাম করি।

৫ই জুলাই, ১৯৪৩। ২০শে আষাঢ়, ১৩৫০। সোমবার।

সকালে ইন্দু রায় এসে গল্প করলে ও বক্তা কেষ্ট। নদীতে যখন স্নান করি, তখন দিব্যি নীল আকাশ। চকচকে সবুজ গাছপালা। সেই লাল ভেরেন্ডা গাছে প্রজাপতি উড়চে। কিন্তু আর বছরের চেয়ে জ্ঞান বেড়েচে এ বছর। গত বৎসরেও ঈশ্বর, পরলোক, জ্ঞান, মৃত্যুর অসত্যতা প্রভৃতি সন্দেহের বস্তু ছিল—গত জানুয়ারি মাসে ঘাটশিলায় Stainton Moses-এর spirit teachings পড়ে ক'মাসের মধ্যে আমার সে অবিশ্বাস চলে গেছে। হরিপদদার বাড়ি দুপুরে আশু ঠাকুর কাঁঠাল কিনতে এল—পল্লীমঙ্গল সমিতির তেল কেন অন্যত্র বেচা হয়, তাই নিয়ে ঝগড়া। ঝম্‌ঝম্ জল ও হু হু ঝড় উঠল, গুমট হচ্চিল, কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল।

বিকেলে থমকা কালো মেঘ মাথায় নলে নাপিতের বাড়ির পাশের পথ দিয়ে বাঁওড়ের ধারের রাস্তা দিয়ে নতিডাঙার বটগাছ ছাড়িয়ে চলে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি—এক চাষার মেয়ে আমায় দেখে ভয় পেয়ে ধানখেতের কার কাছে জিজ্ঞেস করচে শুনি—উনি কেডা ?কি বর্ষার বিকেলের রূপ দেখলুম আজ ! তুলনা হয় না। এই সবুজ ঘন আউশ ধানের জাওলার দূর প্রান্তে কৃষ্ণমেঘসজ্জা, খেজুর গাছের মাথা, বাঁশবনের মাথা—এত কালো মেঘ চক্রবালে, আকাশের সর্বত্র—আর এত গাঢ় মরকত শ্যাম প্রান্তর নীচে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কোন্ মহাশিল্পীর হাতের রচনা এ ?কিন্তু এ দেখচে ক'জন ?আজ কি অপূর্ব প্রেরণা পেলুম এ থেকে ! ফণিকাকার বাড়ি হয়ে ইন্দুর বাড়ি গল্প করি। জমি [লাইনটি অসমাপ্ত]।

৬ই জুলাই, ১৯৪৩। ২১শে আষাঢ়, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

যুগল কাকার বাগানে অর্থাৎ ১৯০৭ সালের নিতান্ত শৈশবে যেখানে বেড়াতে যেতুম—সেখানে আজও গেলুম। লিখতে বসতেই ইন্দু রায় এসে গল্প করলে, নকপুলের গোটাকতক ছেলে এল। স্নান করে এলুম কল্যাণীর সঙ্গে। বড় সুন্দর মেঘের ছায়া ওপারে— সবুজ উলু খেত নীচে। স্নান সেরে খেয়ে একটু বিশ্রাম করি। পঞ্চা জেলে অনেকগুলো পেয়ারা নিয়ে এলদিতে। আধখানা কাঁটাল দিয়ে গেল ফণি চক্কত্তির মেয়ে। আমি বসে লিখচি, কচার বৌ ও মেয়ে জুজু এল [—] কল্যাণীর সঙ্গে গল্প করে ওরা মীনাদের বাড়ি গেল [।] (উমারা বলে মীনাদের বাড়ি। আমরা বলতুম নারাণদা'র বাড়ি [।] জ্যাঠামশায় বলতেন, কালীপ্রসন্নের বাড়ি)। আমি আর কল্যাণী গেলুম বৃন্দাবনদের বাড়ির পাশে অমূল্য মুহুরির বাড়ি। এদেশের চাষাদের বাড়ি যেমন ধরণে—অবিকল ওই। বাঁওড়ের ধারে এই সব অঞ্চলে, এই নিতাই জেলেদের বাড়ি বহুকাল আগে একবার এসেছিলুম কিনা আমার মনে নেই। যদিও এসে থাকি, তখন আমার বয়স ৮/৯ বছর। বাঁওড়ের ঘাটে নামলুম। কল্যাণী বলচে, এ যেন বামিয়াবুরু ফরেস্ট ! সত্যিই বটে। সন্ধ্যার আগে চলে এলুম—বৃন্দাবনদের বাড়ি গেল কল্যাণী ও লালমোহনের বাড়ি। বটতলার পথটা দিয়ে একদিন সব বেড়াতে হবে।

ইন্দুর বাড়ি রাত্রে বসে কি ভাবে ও প্রথমে গোপালদাস রায়ের বাড়ি কোলা বলরামপুর গ্রামে গেল—সেখানে কি ভাবে ওকে receive করলে, সেখান থেকে নগর চাপরালি কি ভাবে গেল—এই সব গল্প করলে। ভগবানের কথা যে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে সেই বন্ধু।

৭ই জুলাই, ১৯৪৩। ২২শে আষাঢ়, ১৩৫০। বুধবার।

শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে শুনচি ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি নামল। আমার বড় আনন্দ হয় বৃষ্টি নামলে। ভোর হল বৃষ্টির বিরাম নেই—শ্যামাচরণদাদের চিন্তের বাড়ির বাগানে ছাতি মাথায় বৃষ্টির মধ্যে পাতা খুঁজতে গেলাম। লিখি বাইরে টেবিল বার করে। বোস্টম মাসি দেরি করে এল বলে কল্যাণীর সঙ্গে ঝগড়া করি। 'দেবযান'-এ যতীন আশার অধ্যায়ে আশা প্রহার খেল নেত্যর কাছে, সেই অধ্যায় লিখি। গাঙে দুধঘোলা এসেচে নাইতে গিয়ে দেখি। বেলা গেলে খাই। একটু একটু রোদ উঠেচে। জমি নাকি আমার হবে না শুনচি। সারা বিকেল লিখে ফণি কাকার বাড়ি গিয়ে দেখি ফণিবাবু বসে—রাখাল মাস্টারের সম্বন্ধি [সম্বন্ধী]। ওরই french cut দাড়ি ছিল, তুঁততলার স্কুলে আমাদের পড়াতেন। বেলা গিয়েচে দেখে তামাক খেয়ে উঠে টেবলু নাপিতের বাড়ির ওপর দিয়ে বাঁওড়ের ধারের রাস্তা দিয়ে কুঠীর মাঠে গিয়ে ব্যায়াম করি, দৌড়াই। তারপর সেই অপূর্ব নীল রংয়ের আকাশ ও বিচিত্র আকৃতিবিশিষ্ট বর্ষাক্ষান্ত আষাঢ় অপরাহ্নের অপরূপ মেঘমালা, সবুজ বৃক্ষলতার পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে বিশ্বরূপ সম্বন্ধে কত কথাই ভাবলুম। যখন চলে আসি—সূর্যাস্তের রং এ বেলেডাঙার দিকে একটুকরো আকাশ কি ইন্দ্রজাল তৈরি করেছে। ধূসর বর্ণের যেন একটা পাহাড়, তার চারিপাশে পাটকিলে রং-এর সমুদ্রতট, তটে কালো নারিকেলকুঞ্জ—দূর সেই সমুদ্রতট বেয়ে নবীন কিশোররূপী শ্রীকৃষ্ণ যেন আসচেন...আসচেন...গলায় বনমালা...জগৎজোড়া বনফুলের সুবাস চুলে...একা...একা। এ সবের তোরণদ্বারস্বরূপ আমার সামনে কি একটা ঝোপ—তাতে একটা ফিঙে পাখি বসে আছে। আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলুম—বিশ্বরূপ ! বিশ্বরূপ ! মহাশিল্পী তুমি। শত ধন্যবাদ। রাত্রে ফণিকাকার চণ্ডীমণ্ডপে জমি কেনার কথা। রজনী মণ্ডল, জিতেন কামার—সব উপস্থিত।

৮ই জুলাই, ১৯৪৩। ২৩শে আষাঢ়, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

অতি সুন্দর আলো আজ, ঠিক যেন রাঙা শরতের রোদ। ইন্দু এল সকালে—আমি আজ Spirit teachings পড়চি মহা আনন্দে। ও এসে চলে গেল—আমি 'দেবযান'-এ যতীনের নবজন্ম বৃত্তান্ত লিখে ইন্দুদের বাড়ি যাই। দুপুরে স্নান করতে যাই কল্যাণীকে নিয়ে—ফণিকাকাদের

ভুঁইয়ে যখন দুজনে বসেছি—তখন একটা তেঁতুলগাছে ছোট গোয়ালেলতার কি শোভা। অপূর্ব সুনীল আকাশের পটভূমিতে ঘন সবুজ বনঝোপ, মটরলতা, ঢোলকলমী কি চমৎকার ইন্দ্রজালময় দেখাচ্চে। ভগবানের উপাসনা জলে নেমে করি দুজনেই স্নানান্তে। দুপুরে কিশোর বোষ্টমীর মেয়েটা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে এল—মধু আমার চাল কেড়ে নিয়েচে, বলেচে আমার চাবিদে—আমি কিছু খাইনি, কোলের ছেলেটা কিছু খাইনি [খায়নি]। আমার চালগুলো কেড়ে রেখে দিয়েচে—ভিক্ষে করে আধসের আড়াইপোয়া চাল পেয়েলাম, ফুটিয়ে খেতাম। তাকে /০ আনা দিই, মধুকে ডেকে চাল ফেরত দেওয়াই। সেই উপলক্ষে বাড়িতে হাবু, ফচু, হর প্রভৃতি ছেলেপিলের ভিড় হয়ে গেল। তখন হাটে গেলুম। হাট করে বাড়ি এসে হরর সঙ্গে নৌকাতে মাধবপুরের চর ওপারে। মাঠের মধ্যে বসি—বসবার অসুবিধা—সব বেড়া দেওয়া জমি, কাঁটা দিয়েচে। নিমগাছের ডাল ভেঙে (দাঁতনের জন্যে) সন্ধ্যার কিছু আগে ঘাটে ফিরি ও স্নান করে ইন্দুর বাড়ি গিয়ে বসি। ফণিকাকা এল, জমি সংক্রান্ত কথা হল। রাত্রেও বেশ জ্যোৎস্না ছিল।

আজ মি. সিনহা ও সুবোধ ঘোষের পত্র এল চাঁইবাসা থেকে—সত্যশরণের সঙ্গে মায়াদির বিয়ের সম্বন্ধে। সিনহা লিখেচে—আপনি না থাকলে ঘাটশিলা is a desert...শিগগির আসুন।

৯ই জুলাই, ১৯৪৩। ২৪শে আষাঢ়, ১৩৫০। শুক্রবার।

সকালে উঠে 'দেবযান' লিখি—যতীনের পুনর্জন্ম অধ্যায়। লিখে উঠে ফণিকাকা ও ইন্দুরামের বাড়ি। জমি আমাকে দেবে কিনা জিগ্যেস করি ! দশ টাকা বেশি দিতে রাজি। স্নান করে এলুম কল্যাণী ও আমি। নীল আকাশ। ঝলমলে রোদ। সবুজ পাতাঝোপ চকচক করচে—রোদ পড়ে। নাইছিল বিষ্ণু নাপিতের বৌ ও পেঙী। সরলা, পেঙী ওরা দুটি বোন। স্নান সেরে এসে খাই। তখুনি সিংহ ও সুবোধকে চিঠি লিখতে বসি। খাওয়া শেষ করেচি বিশু এসে ডাকলে, বাবা জামা পরেচেন আপনিও চলুন। দুজনে দিব্যি ঝোপলতা, ধানেভরা মাঠের মধ্যে দিয়ে পথ চলি। একটু আগে এক পসলা বৃষ্টি

হয়েছিল, বাতাস সজল। পাকা রাস্তায় উঠে দুজনে গল্প করতে করতে নীল আকাশের দিকে চোখ রেখে চলচি। এই বনগাঁয়ে এমনি সময়ে আমি ধানের জাওলার মধ্যে দিয়ে গিয়ে ১৯১০ সালের জুলাই মাসে 6th Class-এ ভর্তি হই। তখন আমার বয়েস ঠিক ১১।। বছর। যাক, সে খুব পুরোনো কথা। কিন্তু কতকাল পরে আবার সেই শৈশবের আকাশ, শৈশবের সেই মধুর অনুভূতি ভরা বাতাস এই সূর্যালোকিত দিবসের পটভূমিরূপে দেখতে পাচ্চি। সে বালক আজ আমার মধ্যেই আছে—তার অঙ্কুরিত চেতনা বিকশিত হয়েচে মাত্র। আমিই সেই সেদিনের বালক।

মনোজবাবুর সঙ্গে সুমথের বিবাহের কথা বলে মিতের বাড়ি হয়ে মন্মথদার ওখানে আড্ডা। যতীনদা এল। তার পর বাজার হয়ে খাবার কিনে বেশ শান্ত বর্ষার বিকেলে জাহ্নবীর বাসা দেখতে ইন্দুর সঙ্গে বাড়ি। জাহ্নবীর বাসায় যেন আজ শনিবার এলুম, যেন তালের বড়া ভাজবে জাহ্নবী, আমি বাজার করে নিয়ে যাচ্চি, ঘি ময়দা কিনেচি পুরোনো দিনের মতো। ওই রোয়াকে উঠে বলবো, উমা—ঘি রাখ। আমি যাই বেড়িয়ে আসি।...এও একটি স্বপ্ন ! খুকুদের বাড়ি, খুকুই বা কোথায় ?সন্ধ্যার পরে জ্যোৎস্না উঠল [।] আমরা গাজিতলার পথে নামলুম।

১০ই জুলাই, ১৯৪৩। ২৫শে আষাঢ়, ১৩৫০। শনিবার।

সকালে 'দেবযান' লিখে বাঁওড়ের ধারের পথ দিয়ে বেড়াতে গেলুম এই দু-বছরের মধ্যে বা চার বছরের মধ্যে প্রথম। সেই বিটপিসারি, সেই বন্যবিহঙ্গতান সবুজ গাছপালা। একটা অশথ গাছ ঝড়ে উল্টে গিয়েচে—তার ওপর উঠে বসি। তারপর খেলার মাঠে সবুজ ঘাসের ওপর কতক্ষণ বসে বসে বিশ্বরূপের বৈচিত্র্য চিন্তা করি। ১৯৩৮ সালের বড় ডায়েরিতে দেখছিলুম এই গাছপালা ও মাটির সাহচর্যের জন্যে মনটা আমার তৃপ্ত ছিল। সেই সাহচর্য এতদিন পরে মিলল। নদীতে স্নান করে ফিরি।

তারপর আর কোথাও বেরুইনি—কেবল উঠেছিলুম একটা মাঠ [?]পেয়ারাগাছের তলায় ঘাসের ওপর বসে কি চমৎকার লাগল ! একটা তেলাকুচো লতার সাদা ফুল দেখে ভগবানের কথা মনে পড়ে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত লিখি। ইন্দু রায়ের বাড়ি বসে গল্প। নুটু নাকি ছুটি পেলে না—চিঠি লিখেচে গুটকে।

১১ই জুলাই, ১৯৪৩। ২৬শে আষাঢ়, ১৩৫০। রবিবার।

প্রতিদিন ভোরে নদীর ঘাটে হাতমুখ ধুয়ে নির্মল প্রভাতের বায়ু সেবন করতে করতে ওপারের ঘন সবুজ উলুখড়ের মাঠ, খেজুর গাছ, শিমুলচারা, নীল আকাশের দিকে চেয়ে সেই দেবতাকে ধন্যবাদ দিই, যাঁর হাতের অপূর্ব শিল্প এই সব। তারপর বাড়ি এসে ইন্দু তিনু রোজ যেমন আসে তেমনি গল্প করে চা খায়। ফণি এসে বই পড়ে শোনায় ও কবিতা। সজল বাদলের হাওয়া, বৃষ্টি এল। লিখি 'দেবযান'। স্নান করি না।

বিকেলে খুব বৃষ্টি [।] এক পসলার পরে হাটে গেলুম। মাস্টারেরা খেয়ে ফিরচে বীরেশ্বর গুইয়ে [র] ছেলের বিয়েতে। হাট করে মল্ল মাস্টারের বাড়ি চা খেয়ে গল্প করি। সত্য, ফুচু, মুংলা ও আমি একসঙ্গে আসি। সন্ধ্যা হয়েচে। কল্যাণীকে নিয়ে ঘাটে। চাঁদের আলো জলে চিকচিক করচে। জোনাকি জ্বলচে অন্ধকার বনে ঝোপে। আকাশে দু'দশটি তারা। নেয়ে এসে দেখি গোপাল একটা হেঁড়ে তাল এনেচে, তিনু ও সত্য বসে রোয়াকে গল্প করচে। এ প্রান্তে ন'দি বসে আছে। আমি বীরেন রায়ের মুখে শোনা শঙ্খচূড় সাপের গল্প করি। বেশ জ্যোৎস্না উঠে বিলবিলের জলে। সুপুরি গাছে, বকুল গাছে পড়েচে—যেন শরতের জ্যোৎস্না। জিতেন কামারের বাড়ি গিয়ে জমির কথা বলি ফণি কাকা ও আমি। রজনী মণ্ডলকে ডাকাই। তারপর ফণি কাকা ও আমি ইন্দুর ওখানে কতক্ষণ জ্যোৎস্নায় গল্প করি।

১২ই জুলাই, ১৯৪৩। ২৭শে আষাঢ়, ১৩৫০। সোমবার।

সকালে বেশ ঝলমলে রোদ। মাঝে মাঝে হাওয়া ও উড়ন্ত মেঘ। কল্যাণীকে নিয়ে বাঁওড়ের ধারের পথে কতদূর বেড়াতে গেলুম। চমৎকার সবুজ গাছপালা, লতা ঝোপ, পাখির ডাক, বনপুষ্প, বনবিতান, আউশ ধানের সবুজ ক্ষেত, আর্দ্র বৃক্ষতলে ব্যাঙের ছাতার দল, ক্বচিৎ দু'একটা গাছে সোঁদালিফুল, বড় বড় প্রাচীন বটবৃক্ষ। বেলেডাঙার কাছাকাছি গিয়ে একটা মাঠ দিয়ে এসে কুঠীর রাস্তায় যখন পড়েচি—তখন দক্ষিণদিকে বারাকপুরের ওপরে নীলকৃষ্ণ মেঘ ঘন হয়ে জমেছে—অদ্ভুত তার শোভা। চোখ ফেরানো যায় না সেদিক থেকে। আবার একদিকে সুনীল আকাশের খানিকটা মেঘের আড়াল থেকে দেখতে পাচ্চি। নদীজলে স্নান সেরে বাড়ি এলুম। নদীতে স্নান করচি—তখন বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি আর থামে না। মীনার দাদা এল ডাকতে—গেলুম। ডাকঘরের ইন্সপেক্টর এসেচে, কি একটা সই করতে হবে। তারপর বৃষ্টি। মীনা

এসে গল্প করলে বিকেলে। সন্ধ্যার আগে তালের বড়ার জোগাড় করে দিয়ে ফণিকাকার বাড়ি বেড়াতে যাই। ইন্দু রায়ের বাড়িও।

১৩ই জুলাই, ১৯৪৩। ২৮শে আষাঢ়, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে খানিকটা লিখি—তারপর বাঁওড়ের ধারের পথে বেড়াতে বার হই। সেই মাঠে বসি—বটগাছের ঘন পত্রবিতানে কোকিল ও বৌ-কথা-ক'র ডাক কি মধুর। বিশেষ করে কুঠীর পেয়ারাতলার ভ্যাদলা ঘাসের (যার পাতা কুচো কুচো) [ওপর] কতক্ষণ বসে বিশ্বরূপের সৌন্দর্য দেখি। কোথা থেকে একটা ছোট্ট পাখি এসে বসল সামনের গাছের ডালে—আমার মাথার আধহাত ওপরে ফলে-ভর্তি পেয়ারার ভালো নত হয়ে আছে। অতি নীল আকাশ—রোদ নেই তৃণা ?ঘন শ্যামল কোমল আসন—মনে আনন্দ আমার ধরে না। ভগবানের ধ্যান করবার উপযুক্ত স্থান—অথচ নির্জন, রাখাল বা লোকজনের ভিড় নেই। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠে আবার লিখি। হর বল্লে—চলুন নৌকো করে বেড়িয়ে আসি। আমি বল্লুম—আমার চলবে না। সন্ধ্যাবেলা ইঁদুর ওখানে গিয়ে বসি, তার আগেই অমূল্য, গজন, লালমোহনের জামাতা আমার এখানে এল। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা—ওদের কাছে বিজ্ঞানের কথা বলি।

কল্যাণী বলে—মান্‌কু, কাল রাত্রে ভাবলুম মান্‌কুকে একটু জড়িয়ে ধরি—আর তুমি বকলে।

১৪ই জুলাই, ১৯৪৩। ২৯শে আষাঢ়, ১৩৫০।বুধবার।

সকালে ইন্দু, বারিক, সন্তোষ মণ্ডল এল। আমরা খেয়েদেয়ে লক্ষ্মীকে প্রণাম করে বনগাঁ জমি রেজেস্ট্রি করতে গেলুম। জীতেন, রজনী, ইন্দু সবাই একসঙ্গে সজল মেঘলার হাওয়া-বওয়া দিনে বড় বড় জলসিক্ত তরুনিকরের বীথিপথ বেয়ে আউশধানের ক্ষেতগুলোর সবুজ জাওলার দিকে চোখ রেখে বনগাঁ পৌঁছে আশু সিং দলিল লেখকের বাড়ি দলিল লেখালুম। আমার বাল্যবন্ধু গদাই সেখানে লেখক। আমাকে দেখে খুব খুসি—আমিও তাকে দেখে খুব খুশি। ওকে আলাদা করে কিছু দেবো। আহা, লেখাপড়া শিখল না, দারিদ্র্যপীড়িত নিঃসহায় প্রৌঢ় ব্যক্তি। যখন সাবরেজিস্ট্রার পাশে বসিয়ে গল্প করচে, তখন ও অবাক হয়ে গিয়েছে একেবারে। তারপর ওরা চলে গেল—ওদের মিষ্টিমুখ করার জন্যে পয়সা দিলাম। এক নাপিতের বাক্সে বসে রাস্তায় মোড়ে গল্প করচি, সে ভালো করে বাক্সটা পেতে দিলে। জয়কৃষ্ণবাবুর বাসায় চা খেয়ে। যতীন ডাক্তারের বাসায় ইন্দু ও আমি তামাক খাই, মঙ্গলবার ওখানে আবার চা খেয়ে বিচুলিহাটার মধ্যে দিয়ে বাজারে এলুম। ভরতের দোকানে জল খেয়ে বাবুর বই কিনে আদ্র বর্ষার বাতাস গায়ে লাগাতে লাগাতে ইন্দুর সঙ্গে ফিরি। আজ কলকাতা যাবো বলে বেরিয়েছিলুম—কিন্তু গাড়ি পেলামনা।চালকীর হৃদয়বাবু বনগাঁ থেকে গল্প করতে করতে এল। বল্লুম—সেই বখতিয়ারপুর স্টেশনে সেবারে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

১৫ই জুলাই, ১৯৪৩। ৩০শে আষাঢ়, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

সারারাত বর্ষা। সকালে নদীর ঘাটে গিয়ে অপূর্ব অনুভূতি। মা লক্ষ্মী মেয়ের মতো হয়ে ধানের জমি করিয়ে দিলেন নাকি ?বাবার ভালো করবে না মেয়ে ?কিন্তু আমি যেন মুক্তাত্মা। দেবযান পথের পথিক—তাই যেন আমার সামনে জ্বলজ্বল করচে। কিন্তু মর্তের গাছপালা, ষাঁড়া, বৈঁচি ছেড়ে কোথায় যাবো ?চোখে জল আসে ওদের ছেড়ে যাবো ভাবলে। তাই গাইলুম—'যুগে যুগে আমি এ মোহনদুনিয়ার, দুঃখীর অশ্রুজল মুছাইয়া যাবো হায়'। বারিক ও ইন্দু এসে গল্প করচে আর কি ভীষণ বর্ষা। ঘন কালোমেঘে আকাশ ছেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাপী সে কি ভীষণ বাদল।

ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল

নদ নদী একাকার স্রোতে বহে জল।

বিলবিলে ভর্তি হল চক্ষের নিমেষে। বারিক বল্লে—আর বছর ফজরের নামাজ পড়ে আগুন আর তামাক আর ছিপ নিয়ে ডোবায় করে গিয়ে বাঁওড়ে কাটি দেলাম। মাছ ধরার গল্প। এ বৃষ্টিতে ট্যাঙরায় নাকি কই, জিওল, মাগুর খুব উঠেচে।

কল্যাণীকে নিয়ে স্নান করতে গেলুম। তোড়ে জল চলেচে আমাদের ভিটের পাশের সরু বাঁশতলার পথ দিয়ে। ও চেয়ারে বসে মাংস রেঁধেছিল বনগাঁর বাসায়—ঠাকুর চাকরে সাহায্য করেছিল এতদিন—সেকথা মনে পড়ল।

লক্ষ্মীর জন্যে ফুল কুড়িয়ে আনি শ্যামাচরণদার ফুলগাছটা থেকে। রাত্রে কোথাও গেলুম না। তবে হাটে গেলুম—হাট বসেনি ভালো। জলে জলময় চারিদিক। মাছও সস্তা নয়। সরু সুতোর মতো পোকাগুলো অসংখ্য ওবেলা জলের স্রোতে দেখলুম বাগানের ভিটেতে।

১৬ই জুলাই, ১৯৪৩। ৩১শে আষাঢ়, ১৩৫০। শুক্রবার।

আজও মেঘাচ্ছন্ন বাদলা দিন। কাল সারারাত বৃষ্টি গিয়েচে। ভেবেছিলুম কল্যাণীকে নিয়ে বেড়াতে যাব বাঁওড়ের পথে, তা হল না। নদীতে নেয়ে এলুম—তখন সামান্য একটু রোদ উঠেই মিলিয়ে গেল। আবার ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি। কোথাও বেরলুম না। বিদু (?)মীনা প্রভৃতি ছেলেমেয়েরা এসে দুপুরে বড় হৈ হৈ করতে লাগল। 'বিশ্বভারতী' থেকে পত্র এসেচে লেখা দেওয়ার জন্যে—কিন্তু উত্তর দিতে পারিনি। প্রমথ ঘোষ এসে বিকেলে জানালে আপনার চাকুরি হয়েচে বনগাঁ স্কুলে—কালযাবেন। মহাব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কল্যাণীর মতো নেই। ফণি কাকার বাড়ি গিয়ে বসলুম—অনেক লোক সেখানে। তাদেরও বল্লুম—বুধো ঘোষ ইত্যাদি। তাদেরও মত নেই। চিন্তের বাগানের দিকে সন্ধ্যার আগে বেড়াতে যাই। ইন্দুর বাড়ি বসে গল্প করলুম। জমি নেওয়ার সম্বন্ধেই কথা উঠল। বর্ষার সুন্দর দৃশ্য। অপরূপ বর্ষা। শচীন ঘাটশিলা থেকে পত্র লিখেচে। তাতে লিখেচে Wordsworth প্রকৃতির ভক্ত ছিলেন, সেটাকে Aldous Huxley উড়িয়ে দিয়েচেন, কোন্‌টা সত্যি ?ঘাটশিলার বর্ষা এবার নাকি অপূর্ব হয়েচে—তাকে অভিনন্দন জানিয়েচে।

১৭ই জুলাই, ১৯৪৩। ৩২শে আষাঢ়, ১৩৫০। শনিবার।

সকাল হইতেই ভীষণ বৃষ্টি—শেষরাত্রি হইতেই। এবার অতিরিক্ত বৃষ্টি। বসিয়া লিখিলাম। একটু রোদ উঠিল বেলা ৩টার সময়। কল্যাণী আমি ও তিনু—জলের ওপর দিয়া আরাম ডাঙায় বেড়াইতে গেলাম। অতি সুন্দর শোভা শ্যামল তৃণক্ষেত্রের। মরাগাঙের ধারে একজায়গায় গিয়ে বসি। সেখান থেকে আরামডাঙার ঘর বাড়ি যেন সবুজের সমুদ্রে ডুবে গেছে। এক চাষার বাড়ি গিয়ে উঠলুম খেজুর গাছের সাঁকো বেয়ে কাঁচিকাটার আলের ওপর দিয়ে। সেই দরগাতলার ঘাটের ওপরে এক চাষার বাড়ি গিয়ে বসি। তারা কল্যাণীকে পিঁড়ি পেতে বসালে, পান সেজে দিলে। সন্ধ্যার আগে সেখান থেকে বার হয়ে আবার মাঠ দিয়ে যখন আসচি, তখন পূর্ণিমার চাঁদমেঘের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারচে। নদীতে স্নান করে চলে এসে 'দেবযান' লিখি।

১৮ই জুলাই, ১৯৪৩। ১লা শ্রাবণ, ১৩৫০। রবিবার।

সকালে রোজ যুগল কাকাদের বাগানে বেড়িয়ে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ওপারের সবুজ মাঠের শোভা দেখি—বিশ্বরূপকে প্রণাম জানাই দাঁড়িয়ে। আজ কেষ্টদাসী জেলেনী সেই সময় ঘাসের বোঝা আনতে গিয়েছিল। আমি বাড়ি এসে কোথাও বেরুইনি। বনগ্রামের স্কুলের চাকুরি নিয়ে কল্যাণীর সঙ্গে পরামর্শ করি। হাটে গেলুম বৈকালে। ভীষণ কাদা। যতীন পরামাণিকের বাগান দিয়ে জল বাধায় (?)মাঠ দিয়ে ফণি কাকার সঙ্গে এলুম বাড়ি। ধান রোয়া হচ্চে—কিছু টাকা দিলুম হাটে, মোট ১৭৲টাকা এ পর্যন্ত দেওয়া গেল। আগের দিন ১০৲ টাকা আজ৭৲ টাকা। বাড়ি এসে কোথাও বেরুইনি—মন্মথদা চিঠি লিখেছেন বনগাঁ স্কুলের চাকুরির জন্যে। এভাবে কতকাল দেশে থাকিনি—এই সবুজ শ্রাবণ মাসে। সেই ছিলুম, ছেলেবেলায় যখন পাঁচড়া হয়েছিল—তারপর আর নয়।

১৯শে জুলাই, ১৯৪৩। ২রা শ্রাবণ, ১৩৫০। সোমবার।

আজ সকালে খুব বৃষ্টি। বসে বসে 'দেবযান' লিখি। বিকেলে আকাশের ধরণ(?)ছিল—বাঁওড়ের ধারে বেড়াতে গেলুম—এবং একটা অশ্বত্থ গাছের কাটা গুঁড়ির ওপরে বসে রইলুম কতক্ষণ। বাঁওড়ের ওপারে চেয়ে বেলডাঙার গাছপালার দিকে চেয়ে কি সুন্দর লাগল। কতক্ষণ বসে আছি, একটা লোক যাচ্চে নীচে দিয়ে। বল্লে, বাবু, সেদিন আমার বাড়ি গিয়েছিলেন মা আর আপনি। আমার নাম গোপাল তরফদার—আমি আপনাদের সঙ্গে একটা ধর্ম সম্বন্ধ পাতাবো। ওর নাম গোপাল তরফদার। একটা স্থান চারিদিকে জঙ্গলে ঘেরা—সেখানে বসে রইলুম একটু। ফিরে এসে বাড়িতে তিনু বল্লে, ট্যাংরার ওপারে তাকে নাকি সাপে তাড়া করেচে। 'দেবযান' লিখি। কল্যাণীর জ্বর।

২০শে জুলাই, ১৯৪৩। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে সন্তোষ এসে বল্লে—চলুন বনগাঁ। আমি ফণিকাকার বাড়ি যাই। ফিরে এসে ইন্দুর সঙ্গে বনগাঁ। সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত গেল। আশু সিং ভেন্ডার তার ওখানে বসে গল্প করি। মিতের বাড়িএসে বসি—কারণ আহমদ বল্লে—অত ঝোড় জঙ্গলের জমি আপনি নেবেন না। মিতেনি এসে গল্প করলে, ডলির বিয়েতে সবাইকে যেতে বল্লে। আহম্মদ

বল্লে—আপনি শুধু ধানের জমি নিন। তাই নিলুম। বারিক ও সন্তোষকে ডেকে বল্লুম—ধানের জমিগুলো বেছে বেছে দাও। তাই নিয়ে ছেড়ে দাও ।এদিকে আমার পুরোনো বন্ধু গদাই দলিল লিখছিল—সে বল্লে, জমি তুই নিয়ে নে—আমি লড়বো তোর হয়ে, ভয় পাসনে। আহা, গদাইকে দেখে দুঃখ হয়। দলিল লেখাতে ৪৷৷০ টাকা পড়ল—তখন ছুটি রেজেস্ট্রি আপিসে, সাবরেজিস্ট্রারকে বলে সময় নিই। আরো দেরী হয়ে যায়—আরো দেরী হলে রেজেস্ট্রি আজ হবে না—আবার ছুটি। সাবরেজেস্ট্রি আপিসে সময় দিলে—তখন সাবরেজিস্ট্রারের পাশে চেয়ারে বসে রইলুম। দলিল দাখিল হল—রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। সন্তোষ মণ্ডল বারিক মণ্ডল নুর আমি আমাদের ভরতের দোকানে নিয়ে এসে খাওয়ালে। তারপর আমরা চা কিনে বনগাঁ থেকে বেরুই। খুকু আছে বলে কালোর বাসার কাছে মনে হল এসে। কালোকে বল্লুম—বাসনের বাক্স দেখবো। ফেরি পাওয়া গেল না। চালকীর ওপারেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। ঝড়বৃষ্টি এল—আমরা ছুটে নিয়ে কাপালির বাড়ি ঢুকলাম। কাপড় ভিজে গেল—ঘোর অন্ধকার। যেই বৃষ্টি থামল—আমরা রওনা হই আবার। ফিরে এসে চা খাই। তিনুর সঙ্গে গল্প করি। কল্যাণীর জ্বর ছিল কাল, আজ নেই। তিনু খুব গল্প করলে। রাত্রে কি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠল বাইরে। ঘুম হয় না জ্যোৎস্না দেখে। বোঁ বোঁ করে একখানা এরোপ্লেন গেল উড়ে আকাশপথে—বাঁশবনের মাথা দিয়ে উড়ে গেল !

২১শে জুলাই, ১৯৪৩। ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৫০। বুধবার।

সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে এসে 'সাধু সুন্দর সিং'-এর জীবনী পড়ি। স্নানের পূর্বে কুঠীর মাঠের পেয়ারাতলায় গিয়ে বসে ঝলমলে শরতের রোদে কতক্ষণ বসে—বিশ্বরূপের কি অপরূপ রূপ চারিদিকে। পেছন থেকে এসে কে যে চোখ টিপে ধরচে। স্নান করে এলুম তখন অপরূপ নীল আকাশ শ্যামলা ধরণী। এসে আজ প্রথমে লিখতে আরম্ভ করতে পারি ইউনিভার্সিটির পাঠ্যবই। হরিপদদা এল এখানে তাঁর সঙ্গে ফণিকাকা, পাঁচু ও আমি বাঁওড়ের ধারের পথ দিয়ে চলে গেলুম বেলেডাঙা পর্যন্ত। সেখানে বসে ঘাসের ওপর ওদের সঙ্গে পরলোকতত্ত্ব আলোচনা করা গেল। ফিরবার পথে ইন্দু রায়ের বাড়ি গিয়ে গল্প করি—বাড়ি এসে দেখি কল্যাণীর জ্বর। জ্বরের ঘোরে বলচে, আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না মান্কু। আমি কোথায় যাবো—

খুব পরিপূর্ণ শরতের রোদ—ঝলমলে।

২২শে জুলাই, ১৯৪৩। ৫ই শ্রাবণ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে ছুটতে ছুটতে স্টেশনে গিয়ে ন'টার ট্রেন ধরে রানাঘাট। ট্রেনে যেতে যেতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় গান শুনতে শুনতে গেলুম, এক বৈরাগী করচে। খিনুর বাড়ি চা খেয়ে গান শুনি কলের গানে—জ্ঞান গোঁসাইয়ের। দোকানে গিয়ে সিমেন্টের দাম মিটিয়ে দিই। এসে ট্রেন ধরি। খুব রোদ। হাজারি প্রামাণিক নামল এই ট্রেনে—তার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে এলুম বাজার পর্যন্ত। মুকুন্দের দোকানে তামাক খেয়ে লালমোহনের সঙ্গে হরিপদর ?কথা বলতে বলতে আসি। কল্যাণী আমায় দেখে খুব খুসি হল। নদীতে স্নান করে এলুম। বৈকালে 'সাধু সুন্দর সিং'-এর জীবনী কুঠীর মাঠে গিয়ে পটলের ক্ষেতে বসে পড়ি। ভগবানের বিশ্বের সৌন্দর্য যেন প্রত্যক্ষ করলুম। রাঙা রোদ হয়ে এল—শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে গেল ঠিক যেন শীতকালের মতো। সিন্হা সাহেব চিঠি দিয়েচে, তার মধ্যে আমার দুখানা ফটো—গত মার্চ মাসে সেই যে বিনয়বাবু সাবডেপুটি পুরুলিয়াতে তুলেছিল। মাঠা বাংলো থেকে চিঠিখানা লেখা। শরীর খারাপ হল সন্ধ্যার সময়। কোথাও বেরুলাম না। বিকালে বসে 'সোনার বাংলা' revise করি।

২৩শে জুলাই, ১৯৪৩। ৬ই শ্রাবণ, ১৩৫০। শুক্রবার।

দুপুরে খুব জ্বর এল কল্যাণীর। ও বলচে জ্বরের ঘোরে আমি যদি বড় লেখিকা হতুম, পিসিমাকে ধান কিনে দিতাম, ন'দিকে গোয়াল করে দিতাম। যেদিন পাড় ভেঙে সাল পড়েছিল, সেদিন আমার মনটা কেমন হল, আমি ভাবলুম, মার নামে ঘাট করে দেবো। মান্কুকে ফেলে আমি একা কোথায় যাবো।...ইত্যাদি।

আমার শরীর খারাপ। সন্ধ্যাবেলা জ্বর-জ্বর মতো। একটুখানি পরে খুড়ো বাড়ি এল সুরেন রায়ের বাড়ি বসে অমূল্য আর গজনের সঙ্গে মামলার কথা হয়।

২৪শে জুলাই, ১৯৪৩। ৭ই শ্রাবণ, ১৩৫০। শনিবার।

আজ কল্যাণী ভালো আছে। কিন্তু আমার শরীর ভালো নয়। তবুও স্নান করে এলুম নদীতে গিয়ে। বিকেলে অনেকগুলো স্কুলের ছেলে এল, ইন্দু রায় এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্প করলে। সুরেন রায়ের বাড়ি গিয়ে সন্ধ্যায় গল্প করি। ফণি (?) ?বাড়ি গরম মুড়ি খেয়ে খুড়োর সঙ্গে গল্প করি। আমার জমি রোয়ার কথা বলে দিই।

২৫শে জুলাই, ১৯৪৩। ৮ই শ্রাবণ, ১৩৫০। রবিবার।

আজ আমার শরীর ভালো নয়। সারা দিন কিছু খাইনে বসে বসে 'সোনার বাংলা' correct করি। কল্যাণীর জ্বর এল খুব। সে কেবল বলবে পিসিমার ধান কিনে দিয়ো। অনেক রাত্রে জড়িত স্বরে আমায় বলচে—মান্‌কু, মান্‌কু—

কিন্তু ওর ভয়ানক পিপাসা। কোনো জ্ঞান নেই।

২৬শে জুলাই, ১৯৪৩। ৯ই শ্রাবণ, ১৩৫০। সোমবার।

সকালে উঠে বনগাঁ গেলুম নৌকো করে ফণি ও ইন্দু এবং তিনুর সঙ্গে। জলের কি অদ্ভুত শোভা ! গাছপালাগুলো জল ছুঁয়ে আছে—সেই একরকমের লতা সব বনের মাথায় ঝোপের ওপরে। বন্ধুর ওখান থেকে ওষুধ নিয়ে মন্মথদার ওখানে গেলুম—তার আগে বার লাইব্রেরিতে সকলের সঙ্গে কত গল্প। কালীপদ বিশ্বাস (কলাধরপুরের সেই কালীপদ) কলকাতা থেকে এখানে বেকার অবস্থায় ছিল, সম্প্রতি আমার জায়গায় বনগাঁয়ে চাকুরি করচে। সে আর আমি গল্প করচি—সত্যবাবু বল্লেন—কি, তুমি এলে না ?যখন ইচ্ছে এসো, ওকে আমি সরিয়ে দেবো। তুমি এলে স্কুলের নাম হয় কত। হেডপণ্ডিত (বৃদ্ধ হেডপণ্ডিতের জামাই) বল্লে—কি, আমাদের ওপর দয়া হল না ?অনিলকে বলে দিলুম বিবাহে আমার যাওয়া সম্ভব হবে না।

নৌকো করে আবার সব চলে এলুম। কি সুন্দর বৈকালটি। শুকপুকুরে নেমে বিজয়ের বাড়ি চা খেয়ে আবার সব আসি। রাত্রে কল্যাণীকে দেখে খুব খুসি। ও কাল মোটেই গল্প করেনি। আজ বল্লে—মান্‌কু (ছেলেমানুষের মতো সুরে) আমায় ফেলে তুমি গিয়েছিলে কেন ?তারপর বল্লে—তুমি চলে গেলে মান্‌কু, তোমার জন্যে আমি কেঁদেছিলুম।

তারপর ছড়া বলে—

মান্‌কু আমার মস্ত বড় বীর
মস্ত পালোয়ান
খস্‌খসে খুব মোটা
যেন কাশ্মীরী আলোয়ান—

কত আনন্দ হল তোমায় দেখে মান্‌কু—এইসব বলচে—

নুটুর চিঠি এসেচে। সে জমি কিন্‌চি শুনে খুসি হয়েচে।

২৭শে জুলাই, ১৯৪৩। ১০ই শ্রাবণ, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে তবলদার (?)এল, আমার ভিটের গাছ কাটলে—কিন্তু মাকাললতার ঝোপ আঘাত পাওয়াতে মনে বড় কষ্ট হল। বিশ্রী বর্ষা। সকালে হরিপদ ও ইন্দু এল। বিকেলে লালমোহনের জামাই এসে গল্প করলে, বুলু ও সত্য ওদের কাকিমার কাছে বসে চা ও খাবার খেলে। হরিপদর বাড়ি রাত্রে নিমন্ত্রণ। কল্যাণীর আজ জ্বর আসেনি—সন্ধ্যার আগে শুয়ে শুয়ে কত গল্প করি। কাঠ কাটতে গিয়ে তবলদারেরা বৃষ্টির জন্যে ফিরে গেল।

২৮শে জুলাই, ১৯৪৩। ১১ই শ্রাবণ, ১৩৫০। বুধবার।

সকালে হাতমুখ ধুয়ে লিখি। তবলদারেরা এসে কাঠ কাটলে। বৃষ্টি খুব। দুটো কাঠ নিয়ে এলুম। সুরেন রায়ের বাড়ি বসে গল্প করলে। আজ কল্যাণী ভালো আছে। হরিপদদার বাড়ি রাত্রে নিমন্ত্রণ মাংস ও ভাত খাবার। মশারী খাটিয়ে সন্ধ্যার সময় কল্যাণীর সঙ্গে গল্প করি। তারপর ওরা ডাকে—তখন নিমন্ত্রণ খাই।

২৯শে জুলাই, ১৯৪৩। ১২ই শ্রাবণ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

সকালে তিনু এসে বল্লে, নুটু আসবে। বৌমা ও নুটু বিকেলে এল। ওরা স্নান করে এল নদীতে। বিকেলে ইন্দু রায় ও নুটুকে নিয়ে কাঁচিকাটা, মরগাঙ অঞ্চল বেড়িয়ে এলুম। কতদিন পরে নুটু এল দেশে—একসঙ্গে বসে খেলুম রাত্রে। সেই

জলি ধানের খেতের সামনে বসে গল্প। নুটু নাকি ছেলেবেলা কবে বাবার সঙ্গে খাবরাপোতা গিয়েছিল—বাবা কথকতা করতে গিয়েছিলেন—সেই সঙ্গে ছিল।

৩০শে জুলাই, ১৯৪৩। ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৫০।শুক্রবার।

আজ সকালে উঠে কলকাতা। গজেনের দোকানে কৃষ্ণদয়াল প্রভৃতির সঙ্গে দেখা। ইউনিভার্সিটির আপিসে গেলুম ফর্ম আনতে। একজন দারোয়ান চাবি দিচ্চে ল্যাভাটরিতে, তাকে বললুম। তারাশঙ্করের সঙ্গে দেখা। সজনীর ওখানে দ্বারেশ এল, সুবলের সঙ্গে গল্প। D.M. ও গিরীন সোম হয়ে আবার M.C. Sircar—অসীম ব্যানার্জির দোকানে গেলুম। ফাল্গুনী মুখুয্যে বল্লে তার বই বেরিয়েচে—সংস্কৃত কলেজের সামনে দেখা। আমার এক ছাত্র চাষা ধোপার সঙ্গে দেখা। শান্তিপুরে লোকালে ফিরে খিনুদের বাড়ি পৌঁছাই রাত ১০টায়। রাত ২টো পর্যন্ত ধর্মতত্ত্ব আলোচনা খিনুর সঙ্গে। বাড়িতে এসে শুয়ে থাকি।

৩১শে জুলাই, ১৯৪৩। ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৫০। শনিবার।

ভোরে গাড়ি ছাড়ল। বেশ রোদ উঠেচে। স্টেশনে নেমে এসে মল্ল মাস্টারের বাড়ি চা খেলুম। তারপর চলে এলাম বাড়ি। ইন্দুর সঙ্গে কথাবার্তা বলচে নুটু। একজন কুইনিনওয়ালা ওষুধ বিক্রি করতে এল। বিকেলে স্কুলের ছাত্ররা বেড়াতে এল—তাদের সঙ্গে ঘোলার গাঙে নুটু ঘোতন সবাই মিলে নৌকো বেড়াতে গেলুম। সন্ধ্যায় নুটুরা বাঁড়ুয্যে পাড়া বেড়াতে গেল।

১লা আগস্ট, ১৯৪৩। ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৫০। রবিবার।

সকালে ইন্দু, ফণিকাকা—আরো বহু লোক। নদীতে স্নান করে এলুম। বিকেলে ইন্দু ও নুটুর সঙ্গে চালকীর জমিজমা দেখি ও খালপারের মাঠে ধানের ব্যবস্থা করি। রাত্রে তিনু কিছুক্ষণ গল্প করলে।

২রা আগস্ট, ১৯৪৩। ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৫০। সোমবার।

সকালে উঠে লিখতে বসি 'মৌচাক' ও ছোট গল্প। স্নান করে এলুম ঘোলার গাঙে—বেশরোদ। কিন্তু যখন নেমে এলুম, তখন বেশ মেঘ করে এল। বিকেলে বেশ রোদ, মরগাঙের ধারে বেড়াতে গেলুম। ইন্দু রায়, হর প্রভৃতি মাছ ধরচে। বড় সুন্দর ওপারের আরামডাঙার দৃশ্য—নীল আকাশের বড়ই অদ্ভুত শোভা।

৩রা আগস্ট, ১৯৪৩। ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

লিখচি। সারাদিন বৃষ্টি। নদীতে বাঁশতলার ঘাটে স্নান করি। গিরিনদার সঙ্গে বসে গল্প করি।

৪ঠা আগস্ট, ১৯৪৩। ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৫০। বুধবার।

সকালে উঠে ওপাড়ার ঘাটে মুখ ধুয়ে এলুম। তারপরে লিখি দেশ পত্রিকার গল্প আন্নার বিয়ে সংক্রান্ত। বৈকালে ইন্দুর সঙ্গে বাঁওড়ে গেলুম বেড়াতে। বর্ষাণক্ষান্ত শ্রাবণের অপরাহণ (অপরাহ্ণ)। মধু কামার মাছ ধরচে—তামাক খাওয়া গেল।

তারপরে জটেমারীর জোলার ধারে ইন্দু আর আমি বসলুম। কত লোক (?)। জেলের নৌকোতে ফিরে এলুম। অপূর্ব দৃশ্য হয়েচে চারিদিকের।

৫ই আগস্ট, ১৯৪৩।১৯শে শ্রাবণ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

বৃষ্টি, বৃষ্টি—সারাদিন বৃষ্টি। এবার অতিরিক্ত বৃষ্টি। এমন কোনোবারে দেখিনি। সকালে বৃষ্টি মাথায় ভিজতে ভিজতে শ্যামচরণদা'দের চিন্তের বাগানে বেড়াতে গিয়েছি—ওপাড়ার ঘাটে মুখ ধুতে গিয়েছি। সুরেন রায়মশায় সেখানে মাছ খোঁজ করচেন—আজ তাঁর ছেলের বিয়ে। আমি লিখি। বারিক মণ্ডল এসে বল্লে রোয়া শেষ হয়েচে—দেখে আসুন। বৃষ্টিতে বেরুতে পারা গেল না। সুরেন রায়ের ছেলের বরযাত্র ভোজে অবেলায় বেলা তিনটের সময় খেতে গেলুম। অসিদ্ধ কলাইয়ের ডাল, ডাঁটাচচ্চড়ি, চিংড়ি মাছের ঝোল আর একটু পায়েস। ভারী তো ভোজ ! এসে আবার লিখি। বৈকালে আবার গেলাম সুরেন রায়ের বাড়ি। বর সেজে বেরুচ্চে। রাত্রে পাঁচু কাকাদের বাড়ি বিয়ে হল। ইন্দু, জিতেন দফাদার, পাঁচু [,] গজন প্রভৃতি গান করলে। হেডমাস্টার চিঠি দিয়েচে রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধতিথিতে সভায় সভাপতিত্ব করতে। কিন্তু ইন্দুকে নিয়ে ছোট বুড়ির বিয়েতে আমি সেদিন কলিকাতা যাচ্চি। নেমন্তন্ন খেতে বসলুম রাত ১টার সময়। আমি, সুধীরদা, ননী মাস্টার একসঙ্গে। কল্যাণী, উমা, বৌমা বিয়েবাড়িতে রইল। আমি একা এসে শুয়ে শুয়ে 'ভজরে মন অমৃত সমান

রামচন্দ্র কি নাম চাকর রাখো জি' এই সব ভক্তির গান গাইতে থাকি রাত তিনটে পর্যন্ত। উমা একবার এসে বল্লে—বড়মামা দোর খুলুন—সে বাসরে রাত জাগবে।

৬ই আগস্ট, ১৯৪৩। ২০শে শ্রাবণ, ১৩৫০। শুক্রবার।

সকালে উঠে দেখি ঠিক শরতের রোদ। বেলা হয়েচে। নদীর ঘাটে মেঘের ও রোদের চমৎকার দৃশ্য। শরীর ভালো না। অত রাত্রে ঘুম হয়নি, খেয়ে হজম হয়নি। লিখতে বসলুম। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি ও ওর সঙ্গে গজনের বাড়ির পাশ দিয়ে স্নান করতে যেতে ডাক্তারদের বাড়ির পিছনে একটা ঝোপে ভায়োলেট রঙের বনকলমী ফুল ঝোপ আলো করে ফুটে থাকতে দেখলুম—আবার ঠিক তার ওপর সেই সময়েই এক বিচিত্রবর্ণের প্রজাপতি—একটা ফুলে সে প্রজাপতিটা বসল। মাথার ওপরে কতকাল পরে আজ গাঢ় নীলাকাশ, চারিপাশে গরম শরতের পরিপূর্ণ রোদ—আর রোদের সামনে ঘন সবুজ ঝোপের মাথায় এই অপূর্ব ফুটন্ত বনকলমী ফুলের দৃশ্য—একটা ফুলে প্রজাপতি বসেচে। এ দৃশ্য আমায় মুগ্ধ, বিস্মিত, স্তম্ভিত করলে। ভগবান কি দয়া আমার ওপর করলেন যে আমায় আজ এ দৃশ্য দেখালেন ! আমার তো এ পথ দিয়ে যাবার কথা নয়। ইন্দু বল্লে, চলুন আজ এপাড়ার ঘাটে— তাই গেলুম। জয় হোক, বিশ্বশিল্পী, জয় হোক তোমার। ঘাটের দৃশ্যও চমৎকার। ঘাস ছুঁয়ে আছে জল। নীল আকাশ। অনেকদিন পরে এমন রোদ, এমন আকাশ। সয়ে জেলে ও অভিলাষ জেলে পোনা ধরচে ঘোলার গাঙে।

৭ই আগস্ট, ১৯৪৩। ২১শে শ্রাবণ, ১৩৫০।শনিবার।

সকালে উঠে ভোরের গাড়িতে ইন্দু ও আমি ছোট বুড়ি [র] (অক্ষয়বাবুর মেয়ের) বিয়েতে কলকাতা রওনা হই। পথে যেতেই স্কুল ছাড়িয়ে মেঘ ঘিরে আসচে। কালো মেঘ। ভিজে গাড়িতে উঠি। কলকাতায় নেমে সুরেনবাবুর প্রেসে দেখা পেলুম না। পঞ্চানন মান্না তার দোকানে নিয়ে গিয়ে চা খাবার খাওয়ালে। স্কুলে গেলুম—সেই সব একতলার ঘরে ঢুকি। বর্ষাকালের সেই পাঁচিলে শেওলা জমেচে পুরোনো দিনের মতো। 'বাতায়নে' গল্প দিয়ে গজেনের ওখানে। ইন্দু এল। তাকে নিয়ে অমিয়র বাড়ি ও M.C. ইউনিভার্সিটিতে দেখি বন্ধ। বরেন্দ্র লাইব্রেরি, কাত্যায়নী ও D.M. হয়ে আবার বরেন্দ্র লাইব্রেরিতে বসে আছি—সজনী যাচ্চে—সে বল্লে, সেনেটে মিটিং। লর্ড বিশপ সভাপতি। স্যার বীরেন সভাপতি প্রস্তাব করলেন, আমি বাংলায় সমর্থন করতে গিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করি। নলিনাক্ষদা হাত ধরে টানাটানি করে। খগেন মিত্র বললেন—আপনি আমায় পত্র লিখবেন—কিছু যোগাযোগ হলে আপনাকে খবর দেব। বিভূতিদের বাড়ি এসে ?যুগল পরমপ্রসাদ, ছুট্টু সিং, কদর মণ্ডল—সকলের সঙ্গে দেখা। পুরোনো ইসমাইলপুরের দল। এরা বলে—ম্যানেজারবাবু—সারদাবাবু দাদু (?)বসে আছেন। শচীন বাঁড়ুয্যে, কিরণবাবু ও চারু বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা। চারু বিশ্বাস—না ভাই, স্কুল আর চলবে না।

৮ই আগস্ট, ১৯৪৩। ২২শে শ্রাবণ, ১৩৫০। রবিবার।

সকালে উঠে দেখি ৭টা। নেপেনের ঘরে তিনু, পচা রায় ও আমি। চাঁদিবাবু ওপরে চা খাচ্চে—সেখান থেকে বাণী রায়ের বাড়ি। বাণী রায় ফোন করেছিল, তখন [?]ধরেছিল বিভূতি। ভীষণ বৃষ্টি। বেলা ২টার সময় ডাঃ কালিদাস নাগ ও আমি এক বাসে চলে আসি। ৪৷৷০ টার সময় বরভোজ। বুদ্ধদেববাবুর বাড়িতে ব্যাঙের ছাতা দিয়ে এলুম। প্রফুল্ল সরকারের সঙ্গে দেখা করে এলুম।

বিভূতি মুখুয্যে বসে বুদ্ধদেবের বাড়িতে। রমেন ঘোষাল এল। যমুনা, যমুনার মা ও বেগুনের সঙ্গে দেখা। ট্রেনে রাণাঘাট। সিদুর (?)সঙ্গে গল্প কত রাত পর্যন্ত। ভোরের ট্রেনে বাড়ি।

৯ই আগস্ট, ১৯৪৩। ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৫০। সোমবার।

হেঁটে এলুম গঙ্গাচরণ পরামাণিকের বাগান দিয়ে—জল বাধার মাঠ দিয়ে। বাড়ি এসে যেন ঠেস চেয়ারে বসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। অত ঐশ্বর্যের গোলমাল কি আমার সহ্য হয় ?গাঙের ঘোলাজলে ঢল লেগেচে। ঝোপঝাপ ভেঙে পড়েচে জলে নুয়ে—সে দৃশ্য দেখবার চোখ আছে ক'জনের ?সেঁয়াকুল কাঁটার ঝোপটা জলের ধারে পাড় ভেঙে পড়ে গিয়েচে বনসিমতলার ঘাটে। সে দৃশ্যের তুলনা নেই। বড়লোকদের বাড়ির অত লেস্ ঝোলানো পর্দার চেয়ে কত ভালো লাগে এটা দেখতে ! সারাদিন কোথাও বেরুইনি। ঘুমিয়ে শরীর সুস্থ করি। পচা রাম এল বিকেলে। বড়লোকের বাড়ি কি দেখে এসেচে তার গল্প করতে লাগল। মধু কামারের বাড়ি একটুখানি বসে গল্প করে এলুম।

১০ই আগস্ট, ১৯৪৩। ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে বৃষ্টি। নদীর ধারে গিয়ে শ্রাবণ প্রভাতের মেঘাচ্ছন্ন দিন, কূলে কূলে ভরা নদী। ওপারের শ্যামা চরভূমি মনে কি অপূর্ব ভাবই না জাগাল। নদীতে স্নান করতে গেলুম সেই নুয়ে-পড়া সেঁয়াকুল ঝোপের ধারে—জলে এসে ছুঁয়েচে যারা মাথা। যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি শোভন এ ক্ষিতি তলেতে—তাঁরই বন্দনা প্রথমেই এল মনে। বিকেলে গেলুম বাঁওড়ের ধারে বেড়াতে।

খুড়ো, দুখু (?), শ্যামাচরণদা, হর মাছ ধরচে বাঁওড়ে। সেখানে একটু বসে অশত্থ গাছটারওপরে এসে বসলুম। গাছের মাথা কি চমৎকার ! কত লতা, কত পাতা, কত ধরনের ছোট ছোট কুচো পাতা—সব মিলিয়ে কি অদ্ভুত মহান সৌন্দর্য ! সেই মহান বিশ্বশিল্পীকে শতবার নমস্কার করি। সকালেই ফিরে এলুম ইন্দুর সঙ্গে। বুলু ও সত্য এসে বল্লে শুক্রবারে সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ সাঁতার দেখাবে গোপালনগরে। রাত্রে একটা গল্প আরম্ভ করি সেই যুগী বৌয়ের কথা। কল্যাণীকে বকি, কিন্তু ও আবার অনেকক্ষণ কেঁদে চুপ করে থেকে আমার গায়ে হাত দিয়ে ডাকে।

১১ই আগস্ট, ১৯৪৩। ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৫০। বুধবার।

সকালে উঠে নদীর ধারে বিশ্বদেবের উপাসনা করি। স্নান করতে যাওয়ার পূর্বে ওপাড়ার ঘাটে যাবার পথে একটা ঝোপে অদ্ভুত বনকলমীর ফুল ফুটেচে—বার বার ভগবানের শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশে প্রণাম জানাই। বিকেলে সুন্দরপুরের পাথে [—]। সুন্দরপুর পর্যন্ত হন্‌হন্‌ করে বেড়িয়ে আসি। ফণিকাকা ও ইন্দু রায় মাছ ধরতে গিয়েছিল—কিন্তু তাদের খুঁজে পাওয়া গেল না। কুঠীর মাঠ হয়ে ঘুরে বাড়ি চলে এলুম।

১২ই আগস্ট, ১৯৪৩। ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

আজ ইন্দুর সঙ্গে নৌকোপথে বনগাঁয়ে গেলুম। ভাসার (?)গাঙের ধারে অপূর্ব বনবিতানের সংস্থান দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। Supply Officer-এর নিকট থেকে লেখা নিয়ে ময়দা পেলুম ১ সের। কল্যাণীকে খুব বকি—কিন্তু ও আবার সে সব ঠেলে ফেলে দিয়ে দিব্যি আমার গায়ে (?)দিয়ে

১৩ই আগস্ট, ১৯৪৩। ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৫০। শুক্রবার।

সকালে উঠে লিখি। নদীতে স্নান করতে গেলুম, তখন বেশ রোদ। জলে নুইয়ে পড়া একটা শেঁয়াকুল ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে স্নান করে তৃপ্তি পাবার কথা—কিন্তু কতকগুলো লোককে নিমন্ত্রণ করার দরুন মনে তেমনি শান্তি নেই। খুব রোদ আজ, শরৎকালের মতো। প্রফুল্ল ঘোষ সাঁতার দিয়েচে স্কুলে—গেলুম সেখানে। সাঁতার হয়ে গিয়েচে—S.D.O. ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বসে আলাপ করা গেল। চা খেলুম একত্র। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে—মল্লর বাড়ি বসে গল্প করচি। কবি কুণ্ডুমশায় এসে কবিতা শোনালে। মাধবপুরের ক'টি ছাত্র যাচ্চে, তাদের সঙ্গে দারিঘাটার পুল পর্যন্ত এলুম। ওরা বল্লে, শুনলুম সার একদিন মাধবপুরে গিয়েছিলেন। সর্ব পরামাণিকের বাগানের ধারে জ্যোৎস্নায় বসি। কুমোরপাড়ার পথ দিয়ে বাড়ি আসচি, হাতে একছড়া কলা, ফকিরচাঁদের দোকান থেকে কেনা। ইন্দু রায়ের বাড়ি বসে গল্প করি জ্যোৎস্নায়। বাড়ি এসে দেখি নুটু ঘাটশিলায় ফিরে পত্র দিয়েচে। ন'দি, বুড়ি পিসিমা সবাই গল্প করতে করতে সেই সুবাসিনীর কথা উঠল। যুগল কাকার বিয়ের সময় আজ ৪০ বছর কিংবা ৩৮ বছর আগে সে সুন্দরী মেয়েটি এ গ্রামে এসেছিল—যুগল কাকার মায়ের ভাইঝি। বাড়ি আমলা সদরপুর। ওর বাবার নাম রামদাস। এত পরিচয় আজ ৩৮ বছর পরে জানা গেল। এতকাল পরেও তার রূপের প্রশংসা হল, তার চেহারার বর্ণনা হল। তার কথা উঠল—আশ্চর্য ! সেই যুগল কাকার স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে গেলেন।

১৪ই আগস্ট, ১৯৪৩। ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৫০। শনিবার।

অপূর্ব দিন। সকালে সূর্য উঠেচে। সারাদিন লিখি—নদীতে স্নান করে এলুম দুপুরে। বিকেলে বাঁওড়ের ধারের পথ দিয়ে মরগাঙে যাই। ইন্দু, ফণিকাকা, মধু মাছ ধরচে—বেলা গেল। সেই শরতের মটরলতা ঝোপে ঝোপে গরম রোদের আমেজ দিয়েচে। মাকালফলও দেখেচি ঝোপে, বনকলমীর ফুলও দেখেচি কয়েক জায়গার ঝোপে। সন্ধ্যায় সবাই একসঙ্গে চলে এসে বেলেডাঙার দোকানে বসে বিড়ি খেলুম। ওরা বল্লে, মাত্র দুঘর আছি। বন্যেয় সব উঠে গিয়েচে। রাত্রে আজচমৎকার জ্যোৎস্না। আমি শ্যামাচরণদার বাড়ি জিগ্যেস করতে গেলুম S.D.O. ধান দিলে কিনা। তাল নিয়ে ওদের খিড়কিদোর দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ফিরেএলুম। কত রাত পর্যন্ত সুন্দর জ্যোৎস্নার মধ্যে ন'দি, পিসিমা, কল্যাণী সব গল্প করি। ঠিক যেন শরতের জ্যোৎস্না।

আজ 'মুক্তি', গল্পটা শেষ হল রাত্রে। হাজরা যুগীর বৌকে নিয়ে লেখা।

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৩। ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৫০। রবিবার।

আজ নদী থেকে মুখ ধুয়ে আসি সকালে। ক'দিন বৃষ্টি নেই। বেশ সূর্য উঠেচে। এসে গল্প লিখি।

নদীতে স্নান করতে গিয়ে ঘোলার গাঙে সাঁতার দিয়ে গেলুম ওপাড়ার ঘাটে। মাঝে বাঁশতলার ঘাটে একখানা বাঁশে ভর দিয়ে খরস্রোতা নদীতে মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপরূপ বনঝোপের দিকে চেয়ে কি আনন্দই পেলুম। বিশ্বরূপের বন্দনা করে যখন আসচি তখন একটা ঝোপের মাথায় বনকলমীর ফুল ফুটেচে দেখে আর আমার পা নড়ে না। মাথার ওপরে নীল আকাশ, চক্‌চকে সবুজ ঝোপ, আর একটা গাছের মাথায় মাকাললতা উঠেচে—দুপুরের আকাশে ঘুঘু ডাকচে—আমার সেই স্বপ্নের শরৎ অন্যকালের বহু বিস্মৃত দিনের আনন্দ-মুহূর্তের অলিখিত ইতিহাস এই দিনগুলিতে যেন কোথায় লেখা আছে। মানুষের জীবন কি ৫০/৬০ বছরের ?তা নয় হাজার হাজার বছর ধরে এমনি কত শরতের মধ্যাহ্ন তার অপূর্ব পুলক ছড়িয়ে দিয়েচে প্রাণে, কত ঘুঘু ডাক দিয়ে সারা হয়েচে মানবজীবনের অবকাশ-মুহূর্তের আনন্দ উৎসবে, কতকাল ধরে কত আসা যাওয়া। জয় হোক বিশ্বের অধিদেবতার, যিনি এই অপূর্ব সৃষ্টি, এই পাখির গান, এই শরতের সোনালী মধ্যাহ্ন কল্পনা করেচেন। জয় হোক তাঁর। বিকেলে সেই কুঠীর মাঠে জোলে (?)ও অমৃতমপ্রকাশই দেখি সবদিকে।

১৬ই আগস্ট, ১৯৪৩। ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৫০। সোমবার।

অদ্ভুত শরতের দিনের মতো রৌদ্র। নীল আকাশ। আজ বনে বনে যেন বাল্যের মতো নিবিড় ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় মাকালফল, মটরলতা সংগ্রহ করবার দিন। মনে হয় শুধু বনে বনে বেড়াই। যেন কতকাল আগে এই সব বনের নিভৃত ছায়ায় বনের পরী হয়ে ঘুরে বেড়াতুম—অন্য কোন্ জন্মে। তারই স্মৃতি আমায় আজও উদ্বেল করে তোলে। সাঁতার দিয়ে ওপাড়ার ঘাটে যেতে যেতে ঘাটের ধারের মাকাললতা দুলানো ঝোপ, ডুমুরগাছ, সাঁইবাবলা গাছ, বাঁশঝাড় এত ভালো লাগে ! বিশ্বদেবের নবরূপের প্রকাশ যেন। নীল আকাশতলে সেই বনকলমীর ঝোপে ফুটন্ত বনকলমী ফুল দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—যেন এ মহাপবিত্র দেবায়তন। বিশ্বের সর্বত্রই দেবায়তন, যেখানেই তাঁর শিল্পের প্রকাশ—সেখানেই দেবায়ন ছাড়া আর কি ! ইন্দুর সঙ্গে নদীর ধারে গিয়ে বসলুম—নিবারণের কলাবাগানের ক্ষেতে। কূলে কূলে ভরা নদী। এমন সময় নদী দিয়ে নৌকোতে নবপুলের বিজয় যাচ্চে। তার সঙ্গে তার নৌকোতে তেঁতুলতলার ঘাটে নামি। রাত্রে ভোজ হরিপদদার বাড়ি। একটার সময় খাওয়া শেষ হল। অপূর্ব জ্যোৎস্না রাত্রি—আজ প্রতিপদ, শরতের জ্যোৎস্না—আমার ভ্রম হচ্চে কোজাগরী পূর্ণিমা। বারাকপুরের সেদিন নেই, সে জ্যাঠামশায় নেই [,] সে লুচি ভাজার গন্ধ আর বাঁশবন মাতায় না পূর্ণিমা সন্ধ্যারাত্রে। All India Radioর পত্র পেলুম।

১৭ই আগস্ট, ১৯৪৩। ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৫০।মঙ্গলবার।

সকালে উঠে দেখি অপূর্ব সূর্যোদয় হয়েচে—ঠিক যেন শীতকালের দিন। কাল শুতে অনেক রাত হয়েছিল, উঠতে দেরী হয়েচে। বসন্ত পালের ভোজ খেয়ে ফিরেছি রাত একটায়। স্নান করতে গিয়ে আজও সাঁতার দিয়ে চলে গেলুম বাঁশতলার ঘাটে। গরম রোদে শুকনো লতাপাতার সুগন্ধ,গরম মাটির গন্ধ। বাঁশতলার ঘাটের ওপরের জায়গাটি বড় চমৎকার। ঠিক যেন বাল্যের সেই জগৎ—যেখানে এমনি বনতলে খেলা করে মাকালফল আর মটরলতা কুড়িয়ে সংগ্রহ করে একদিন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ পেয়েছি এইসব দিনে। কলকাতায় মেসে বসে বারাকপুরের কথা মনে পড়ত—স্কুলের ছাদটা থেকে কতদিন ভাদ্রদুপুরের খররৌদ্রে উদাস মন এই গ্রামের বনে বনে ঘুরে বেড়াত। এই সে ভাদ্রদুপুর। সেই সব শরতের রৌদ্র।

আরামডাঙায় নদীপথে বৌমা, কল্যাণী, উমাকে, ফুচু মীনাকে নিয়ে যাবার কথা ৪টার সময়। কাল কলকাতা যাবো এবং শনিবারে ঘাটশিলা চলে যাবো। আজ গ্রামের জেলেপাড়ায় সেই মনসা পুজো। বাল্যকালে মেয়েরা জাত গাইত, ভাসান গাইত। আরামডাঙায় আবদুলের বাড়ি গেলুম—কতকাল পরে। আমার বাল্যবন্ধু সেই আবদুল। কত জায়গায় বেরিয়েচি, কখনো ভেবেচি আবদুলের বাড়ি যাবো ?গোপালনগরের স্কুলের বন্ধু সেই আবদুলের বাড়ি যেদিনটিতে যাবো—সেই মাসেই (?)রবীন্দ্র সম্মেলনে সিনেট হলে বক্তৃতা দেবো রবীন্দ্রনাথের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করবো—একথা অদৃষ্টে লেখা ছিল।

(এটা লেখা ঘাটশিলায়) সেই দিন আজ। ৩১শে শ্রাবণ, গৌরীর সঙ্গে আজ বিয়ে হয়েছিল—এই সান্ধ্য গোধূলিতে, যেদিন আরামডাঙার পথে যাচ্ছিলুম। তখন কিন্তু মনে ছিল না।

১৮ই আগস্ট, ১৯৪৩। ১লা ভাদ্র, ১৩৫০। বুধবার।

ভোরে কলকাতা। গজেন মিত্রের দোকান থেকে M.C. হয়ে অমিয় ব্যানার্জির দোকানে। বাতায়ন আপিস হয়ে ট্রামে কাত্যায়নী বুক স্টল ও D.M. Libraryতে যাবো। প্রবাসীতে এবার সিনেট হলের সেদিনকার বক্তৃতা দিয়েছিলুম সে কথা উল্লেখ করেচে। আবার গজেন ও M.C.-তে শিয়ালদহে এলুম। বসন্ত পালের সঙ্গে ট্রেনে উঠি। পথে সেই কবি গিরিজার সঙ্গে দেখা। বোর্ডিংয়ের সেই কবি। তাকে দিয়ে গল্প লেখা যায়। এসেই ন'টার ট্রেন পেলুম—হেঁটে চলে এলুম। এসে দেখি তিনু বসে গল্প করচে। ইন্দুর বাড়ি ফণিকাকা ও ইন্দু গল্প করচে।

১৯শে আগস্ট, ১৯৪৩। ২রা ভাদ্র, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে কিছুক্ষণ পরে কুঠীর মাঠের পেয়ারাতলায় গেলুম। পেয়ারা গাছটায় উঠে বসে চারিদিকে চাইলুম। গাছপালা, সবুজ ঝোপ, লতা, পাখি, নীল আকাশ আমার চারিদিকে ছড়ানো। পেয়ারাতলায় বসলেই মন আমার কেমন অনুভূতিতে ভরে ওঠে—তারপর পাশেই সে মাকাললতা দোলানো মস্ত উঁচু ঝোপটা। এসে নদীতে নামলুম, সাঁতার দিয়ে ভাসমান কচুড়িপানার [কচুরিপানার] দামের পাশ দিয়ে, নলখাগড়া বনের পাশ কাটিয়ে চলে এলুম বনসিমলতার ঘাটে। দুপুরে বই পড়ি। চা খেয়ে বাওড়ের ধারে গিয়ে অশত্থ গাছের ওপরে উঠে বসি। একটা ঝোপে কত বনকলমী ফুল ফুটেচে—তাই দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। কত কাল থেকে এ ফুল ফুট্‌চে এখানে। আপনমনে প্রকৃতি নিজের কাজ করে যাচ্চে যখন এ গ্রামে শ্যামাচরণের পূর্বপুরুষ সুবর্ণপুর গ্রামের জেলেপাড়ার সেই আনন্দ রায়ের তিন পিসিকে বিয়ে করেছিলেন সেটা ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ আন্দাজ। তাঁর ছেলে শিবচন্দ্র, তাঁর ছেলে হরচন্দ্র ইত্যাদি। দুখীরাম রায়ের ভাই ছিল, কাকা ছিল মহেশ রায়। কাকার বাড়ি ছিল তাঁর বাড়ি। তিনি বিক্রি করেন যোগেশ বাঁড়ুয্যেকে। আনন্দ রায়ের ঘরের দৌহিত্র শ্যামাচরণরা। আনন্দ রায়েরা বেনী রায়দের দৌহিত্র।চক্রবর্তীদের দৌহিত্র মুখুয্যেরাতাদের দৌহিত্র চাটুয্যেরা, তাঁদের দৌহিত্র আমরা। ভবানী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক। কারণ তাঁর নামের (?)আছে।

২০শে আগস্ট, ১৯৪০। ৩রা ভাদ্র, ১৩৫০। শুক্রবার।

আজ সকালে উঠে নদীর ধারে ও কালোদের চারাবাগান বেড়াই। দিনটা মাঝে মাঝে রোদ,মাঝে মাঝে বৃষ্টি। স্নান করতে গিয়ে বাঁশতলার ঘাটে নামি। তারপর ভীষণ বৃষ্টি এল তখন আমি জলে। ক'দিন বেশ গরম রোদ ছিল, শরতের আঁচ পাচ্ছিলাম। সেই বনকলমীর ফুল দেখবো রোদে বড় সখ ছিল—কিন্তু জলে নেমেছি—ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি। পরক্ষণেই আবার রোদ। সারাদিন বেরুইনি—ছেলেমানুষের ভিড়, চলে আসবো শুনে সবাই দেখা করতে আসচে। নুটুর পর এল মংলা ও গোপালকে নিয়ে যেতে। পচা রায়ের বাড়ি গিয়ে বসলাম, হরিপদদা এল। ফণিকাকা ও গিরিনদার বাড়ি গেলুম—পরে নদীর ধারে ঠিক সন্ধ্যার সময় দাঁড়ালুম। বর্ষণক্ষান্ত মেঘ ?সাদা মেঘের স্তূপ। বড় আনন্দ হল। রাত্রে বেরুই। গোপাল ও মংলা হেঁটে এল ও তিনু। যতীনদা ডাকচে—ও বিভূতি—বল্লুম, ঘাটশিলায় যাচ্চি দাদা।

২১শে আগস্ট, ১৯৪৩। ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৫০। শনিবার।

ভোর হয়ে গেল। ট্রেন পেলুম না। 3rd class-এ লালমোহনের সঙ্গে এলুম। লালমোহন অমূল্য মুহুরির নিন্দেবাদ করলে। কলকাতায় নেমে মায়াদি ও গৌরীশঙ্করের সঙ্গে দেখা। সারাদিন ট্রেনে। রাত ন'টায় ঘাটশিলা। ঝাড়গ্রামে বেণু ও দাসুর সঙ্গে দেখা। গাড়িতে বড় ভিড়। আবার সেই পাথরের দেশ, নীল পাহাড়। শালবন। ভগবানের অপূর্ব প্রকৃতিকে ধন্যবাদ।

ট্রেনে এক মুসলমান কাঁদলে তার ২২ বছরের ছেলে মারা গিয়েচে। তাকে আমি সান্ত্বনা দিলুম। বড় মায়া হল তার কান্না দেখে। সেদিন শ্মশান দেখে কল্যাণী কেঁদেছিল সন্ধ্যায় সে কথা মনে পড়ল।

২২শে আগস্ট, ১৯৪৩। ৫ই ভাদ্র, ১৩৫০। রবিবার। ঘাটশিলা

অনেকদিন পরে এলুম এখানে, নতুন দেশের নতুন হাওয়া গায়ে লাগল। সকালে উঠেই দেখলুম সুবর্ণরেখার ওপারের মেঘাবৃত পর্বতমালা। নতুনের মধ্যে মন এসে মুক্তি পেলে। আবার শালবনে বেড়াতে গেলুম, আবার বাঁধে স্নান করলুম। বিকেলে ভট্‌চাজ সাহেবের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে গল্পগুজব করি। পথে যাবার সময় হঠাৎ মিসেস্ কন্‌ওয়ারের সঙ্গে দেখা। সে বল্লে আমরা ছুটিতে চলে যাচ্চি, একদিন এসো। অন্ধকার রাত্রে ফিরে এলুম। নুটু এল অনেক রাতে লরিতে। তার সঙ্গে গল্প করি দেশের ধানের জমির।

২৩শে আগস্ট, ১৯৪৩। ৬ই ভাদ্র, ১৩৫৩। সোমবার।

সকালে দ্বিজুবাবুর বাড়িতে গল্প করি। নুটুর সঙ্গে গল্প করি। একসঙ্গে বাঁধে স্নান করি—মংলা, নুটু ও আমি। রমণীবাবু ও দ্বিজুবাবুর মধ্যের বিবাদ মিটিয়ে দিলাম। রাত্রে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দ্বিজুবাবুর বাড়িতে সভা। নুটু গান গাইলে, আমরা বক্তৃতা করলুম। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করি। আমার বিয়ের পূর্ব বৎসর এই জন্মাষ্টমীতে এসেছিলাম—সুপ্রভার পত্র এল, বাঁধের নীচের শালবনে দাঁড়িয়ে গৌরীর কথা মনে হল, বেশ মনে আছে। ন চ বল্লীপল্লবৎ (?)

২৪শে আগস্ট, ১৯৪৩। ৭ই ভাদ্র, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে দ্বিজুবাবুর বাড়ি। লিখি। স্নান করে আসি। বিকেলে মুকুলের বাড়ি গিয়ে চা খাই। মুকুলের বোন বুয়া এখানে, সে ঠাট্টা করতে লাগল। সুবোধ ডাক্তার বল্লে—দাদা, কবে এলেন ?সেখানে বসে গল্প করচি, সত্যবাবু এল। তাকে ও রামকৃষ্ণকে নিয়ে স্টেশনে গেলুম গাড়ি দেখতে। ঊষার চিঠি এল, তার উত্তরও দিলুম। কল্যাণীকে রাত্রে বকলুম মশারী টাঙানো নিয়ে। ওর চোখ দিয়ে অল্পেই জল বেরোয়—দেখে কষ্ট হল। অনেকক্ষণ পরে আবার গায়ে হাত দিয়ে আলাপ করলে। বল্লে—শীগ্‌গির মরে যাবো—তোমার না হয় খুকু ছিল, সুপ্রভা ছিল, ঊষা ছিল—আমার সাধ মেটেনি। তুমি ছাড়া আর কে আছে বলো ?একটা গল্প বলো মান্‌কু। এত বকুনি খেয়েও রাগকরে না। রোজ বলবে, একটা গল্প বলো মান্‌কু। ছেলেমানুষের মতো রোজ ওকে গল্প শোনাতে হবে। অনেক রাত্রে ঘুমুলাম।

২৫শে আগস্ট, ১৯৪৩। ৮ই ভাদ্র, ১৩৫০। বুধবার।

সকালে লিখি। বিকেলে বাজারে গিয়ে একসঙ্গে ৩৪ টাকা তিন আনার মুদীর দোকানের জিনিস কিনি—চাউল বাদে। মুদীর দোকান থেকে রাজবাড়ির গাড়িতে উঠে বঙ্কিমবাবুর ওখানে গিয়ে গল্প করি। বামড়া রাজস্টেটের দেওয়ান এসেচে। একসঙ্গে চা খেলুম—তারপরে আবার ফিরি মুদীর দোকানে। জিনিসপত্র নিয়ে গুটকে ও দুই মুটে রওনা হল। রাস্তায় সত্য মাস্টারের সঙ্গে দেখা। মুকুলের ওখানে গিয়ে কথা বলে বুয়ার কাছে জল খেয়েদেয়ে বাড়ি আসি ও গুটকের সঙ্গে গল্প করি।

২৬শে আগস্ট, ১৯৪৩। ৯ই ভাদ্র, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার। ঘাটশিলা

লিখি গল্প। স্নান সেরে আসি। বিকেলে গেলুম বেড়াতে, অমৃত শূর বলে আমার এক ছাত্র—মৌভাণ্ডারে কাজ করে। তার ওখানে চা খেয়ে মিসেস্ কনওয়ারের ওখানে। আর্টওয়াল এল সেখানে। হাত দেখা হল। পথ হারিয়ে ফেলি অন্ধকারে, অতি কষ্টে ফিরে আসি। নুটু এল রাত্রে। মি. সিনহা পাঠিয়েচে বিহার নহরণ্ডে (?)। চিঠি দিলুম। রাত্রে কল্যাণী পা ছুঁয়ে বলে—মান্‌কু আমায় ক্ষমা কর—তোমার মনে কষ্ট দিয়েচি কথা না বলে।

এদিনের ভুল ডায়েরি। এদিন শচীনের সঙ্গে রেল রাস্তার বড় বাঁধটার ওপরে উঠে বসেছিলুম। খুব বৃষ্টি হল এদিন। ওপরে যেটা লিখেচি ওটা শুক্রবারের।

২৭শে আগস্ট, ১৯৪৩। ১০ই ভাদ্র, ১৩৫০। শুক্রবার। ঝাড়গ্রাম

সকালে উঠে ট্রেনে ঝাড়গ্রাম। বেজায় ভিড়। ওদের বাসাটা খুঁজে নিলুম। বৈকালে ট্রেন ধরতে এসে বেজায় ভিড় দেখে ফিরলুম। গজেনরা এল কৈ ?কান্তিবাবু সাবরেজিস্ট্রার এল তার বাসায়। বল্লে—বড্ডtired সত্যিই লোকটা যেন ধুঁকচে। চলে এলুম রাত্রে বেলুর সঙ্গে গল্প করি। শ্বশুর মশায় এলেন কলকাতা থেকে।

২৮শে আগস্ট, ১৯৪৩। ১১ই ভাদ্র, ১৩৫০। শনিবার।

সকালবেলা উঠে রেল লাইন পার হয়ে নিবিড় এক শালবনের মধ্যে প্রবেশ করে বসলুম। তারপর শ্রীকৃষ্ণের রঙয়ের মতো শ্যাম বনানীর শোভা দেখে ফিরি কান্তিবাবুর বাড়ি। বসে গল্প করি। এই তো ছিলুম বারাকপুরে, এলুম ঝাড়গ্রামে। বেড়াচ্চি তো বেড়াচ্চি। রেবতী বলে মাড়োয়ারিদের ছোট মেয়ে আমাকে 'মেজদা' 'মেজদা' বলে সর্বদা ডাকে। নাইতে গেল, আমার কোলে উঠে কতদূর জলে গেল। ওর মা ওকে মার দিলে। চলে এলাম কল্যাণীর বাক্স নিয়ে নাগপুর প্যাসেঞ্জারে। গোপলা ও মংলা ধলভূমগড় স্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করলে। নুটু এসেচে, তার সঙ্গে গল্প করি।

২৯শে আগস্ট, ১৯৪৩। ১২ই ভাদ্র, ১৩৫০। রবিবার। ঘাটশিলা—বরাজুড়ি

সকালে উঠে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গেলাম। তারপর হেঁটে দুপুরে যাই বরাজুড়ি। কেমন সব শালবন পার হয়ে, বাটাই জোড় পার হয়ে—বেশ লাগে যেতে। নীল নীল শৈলশ্রেণী দূরে দূরে। কার্তিক গোরাই বলে জনৈক দোকানদার আমায় খাতির করে চা খাওয়ালে। দুলু সাঁওতাল, গুটকে ও আমি। হেঁটে এসে রাত্রে জ্বর হল।

৩০শে আগস্ট, ১৯৪৩। ১৩ই ভাদ্র, ১৩৫০। সোমবার।

এদিনের ডায়েরিটাই আগের দিনে লেখা হয়েছে।

৩১শে আগস্ট, ১৯৪৩। ১৪ই ভাদ্র, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকাল থেকে অসুখ বলেই বসে আছি। পড়চি—দিলীপের বইয়ে Aldous Huxleyর অধ্যাত্ম তত্ত্বের দিকে মোড় ঘুরবার কথায় বেশ উৎসাহ হল। সন্ধ্যার দিকে দ্বিজুবাবুর বাড়িতে দুর্গাপূজার মিটিং হল ডাহিগোড়ার সার্বজনীন (বারোয়ারি কথাটার বর্তমানের রূপ) পূজার কি করা যাবে। খুব বৃষ্টি আজ সারাদিন।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ১৫ই ভাদ্র, ১৩৫০। বুধবার।

সকাল থেকে লিখি আর পড়ি। হেলিওডোরাসের গল্পটা আরম্ভ করেচি। কোথাও বেরুইনি। বরাজুড়ির কৃপা চৌকীদার ও দুলা সাঁওতাল এসে ২।০ নিয়ে গেল গোলার জন্যে। দুপুরে বসে আছি—হঠাৎ শীত করতে লাগল। রোদে গিয়ে বসলুম। দুলা এল, ওকে বিড়ি দিলাম একটা। তারপর লেপ গায়ে দিয়ে ঘরে গিয়ে শুই। শচীন এসে পাশে বসে গল্প করলে অনেকক্ষণ। ভগবানের পবিত্র নাম যেন সর্বত্র, হয়েছে কি—লোকে সব কিছু নিয়ে মত্ত থাকবে—দিনান্তে একবারও Great Cosmic Force-এর কথা ভাববে না। ভক্তি নেই, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে রেখেচে জীবনে। টাকা চাই, যশ চাই, মান চাই, সম্পত্তি চাই, পুত্র চাই—আরাম চাই, ভালো খাদ্য, শয্যা, পরিচ্ছদ চাই—কিন্তু ভগবান ?না। ও সব কি হবে ?—দূর করে দাও ভগবানকে। তাও নয়, অনেকে ভগবান সম্বন্ধে সচেতনই নয় মোটে। দেখেচি আমি। আদৌ Conscious নয়। ওদের চৈতন্যের মধ্যে জাগতিক সব কিছু আছে, বিষয় টাকাকড়ি স্ত্রীলোক—নেই কেবল ভগবান।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ১৬ই ভাদ্র, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

জ্বর।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ১৭ই ভাদ্র, ১৩৫০। শুক্রবার।

জ্বর।

কল্যাণীর জন্মদিন। শচীনবাবু, দ্বিজুবাবু সবাই এল ও গেল। কল্যাণী ছেলেমানুষের মতো এল আমার কাছে— নতুন শাড়ি পরে—প্রণাম করে গেল। ঠিক ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্চে ওকে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ১৮ই ভাদ্র, ১৩৫০। শনিবার।

জ্বর।

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ১৯শে ভাদ্র, ১৩৫০। রবিবার।

তাও সুদূর বারাকপুর আর তার শৈশবের কথা এখানেও মনে পড়ে। বাবা মায়ের কথা—ওদের চারিপাশে এত মধুর, করুণ স্মৃতির halo কেন ?অন্য অনেকের পিতামাতা সম্বন্ধে তো এমন নেই ?রাত্রে নুটু, গুটকে মংলা এল। আমি সন্ধ্যায় পুকুরপাড়ে অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে বসে ছিলাম। সত্যই অপূর্ব। দূরে দূরে নীল পাহাড়, দূরবর্তী দিকচক্রবাল—বড় চমৎকার দৃশ্য ! ভগবানের কাছে তাঁর এই সৌন্দর্যের জন্য কত শ্রদ্ধা নিবেদন করলুম। আমি যেন তাঁকে কখনো ভুলি না। এসে দেখি দ্বিজুবাবু, শচীন বসে আছেন। ওঁদের সঙ্গে জ্যোৎস্নায় বসে গল্প করি। প্রধানত গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে। তারপর নুটু ও গুটকে ও মংলা এল। নুটু মোটরে এসেচে, মোটর খারাপ হওয়াতে হেঁটে এল।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ২০শে ভাদ্র, ১৩৫০। সোমবার।

নুটু রইল সারাদিন। গল্প করা গেল। বৈকালে নদীর ধারে ওভারসিয়ারের ক্ষেতের ওপরেটিলার ওপরে বসলুম। বড় চমৎকার লাগছিল। কি সুন্দর যে লাগছিল তা বলবার নয়। ভগবানের কথা এত মনে হয়। যখন বসে আছি, তখন বাঁধের ধার দিয়ে শালবনের মধ্যে দিয়ে যেন কল্যাণী ও নুটু, বৌমা, উমা নদীর ধারে বেড়াতে যাচ্চে। আমি ডাক দিলাম—নুটু ! নুটু ! কিন্তু ওরা উত্তর দিলে না। জ্যোৎস্না তখনো ওঠে নি—টিলা থেকে চলে এলুম। বাঁধের কাছে দেখি উমার গলা। শচীন ও শচীনের মায়ের সঙ্গে শুধু উমা বাঁধের ধারে গিয়েছিল। বাঁধের ধারে জ্যোৎস্নায় কতক্ষণ বসে রইলাম। নক্ষত্রভরা রাত্রি। বড় সুন্দর লাগছিল। ফিরে এসে নুটুর সঙ্গে গল্প করি বহুক্ষণ।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ২১শে ভাদ্র, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সারাদিন লিখি। দ্বিজুবাবুর বাড়িতে গল্প করি। ভালো ইলিশমাছ এল কোলাঘাট থেকে। কল্যাণী কিছুতেই ঘুমুতে দেয় না। ও মান্‌কু, আমার একটা পুরুষমানুষ তুই। তুই কত মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেচিস—আমার কে আছে তুই ছাড়া ?নুটু এল রাত্রে। ভীষণ গরম।

আজ বড় গরম। আজও টিলাটায় গিয়ে বসে—একটু পরে চলে এলুম [।] রেখা এসেচে গল্প করি। মংলা এল রাত্রে।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ২২শে ভাদ্র, ১৩৫০। বুধবার।

নুটু আছে। গল্পগুজব করি।

বৃষ্টি বড় ভীষণ। দ্বিজুবাবুর বাড়িতে গল্প করি। নুটু আজ টাটা গেল।

আজ সারাদিন লিখি। দ্বিজুবাবুর বাড়িতে গল্প করি। ভালো ইলিশ মাছ এল কোলাঘাট থেকে। মংলা হাট করে নিয়ে এল। নুটু এল রাত্রে। ভীষণ গরম। কল্যাণী কিছুতেই ঘুমুতে দেয় না (Vide Tuesday, 7th September) অর্থাৎ পূর্বদিনের ডায়েরি।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ২৩শে ভাদ্র, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

নুটু আছে সারাদিন। ভীষণ বৃষ্টি। বৈকালে ফণি এসে কবিতা শোনালে। দ্বিজুবাবুর বাড়িতে গল্প করি। নুটু সন্ধ্যায় টাটায় গেল। হেলিওডোরাসের গল্প লিখচি।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ২৪শে ভাদ্র, ১৩৫০। শুক্রবার।

আজও বৃষ্টি। বৈকালে মুকুলের বাড়ি বেড়াতে গেলুম। হেলিওডোরাসের গল্প শেষ করি। বহুস্থান থেকে তাগাদা আসচে লেখার। বেশ জ্যোৎস্না ফুটেচে।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ২৫শে ভাদ্র, ১৩৫০। শনিবার।

সকালে সুবর্ণরেখার ধারে বেড়াই। বিকেলে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গল্প করি। নবাব সাহেব এলেন বেড়াতে। সকালে দ্বিজুবাবুকে 'হেলিওডোরাস' গল্পটি পড়ে শোনাই। কল্যাণী ও আমি জ্যোৎস্নারাত্রে গল্প করচি—চালাঘরটার কাছে বসে, গুটকে এল প্যাসেঞ্জার ট্রেনে। জ্যোৎস্না চমৎকার।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ২৬শে ভাদ্র, ১৩৫০। রবিবার।

সকালে উঠে ফুলডুংরির দিকে বেড়িয়ে আসি। মুখ ধুই লেক-এ—মানে রাস্তার ধারের লেকে। বিকেলে সিন্‌হা সাহেবের সঙ্গে ফুলডুংরি।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ২৭শে ভাদ্র, ১৩৫০। সোমবার।

সকালে লিখি। দুপুরে এল সুবোধবাবু। তার সঙ্গে নরসিংহগড় ও চাকুলিয়া নিয়ে গল্প করি। রাত্রে আড্ডা। সুবোধ, সিংহ—ইত্যাদি।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ২৮শে ভাদ্র, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে সুবোধবাবু এল। বিকেলে সিনহা সাহেব এলেন বাবুর বাড়িতে। রাত্রে খুব আড্ডা।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ২৯শে ভাদ্র, ১৩৫০। বুধবার। ঘাটশিলা—বহরাগড়া

সকালে লেখা রেডিও আপিসে রেজিস্ট্রি করে এলুম। সিংহ সাহেবের বাড়িতে গিয়ে বসলুম। গল্প করি ডাকবাংলায়। বৈকালে মোটরে রওনা হয়ে প্রথমে ধলভূমগড়ে নুটুর বাসায় এলুম। গুটকে, গোপাল ও মংলা ছুটাছুটি করতে লাগল। মাংস খেলুম, পুরী খাই। সুন্দর মেঘান্ধকার দিনে বার হয়ে চাকুলিয়া হয়ে বহরাগড়া এলুম। রাত তিনটে পর্যন্ত গল্প করি।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ৩০শে ভাদ্র, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার। দুধকুণ্ডী বাংলা—বহরাগড়া

সকালে উঠে মোটরে দুধকুণ্ডী forest-এ বেড়ালুম। বৃষ্টি এল। ছোট্ট ঘাটোয়ালি বাংলো বনের ধারে। বৃষ্টিস্নাত খড়ের বাংলো ও বন। জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি। এতোয়া কতরকমের ফুল এনে দিলে। যেন এই মৌজা আমি কিনেচি। এই বনও আমার। এমন নির্জন বাংলোতে বসে লিখতে কি আরাম লাগে। wild শনের ফুল ও Wild Canna (?)র ফুলও তুলে নিয়ে এল। বহরাগড়া ফিরে এসে স্নান করে ঘুমুই—তারপর উঠি, হেডমাস্টার এলেন গল্প করতে। সন্ধ্যার পরে আমরা সন্ন্যাসীর তৈরি বাড়িতে গিয়ে দেখি দুজন ছোকরা বসে আছে। তারা সেখানে কি করচে জানিনে। আমরা অন্ধকারের মধ্যে একটা সাঁকোর ওপর বসে রইলুম কতক্ষণ ভগবান সম্বন্ধে কথা। অনেক রাত্রে এসে দেখি কল্যাণী 'ভারতবর্ষ' পড়চে। মি. সিন্‌হা গল্প পড়লেন। শুতে রাত ৩ ॥০ টা। আজ হাটবার গোপালনগরের।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ৩১শে ভাদ্র, ১৩৫০। শুক্রবার। বহরাগড়া

সকালে মেঘ ও বৃষ্টি। আমরা চা খেয়ে কেশুরদা বাঁশের forest দেখতে গেলুম। গত মার্চ মাসের চেয়ে এখন জঙ্গল বেড়েচে অনেক। কল্যাণী স্বর্গ বাউড়ি দেবীর সেই প্রাচীন মন্দির দেখতে গেল এবং তার পূজারী চিন্তামণি পাণ্ডা ঠাকুরের বাড়ি এসে বসি। দই চিঁড়ে খেয়ে সেখান থেকে ১টার সময় উঠে চলে এলুম—মি. সিন্‌হা এই সময় রেঞ্জার নুরুল হক্ ও ফরেস্টারকে নিয়ে ফিরলেন। ফিরেই বাঁশবনের পাশ দিয়ে বহরাগড়া। একটি ছেলে বল্লে—স্কুলে সব তৈরি, চলুন।—স্কুলে মোটরে আমি আর মি. সিন্‌হা গেলুম, কল্যাণীকে নিয়ে গেলুম না। সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা ও গল্প পাঠ হেডমাস্টারের বাসায়—গ্রীক ও হিন্দু। ওখান থেকে ফিরবার পথেও ওবেলা কেশরদা কেষ্ট পাণ্ডার বাড়ি দেখেছিলুম কংকালসার বালক শিশুরা মুড়ি ভিক্ষা করে বেড়াচ্চে। ডোমেদের ছেলে, সারাদিন এমনি ভিক্ষে করেই ফেরে। সন্ধ্যায় মোটরে কল্যাণীকে নিয়ে ময়ূরভঞ্জের ওপারে সুবর্ণরেখার তীরে মোগ্‌লিঘাটে বেড়াতে গেলুম। বিরাট নদী, ওপারে ভীষণ মেঘ করেচে কি একটা গ্রামের ওপারে। শুধুই শৈলশ্রেণী ওপারে। এপারে নিসিন্দেগাছের জঙ্গল ও মাঠ। গত বন্যায় এদের অনেক ক্ষতি হয়েছে—একজন গ্রামের লোক এসে বল্লে। গান, রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি হল। ভগবানের উপাসনা করা গেল। মনে কি অপূর্ব ভাব মোটর চড়ে আসবার সময়ে। ভগবানের নামে যেন চোখ দিয়ে জল পড়ে। চা খেতে বসেছি, স্কুলের টিচার ও কয়েকটি ছেলে এল। ভাগলপুর কলেজে পড়ে একজন, বল্লে, পাটনা কলেজে বি.এ-তে 'পথের পাঁচালি' পাঠ্য। আমরা খেয়ে জ্যোৎস্না রাত্রে কতক্ষণ বসি। ভাঙা চাঁদ ইসমাইলপুরে space-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সত্যিই অদ্ভুত space—এই রাত্রে কি অদ্ভুত রহস্যময় জ্যোৎস্নাই উঠেচে—সারা পৃথিবীকে মায়াময় করে তুলেচে এই জ্যোৎস্নালোক।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ১লা আশ্বিন, ১৩৫০। শনিবার। হেসাডি ডাকবাংলোতে লেখা।

খুব সকালে একদল কুলিদের গোলমালে ঘুম ভাঙল। ওরা মানসমুড়িয়া থেকে তার খাটাতেএসেচে। কি space বহরাগড়ায় ! এখানকার প্রধান সৌন্দর্যই এই। নুরুল হক বলেচে, দুহাজার কাঁঠাল লাগিয়েচে কেশরদার বাঁশবনের আলে। সূর্যালোকে ধরণী হাসছে। তারপর হেড মাস্টার এল—মোটরে আমরা রাঙামাটির পথ ও শালবন দিয়ে বেড়াতে গেলুম। বেড়াতে নয়, ফিরি ধলভূমগড়ে। আজ চাকুলিয়ায় হাট। সাঁওতাল মেয়েরা ঝাঁটা, ঝুড়ি, লাউ নিয়ে চাকুলিয়ার হাটে যাচ্চে। নুটুর বাসা এলুম ধলভূমে। একটা কুলির পিঠ দিয়ে রক্ত পড়চে—বেজায় জখম হয়েচে ডিনামাইট beatng-এর ফলে। সেখানে বেশ মুক্ত শালবন ও ধানক্ষেতের সবুজের মধ্যে বসে চা ও ভাত খাই। বৃষ্টি এল—আমরা ঘাটশিলা এলুম। গজেনের চিঠি পেলুম—তাঁরা চাঁইবাসা আসচে না—সুতরাং তখনই চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি মি.সিন্‌হার গাড়িতে। রাখামাইন্‌স এসে জাহ্নবী ও বোসের মিলিটারি ক্যাম্পে রাত্রিযাপন। মেসের টেবিলে খাবার সময় মেজরপ্রভৃতি ছিল— রেডিওতে সংবাদ শোনা গেল।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ২রা আশ্বিন, ১৩৫০। রবিবার। কালিকাপুর—রাখা মাইন্‌স্

সকালে উঠে চা খেয়ে কালিকাপুর Range Office-এ আসি। কালিকাপুর অতি বিশ্রী অপরিচ্ছন্ন তাঁবু। লেখাপড়া হল—ভিড় গল্প। মিসেস ভর্মা বাঙালির মেয়ে—নাম ঊষা চক্রবর্তী, ভাগলপুরের মেয়ে। সেখানে গল্প করে চলে এলুম চাঁইবাসা। স্নান করে গল্প করে বিশ্রাম করি। দ্বিজুবাবু এলেন ঘাটশিলা থেকে। সভা হল—পরেশ সান্যাল এলেন হাট গামারিয়া থেকে (ছোলা সেদ্ধ এসেচে টেবিলে)। সভান্তে বাড়ি এসে খাই। তারপর হল মজা—কোলহান পার্কের জ্যোৎস্নালোকে হাস্নাহানার গন্ধে প্রকাণ্ড পুকুরের ধারে রাত ১২টার পরে গেলুম এবং হল্লা, আড্ডা, দ্বিজুবাবুর আবৃত্তি (তপোভঙ্গ,—"বিবাহের যাত্রাপথতলে") ইত্যাদি চলল ৩॥০ টা পর্যন্ত। তারপর মোটরে জ্যোৎস্নালোকে চক্রধরপুর আসি। স্টেশনে এসে দ্বিজুবাবুকে নামিয়ে আমরা পোড়াহাট পাহাড়ে এসে উঠি—জঙ্গলে জ্যোৎস্নার কি শোভা সেই ৪॥০ টার সময়ে, অপূর্ব নির্জন

জ্যোৎস্নালোকে—খুব কুয়াশা এল সেই শীতল বনভূমির মধ্যে শেষরাত্রে। একটা বন্য খরগোস কান খাড়া করে পালাল। আমরা মোটর থামিয়ে শালবনের জ্যোৎস্নালোকেই বসি। বাঘের ভয় নাকি আছে, তবুও নেমে গল্প করি। সিগারেট খাই। পরেশ সান্ন্যাল বলে, আর একটি সিগারেট ধরান। টেবো (২০০০ ফুট) ছাড়িয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্না কুয়াসায় ঢেকে দিলে, সামনের কাঁচ Blurred হয়ে গেল বার বার। একটা খরগোস পালাল মোটরের সামনে লাফাতে লাফাতে। হেসাডি বাংলোতে আসা মাত্র ঘুমিয়ে পড়ি।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ৩রা আশ্বিন, ১৩৫০। সোমবার।হিড্‌নীfall-এ বসে হেসাডি। লেখা। বেলা ১২টা।

মোটরেই ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে উঠে টেবিলে চা খাই ও ছোলা সেদ্ধ। লেবু দিয়ে চা। নানা প্লট নিয়ে গল্প করচি। তারপরে চা খেয়ে মোটরে হিডনী falls-এ এসে পৌঁছুই। অপূর্ব বনভূমি, উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র বেয়ে জল পড়চে। এখন মেঘ করেচে ঘন শ্যামল কালো মেঘ জলে-ভেজা উত্তুঙ্গ পর্বতগাত্রে পড়ে অদ্ভুত শোভার সৃষ্টি করেচে। বসে আছি বিস্তৃত শিলাগাত্রে ধাপে ধাপে ওঠা ঘন বনভূমি। মেঘ চারিদিক কালো হয়ে এসেচে। আমি বসে লিখচি। অপূর্ব—অপূর্ব শোভা ! মেঘে কালো হয়ে গিয়েচে বনভূমি—সাদা জলপ্রপাতটি কালো জলে ভেজা পাথরের গায়ে। আমরা সবাই গিয়ে ওই জলধারায় নেয়ে এসেচি। মি. সিনহা আমায় ধরে টানতে আমি পালিয়ে এলুম—অত কাছে যেতে ভরসা হয় না। তবুও কি তীব্রবেগে মাথা ও পিঠে জলধারা পড়তে লাগল—পিঠ ভেঙে যায়—চোখে কিছু দেখতে পাইনে। ঘন কালো মেঘ এসেচে আকাশ জুড়ে, বনানী কালো হয়ে উঠেচে। শ্যামল বনানীর শোভা ঘন মেঘের তলায় অতি অদ্ভুত দেখাচ্চে। অথচ খানিক আগেও রৌদ্র ছিল খুব। একদিকে Lantana ফুল ফুটেচে জঙ্গলে। সুবোধ মোটরে চলে গিয়েচে—তারসবতাতেই তাড়াতাড়ি। তারপর অদ্ভুত বনভূমি ও বড় বড় গাছের মধ্যে দিয়ে হেঁটে মোটরে এলুম।

নাক্‌টি—চাঁইবাসা

কি সুন্দর বনশোভা সারাপথ—বনকলমীফুলের মতো কি যেন ফুল ফুটেচে—আরো কত কি শোভা। নাকটি বাংলোতে বসে লিখচি। এখানে জল খেতে নেমেচি। বেলা ২টো। পরেশবাবু বিড়ি নিয়ে এলেন জোগাড় করে। খাবার জল পাওয়া গেল না—চলে এলুম চক্রধরপুরে জল খেতে। P.W.D. আপিসের সামনে জল নিয়ে এল নগেনবাবুর ছেলে। সুবোধ কোন্ কুলিকে বলেছিল পোড়াহাটের বনপথে—এই ঠিকসে কাম করো—তাই নিয়ে সারাপথ বেচারিকে উত্ত্যক্ত করি। চাঁইবাসা এসে বেলা ৪৷৷০ টার সময়ে ক্ষুধার্ত সময়ে খেলুম। তারপর নিদ্রা। সন্ধ্যায় সুবোধের বাড়িতে আমার গল্প শোনাতে আরো কার কার নিমন্ত্রণ করেছিল। কোলহান Supdt মি. কালী মিত্র ও আরো দুজন লোকে এল—চা চলল ফুলবাগানে—গল্পপাঠ হল 'হোলিওডোরাস' ও 'ভিড়'। রাত্রে খেয়ে গল্প করি ও শুই। বেশ ঠাণ্ডা। আজ এই ট্রেনে গেলে ভালো হোত—কিন্তু কাল যাওয়া হবে, আজ নয়।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৫০।মঙ্গলবার।

সকালে উঠে মি. সিনহা ও আমি সাহিত্যচর্চা করি প্রেমচাঁদকে নিয়ে। সুবোধ দুবার এল, গেল। অবিনাশবাবু এলেন। লীলার বাবা। বিকালে চা ও মকাই ভাজা ও হালুয়া খাচ্চি—মুকুল এল ঘাটশিলা থেকে। মোটরে বেরিয়ে হাট দেখে ভবানী সিং-এর বাড়ি এলুম। স্টেশনে মি. সিন্‌হা ও আমি বসে 'সই' গল্প পড়া গেল।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ৫ই আশ্বিন, ১৩৫০। বুধবার। টাটানগর—ঘাটশিলা

ট্রেনে টাটানগর এলুম ১০৷৷০ টাতে। বাদাম পাহাড়ের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে, সকাল বেলা ছাড়বে। বাদাম পাহাড়ের গাড়িতে ইন্টার ক্লাসে শুয়ে ঘুমুই। ভোরে উঠে মুখ ধুয়ে মেলে ঘাটশিলা। বাড়ি এসে মনে আনন্দ হল। কোথায় বহড়াগড়ার মুক্ত space—কেশরদার উড়িয়া ব্রাহ্মণের বাড়ি সুবর্ণরেখার তীর—হিডনী water falls, সব ছেড়ে চলে এলুম দেশে যেন। হাওড়া ছাত্রসমাজ থেকে পত্র লিখেচে—সেখানে সভাপতিত্ব করতে হবে। সারাদিন বাড়ি বসে—দ্বিজুবাবুর বাড়ি গেলুম ফুল আনতে। বিকেলে বাঁধা পরব দেখতে বার হই ভূপালবাবু পোস্টমাস্টারের সঙ্গে। মুকুলের বাড়ি চা খাই—বুয়া তামাক সেজে আনলে। যানি (?)বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। কল্যাণী আমায় দেখে খুব খুশি হল। রাত্রে ঠাণ্ডা বেশ।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ১৬ই আশ্বিন, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার। ঘাটশিলা

সকাল থেকে মেঘ ও বাদলা। এমন সময় এমন বাদলা হবে কে জানত ?শরতের পরিপূর্ণ রৌদ্র একবারও চোখে পড়ল না—শরৎ-এর সে সুন্দর রৌদ্র ও ছায়া কোথায় গেল ?এ কি ভালো লাগে, এ সময় একদিনও শরৎ পেলুম না এবার। ভাদ্র মাসে আমার যখন জ্বর—সেই সময় দিনকতক হয়েছিল—রোদ সেই শেষ। বৃষ্টির দিনে বাড়ি বসে আছি—আর কি করবো ?কৃষক

(?)দুইটি ছেলে এসেচে বরাজুড়ি থেকে—খোলা দিয়ে ঘর ছাইবে। বারাকপুরের নলিনীদি'র ছেলে হ্যাঁদা চিঠি লিখেচে জমির জন্যে। শক্তিপদ রাজগুরু লিখেচে রেডিও লেকচার দিতে গিয়ে আমি যেন ওর বাসাতে থাকি।

কোথাও বেরুইনি। দ্বিজুবাবুর বাড়ি সন্ধ্যা থেকে রাত ১০৷৷০ টা। কেষ্ট সরকার ও আমি লুচি খাই। পুজোতে কিরণশঙ্কর রায় আসবে চিঠি দিয়েচে নীরদবাবু। তাই বাড়ি খুঁজবে কাল। বহরাগড়া ও দুধকুণ্ডীতে দুই যেন আমার বাড়ি। সেই space-এর মধ্যে গিয়ে থাকা। সুন্দর লাগে। সবরকম বইথাকবে। ফার্নিচার থাকবে। দুজন কর্মচারী, ৩জন সেপাই ও তাদের পরিবারবর্গ। চাকর একজন বরাবর দেখাশুনোকরবার। আলমারী ভরা বই। বাংলাগুলো সবাই পড়ে, নায়েবের চার্জে থাকে। ১৫০ বিঘা জমিতে ধানের চাষ, ৬০০০ মন চাল হয়। গরু দুটি ৬/০ সের দুধ দেয়। হাঁস একপাল পুকুরে চরে—আনাজের ক্ষেত। পেঁপে অজস্র।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ৭ই আশ্বিন, ১৩৫০। শুক্রবার।

সকালে উঠে লিখতে বসি। 'যুগী'র [?]গল্প আরম্ভ করি। আগামীকাল শেষ হবে। সারাদিন বসে লিখি ও 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়ি। বিকেলে ফণিদের বাড়ি গেলুম ও নবাব সাহেবের বাড়ি পুজোর চাঁদা আদায় করতে। ফণিদের বাড়ি অনেক রাত পর্যন্ত ধর্মকথা ও গান আলোচনা হল।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ৮ই আশ্বিন, ১৩৫০। শনিবার।

সকাল থেকে লিখি পড়ি। দ্বিজুবাবুর বাড়িতে গেলুম, কলকাতার সেই মিডিয়ম সুরেশবাবুর মা, তার এক ছেলে ডাক্তার, সে এসেচে। আমাদের বাড়ি এল। বিকেলে ফণি এল, তার সঙ্গে কলোনিতে গিয়ে দেখি ছোট বাড়িটাতে স্কুলের হেডমাস্টার, সত্যবাবু তাস খেলচে। আমাদের চা খাওয়ালে। মাস্টারের নাম গোকুল পাইন—সেই নাকি 'অপরাজিত' বেরুবার সময় সোনার বেনে ছেলেদের লেখার প্রতিবাদ করেছিল। আশ্চর্য এতদিন পরে তার সঙ্গে দেখা হল ! এতদিন পরে ঘাটশিলায় এভাবে দেখা হবে কে জানত ?ফুলডুংরির নীচে ফণির সঙ্গে বসি গিয়ে। অন্ধকার রাত। দ্বিজুবাবুর বাড়ি বসি তার পরে। আজ ওবেলা ইলিশমাছ ও মাংস কিনেছিলাম।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ৯ই আশ্বিন, ১৩৫০। রবিবার।

সকালে উঠে লিখি ও রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়ি।

বৈকালে ফণির সঙ্গে বনমধ্যস্থ হ্রদে বেড়াতে গেলুম। বনের অনেকখানি কেটে ফেলেচে দেখে দুঃখ হল। নুটু এসেছিল, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলি। রাজেন চাকর অনেকদিন পরে এল।

'আমি মুক্ত' এ কথাটি খুব ভালো। এ অভিমান বটে, কিন্তু ভালো অভিমান। এই ভাবতে ভাবতে সে মুক্ত হয়ে যায়। আবার 'আমি বদ্ধ' 'আমি পাপী' একথা বলতে বলতে সে লোক বদ্ধই হয়ে পড়ে। বরং বলতে হয় আমি তাঁর নাম করচি—আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি ! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। 'Fear is the greatest sin'বিবেকানন্দ।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ১০ই আশ্বিন, ১৩৫০। সোমবার।

এদিন নুটু সকালে মোটরে চলে গেল। হেডমাস্টার ও একটি টিচার এসে হাজির। স্কুল সম্বন্ধে অনেক কিছু বল্লে। বিকেলে বাজার করে আনি একেবারে। বুয়ার (?)বাড়ি অনেকরাত পর্যন্ত গল্প।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ১১ই আশ্বিন, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে রাজেনকে নিয়ে স্টেশনে। গাড়িতে বেশ জায়গা, বাঙ্ক মেলে। কলকাতায় এসে মিত্র এ [ও] ঘোষের দোকানে মহাদেববাবু এল। M. C. ও কাত্যায়নী। তারাশংকর ও নরেনদার (নরেন দেব) সঙ্গে গল্প করি কাত্যায়নী বুকস্টলে। সজনীর ওখান ঘুরে বুদ্ধদেব বাবুর বাড়ি। রমেশবাবুর সঙ্গে বইয়ের Contract।সারা রাত দেশে গল্প করি বুদ্ধদেববাবুর বিষয়ে।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ১২ই আশ্বনি, ১৩৫০। বুধবার। কলিকাতা

সকালে সজনীর বাড়ি যাই। বুলারের Inscription ও ছন্দোমঞ্জরী দেখে পট্টমহাদেবীহংসপদিকার নাম বার করতে বই সব ফেল। সজনীর ওখানে প্রেমাঙ্কুর, জগদীশ ইত্যাদি। হেলিওডোরাসের গল্প পাঠ হল। শনিবারের চিঠির জন্যে ভিড় গল্পটা নিলে। বাড়ি এসে খেয়ে একটু শুয়ে প্রথমে দেবসাহিত্য কুটির, পরে অপূর্ববাবুর বাড়ি হয়ে ২ ঘণ্টা বসে

রমাপ্রসন্নের বাড়ি। ওখান থেকে বার হয়ে একটা চায়ের দোকানে রমাপ্রসন্নের সঙ্গে চা খাই। পথে ম্যানোলা (?)যাচ্চে। নাটাবাবু ! বলে ডাকলে। রেডিও যাবার আগে 'বাতায়ন' আপিসে যাচ্চি [,] গিরিজাদা বল্লে —আসিস্ না কেন বিভূতি ?রেডিও আপিসে যখন ?বল্লে—বিমলের ভাই। রেডিও বক্তৃতার পর। শক্তিপদ রাজগুরু এল। ট্রামে বুদ্ধদেববাবুর বাড়ি এসে দেখি রমেশবাবু বসে।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। ১৩ই আশ্বিন, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে সতুকাকার বাসায় গিয়ে হরিপদদা, সুকুমার প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হল। বলা বোষ্টম আমায় সাক্ষী মেনে নালিশ করেছিল ফণিকাকার নামে। এলুম বেগুনদের বাড়ি। খেয়ে M.C.। সেখান থেকে দুতিনবার ইউনিভার্সিটি গিয়ে চেক বাহির করি। সজনী ও প্রবোধ ও কৃষ্ণদয়াল বসে আড্ডা। M.C.তে সৌরীন মুখুয্যে ইত্যাদি বসে। যসিমুদ্দিন বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেক গল্প। মাঝের গাঁয়ের মেয়েটির কথা আজও মনে রেখেচে। মনোজ বসু আমাকে ও সজনীকে নিয়ে গিয়ে ওদের দোকানে বসালে। শ্রীকুমারবাবুর সঙ্গে দেখা হল—তখন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্চি—বল্লেন—সেই নলহাটিতে দেখা হয়েছিল। বরেন্দ্র লাইব্রেরি হয়ে ফিরবার পথে পরিমল গোস্বামীর বাড়ি এলুম—গোপাল ভট্চাজ (বৈজ্ঞানিক) বসে। একসঙ্গে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রে ৮টার সময় কৈলাস বোসের স্ট্রীট দিয়ে এলুম। আজ বারবেলা, ঠিক সেই দিনই বুদ্ধদেবের বাড়ি গিয়ে গোপাল নিয়োগী (মাতৃভূমি) [.] রমেশ ঘোষাল, সেই গায়ক ভদ্রলোক—সব বসে। যেন বারবেলা অনুষ্ঠিত হল ৫ বছর আগের সেই দিনগুলির মতো। খুকুর বিয়ে হল যে বছরে।

১লা অক্টোবর, ১৯৪৩। ১৪ই আশ্বিন, ১৩৫০। শুক্রবার।

সকালে স্নান করে গিরিন সোমের বাড়ি এলুম। ওর দাদা আছে—ও বেরিয়েচে। চা খাচ্চি—এমন সময় গিরিনবাবু এসে বল্লেন—এইমাত্র রামানন্দবাবু মারা গেলেন। শুনে কষ্ট হল—প্রাচীনতম সাংবাদিক একজন। আমায় বড় ভালোবাসতেন। খাওয়া পর্যন্ত রইলুম— তারপর বের হয়ে M.C. ইত্যাদি ঘুরি। সজনীর ওখান থেকে সকাল সকাল টাকা নিয়ে ফিরি। কত রাত পর্যন্ত ভিখারির ভিড়—সারারাত বলচে—ফেন দাও ! চাল দাও !

হে ঈশ্বর, তুমি প্রভু, আমি দাস—এর নাম দাসভাব। সাধকের পক্ষে এ ভাবটি খুব ভালো। কাশীতে মৃত্যু হলে সাক্ষাৎ হয়। বলেন—আমার এ সাকার রূপ, ভক্তের জন্য এইরূপ ধারণ করি। এই দ্যাখ (?)অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যাই।

কলিতে নারদীয় ভক্তি। ভক্তিযোগ চাই।

২রা অক্টোবর, ১৯৪৩। ১৫ই আশ্বিন, ১৩৫০। শনিবার। বারাকপুর

সকালে উঠে শিয়ালদহ। ৮টার ট্রেনে বারাকপুর রওনা। অনেকদিন পরে বাংলার গাছপালা দেখছি। রানাঘাটে এসে ১১টায় ট্রেন ধরি। রানাঘাটে চাউলের বড় অভাব হয়েচে শুনলুম। ১১টায় ট্রেনে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে দু'আনা শেয়ারে বাজার এলুম। ইদের উপাসনা হচ্চে হোমিওপ্যাথীক ডাক্তারের বাসার সামনের বাঁশবনের ছায়ায়। কালো পাঁচু বলচে—দাদা, বাড়ি এলেন ?বাড়ি এসে দেখি তালা পড়ে গিয়েচে। তালা খোলে না, ফুচুর মা তেল দিলে। স্নান করতে গিয়ে কি অদ্ভুত আনন্দ—সেই গাছপালা, বাঁশবন পাখির ডাকের মধ্যে দিয়ে যাচ্চি—বহরাগড়ার ডাকবাংলোর সামনের space—টেবোর ও হির্নী falls এর সেদিনকার কথা মনে পড়চে। সেই অপূর্ব জ্যোৎস্নাময়রজনী। সামান্য একটু কাদা দেখা সবে দিয়েছে জল শুকিয়ে। আজ ভগবানের উপাসনা ও তর্পণ করে কি আনন্দ !৺হরি রায়ের নামে তর্পণ করি। সেদিন হিলি falls-এও জল দিয়েচি। খেয়ে ঘুমিয়ে গিরীনদার বাড়ি বলা বোষ্টমকে বড় বকি। বাঙাল মাসিমা এসেচে বহুদিন পরে। তিনুর সঙ্গে কুঠীর মাঠে জলার ধারে গিয়ে বসলুম। এর মধ্যে পোড়াহাট forest ঘুরে এলুম। পরেশবাবু যেন হেসাডি ডাকবাংলোতে পায়চারী করচে বারান্দায়। অপূর্ব শরতের সুগন্ধ গাছপালায়। ইন্দু রায় ও শ্যামাচরণদার বাড়ি গল্প। হরিপদদাও এসেচে। মানুদের বাড়ি গেলুম। তিনু কত রাত পর্যন্ত গল্প করলে আমার বোয়াকে।

৩রা অক্টোবর, ১৯৪৩। ১৬ই আশ্বিন, ১৩৫০। রবিবার। বারাকপুর—কলিকাতা

সকালে যুগলকাকার বাগানে সেই জায়গাটায় বেড়াতে এলুম। তারপর ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প। খেয়ে বেরুই। মল্ল মাস্টার বসে খাতা দেখচে, অনন্ত ভাদুড়ী সাইকেলে বনগাঁ থেকে ফিরচে। ১২টার ট্রেন ধরে কলকাতা। আমি আর ফণি রায়। নেমে বুদ্ধদেবের বাড়ি। বাজার করতে বার হই তখুনি। রাত্রে গোবিন্দ দাস নিয়ে বড় ঝঞ্ঝাট।

ন মে দ্বেষরাগৌ ন চ [মে] লোভমোহৌ মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ শ্চিদানন্দরূপঃ

শিবোহম্ [শিবোঽহং] শিবোহম্। [শিবোইহম্)

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌম্যং ন দুঃখং ন মন্ত্রো ন তীর্থো ন বেদা ন যজ্ঞাঃ, অহং ভোজনং নৈব, ভোজং ন ভোক্তা, চিদানন্দরূপঃ শিবোহম্, শিবোহম্ ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা, নমে জাতিভেদাঃ পিতা নৈবমাতা চ জন্মঃ

ন বন্ধু মিত্রং গুরু র্নৈব শিষ্যং শ্চিদানন্দরূপ শিবোহম্...

"চক্ষু বুজলে ঈশ্বর আছেন, চক্ষু খুললে কি নেই ?চক্ষু খুলেও দেখচি, সর্বভূতে তিনি। মানুষ জীবন্ত, গাছপালা, চন্দ্রসূর্যমধ্যে তিনি।"

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩। ১৭ই আশ্বিন, ১৩৫০। ঘাটশিলা

সকালে খিচুড়ি খেয়ে রওনা হয়ে M. C. ও মিত্র ও ঘোষ। মেলে মুকুল চক্কত্তি দাঁড়িয়ে আছে—পত্র দিলে। ৮॥০ টার সময় বাড়ি। জিনিসপত্র এনেছি—বহুদিন পরে সংসারের জিনিস কিনে এনেছি।

ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ না করলে ঘরের লোকের মতো কে শিক্ষা দিবে, কে জানিয়ে দেবে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, কে ধরায় পতিত দুর্বল সন্তানকে হাত ধরে তুলবে ?কে কামিনী কাঞ্চনাসক্ত পাশব স্বভাবের মানুষকে আবার পূর্ববৎ অমৃতের অধিকারী করবে ?তাই পরিত্রাণায় সাধুনাং [সাধূনাং]—মাঝে মাঝে তিনি দেহধারণ করে আসেন।

আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন, পদে পদে হয় পিতা চরণ স্খলন। রুদ্র সুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে, কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি ভীষণ। ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না রোষ। স্নেহবাক্যে বল পিতা কি করেছি দোষ। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং—তেন পানি মাং নিত্যং—

বাড়ি থেকে আধপো দূরে ধ্যানের জায়গা একটি করতে হয় নির্জন। মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ বড় দরকার। তবে সদসৎ বিচার হবে। অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই। তাদের প্রশ্ন করতে হয়।

৫ই অক্টোবর, ১৯৪৩। ১৮ই আশ্বিন, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে লিখি পড়ি। বিকালে বাণী রায়ের বাড়ি বসে জ্যোৎস্নায় কতক্ষণ গল্প। ওদিকে ফুলডুংরি পাহাড়। কত রাত পর্যন্ত রইলুম।

হৃদয় কমল মধ্যে নির্বিশেষং নিরীহং
হরিহর বিধি বেদ্যং যোগির্ভিব্যানগম্যম্। [।]
জন্ম মরণ ভীতি ভ্রংশি সচ্চিতু [স্বরূপং]
সকল ভুবন বীজং ব্রহ্মচৈতন্য মীড়ে। [।।]

রামকৃষ্ণ—

সংসার গহন, সংসার গহন কর কেন। কি ভয় ?তাঁকে ধর। কাঁটাবন হলেই বা। জুতো পায়ে দিয়ে চলে যাও। কিসের ভয় ?যে বুড়ি ছোঁয়, সে কি আর চোর হয় ?প্রেমভক্তি বস্তু, আর সবঅবস্তু।

যে বুদ্ধিতে টাকা হয়, বাড়ি হয়—সে বুদ্ধি চিঁড়েভেজা বুদ্ধি। যে বুদ্ধিতে ঈশ্বর লাভ হয়, তাই ঠিক বুদ্ধি।

৬ই অক্টোবর, ১৯৪৩। ১৯শে আশ্বিন, ১৩৫০। বুধবার।

এদিনও সকালে পড়ি লিখি। পায়ের ব্যথা বলে কোথাও যাই নি। তবে বিকেলে বাণী রায়এল আমাদের বাড়ি—পৌঁছে দিতে গেলুম।

চার রকমের জীব আছে, সবারই এক অবস্থা নয়। বদ্ধ জীব, মুমুক্ষু জীব, মুক্ত জীব, নিত্য জীব। সকলকে সাধন করতে হয় না—নিত্যসিদ্ধ আর সাধনসিদ্ধ। কেউ জন্ম অবধি সিদ্ধ।

জ্ঞানী কে ?যে কারো অনিষ্ট করতে পারে না। বালকের মতো হয়ে যায়। হয়তো বাড়িতে খুব ঐশ্বর্য। আবার সব ফেলে কাশী চলে যাবে। আঁট নেই কিছুতেই।

বিজ্ঞান = বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান। যে দেখেছে সে জ্ঞানী। যে খেয়েছে, সে বিজ্ঞানী। ঈশ্বরদর্শন করে তাঁর সহিত আলাপ, যেন তিনি পরমাত্মায়—এর নাম বিজ্ঞান।

সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। ঈশ্বর ভক্তবৎসল।

নির্জনে কিছুদিন ঈশ্বরচিন্তা করা ভালো। নানা জিনিস থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাঁতে লাগাতে হয়। হাব্‌জাগোব্‌জা বিদ্যার কি দরকার ?

Mo (?) J.S. Mills and Ramkrishna.

"তাঁকে কি বুঝা যায় গা ?আমিও কখনো তাঁকে ভাবি যেন, কখনো মন্দ। তাঁর মহামায়ার ভিতর আমাদের রেখেচে। কখন তিনি হুঁস্ করেন, কখনো অজ্ঞান করেন।

যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণই সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু রোগশোক। দেহেরই এসব, আত্মার নয়। দেহের মৃত্যুর পর তিনি হয়তো ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্চেন। যেমন প্রসববেদনার পর সন্তানলাভ। আত্ম জ্ঞানলাভ হোলে সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু স্বপ্নবৎ বোধ হবেই"

—রামকৃষ্ণ ।

৭ই অক্টোবর, ১৯৪৩। ২০শে আশ্বিন, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

আজ নীরোদবাবু ও বিশ্বাস এল। চা পার্টি দ্বিজুর ওখানে। ডাঃ আড্ডি ইত্যাদি—নবাব সাহেব। থিয়েটার হল দুর্গাপূজাতলায়। খুব আমোদ, খুব জ্যোৎস্না।

৮ই অক্টোবর, ১৯৪৩। ২১শে আশ্বিন, ১৩৫০।শুক্রবার।

সারাদিন শুয়ে বই পড়ি। সন্ধ্যায় নুটুরা গেল থিয়েটার করতে। বাণী রায় এল দ্বিজুবাবুর বাড়ি—আমি গোপালকে সঙ্গে নিয়ে মুকুলদের বাড়ি গিয়ে বসলুম। থিয়েটার হবার কথা, হল না।

"Fool ! you know not the secret—the infinite one comes within my fist under the bondage of love."

-Vivekananda's letter from New York.—

৯ই অক্টোবর, ১৯৪৩। ২২শে আশ্বিন, ১৩৫০। শনিবার।

আজ বিজয়া দশমী। দ্বিজুবাবুর বাড়িতে সম্মেলন হল। আমি বাণী রায়কে এগিয়ে দিতে গিয়ে সেখানে অনেকক্ষণ দেরী করলুম। ফিরে এসে নীরদবাবুকে নিয়ে এলুম বাড়িতে। বেশ জ্যোৎস্না, নবাব সাহেব, Prof. বিশ্বাস, নীরোদবাবু, মি. ভট্‌চায [,] মিসেস দাশগুপ্ত ও বিশ্বাস সবাই ছিলাম। বাড়িতেও অনেকে এল।

১০ই অক্টোবর, ১৯৪৩। ২৩শে আশ্বিন, ১৩৫০। রবিবার।

সকালে উঠে লিখি পড়ি। সন্ধ্যায় মুকুলদের বাড়ি ও বাণী রায়দের বাড়ি গিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রে বহু গল্প করি। বেশ লাগল।

যখন শুদ্ধাভক্তি—কোনো কামনা থাকবে না। সেই ভক্তি দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়। কর্মফল ভক্তের কাছে ঘেঁষে না। তাতে মত্ত হলে অসৎ বুদ্ধি পাপ বুদ্ধি চলে যায়। অহং বুদ্ধি চলে যায়।

ভক্তির তমো আনতে হয়। যে বলে আমার হবে না, তার হয় না। যে বলে আমার নিশ্চয়ই হবে—তার হয়। যে বলে—ভগবানের নাম করেচি, মুক্তি হবে না কি ?নিশ্চয়ই হবে। তার হয়ে যায়।

১১ই অক্টোবর, ১৯৪৩। ২৪শে আশ্বিন, ১৩৫০। মোমবার।

সকাল থেকে বাড়িতেই থাকি। রামানন্দবাবুর স্মৃতিবাসরে বিকেলে বক্তৃতা করি। সুরেনবাবুর বাড়ি 'প্রভাতী'তে গিয়ে বসি। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে। দুটি ভদ্রলোক সেখানে বসে গল্প করচে। আমার মনে উঠচে, এমনি জ্যোৎস্নারাত্রে রাইপুর থেকে বাসে ১৮৪ মাইল গিয়ে বনভূমি ও শৈলশ্রেণীর মধ্যে গোদাবরীর তীরে কোনো নির্জন স্থানে শিলাসনে বসে চিন্তা করি।

জ্যোৎস্নারাত্রে ফুলডুংরির নীচে গিয়ে বসি অনেকক্ষণ। ফিরে দ্বিজুবাবুর ওখানে বসি। নুটু এসেচে। তার সঙ্গে গল্প করি।

ঠিক ভক্তের ধারণা শক্তি হয়। শুধু কাঁচে ছবি ওঠে না—ভক্তিরূপ কালি মাখানো চাই। ঠিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হয়।

অনেকে জগতের সৌন্দর্যই দেখে—কিন্তু কর্তাকে খোঁজে না। ঠিক ঠিক বিশ্বাস চাই তা' হলে রত্ন মেলে।

ভক্ত যেমন ভগবান ভিন্ন থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত ছাড়া থাকতে পারে না। ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান হন ভ্রমর। বিচারের কথা ভক্তদের শুনতে নেই। ভক্তির পথ সহজ। ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে ভক্তির উপদেশ দেন। তিনি লীলা করচেন [—] তিনি ভক্তের অধীন। তিনি ভক্তবৎসল।

১২ই অক্টোবর, ১৯৪৩। ২৫শে আশ্বিন, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে নুটু ধলভূমগড় চলে গেল। আমি বসে লিখচি—দুলা সাঁওতাল নিমের ডাল দিয়ে গেল দাঁতন করবার জন্যে। রামকৃষ্ণদেবের জীবনী পড়ি। মি. ঘোষ ও মিসেস ঘোষ এবং মালয় উপদ্বীপের মেয়ে মিসেস ঘোষ—অনেকদিন সিঙ্গাপুরে ছিল। বিকেলে তুলসী কুটিরের গাঙ্গুলি দেখা করতে এল। দ্বিজুবাবুর বাড়ি গল্প করলুম রাত ৮॥ টা পর্যন্ত। তারপর কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠল চতুর্দশীর। হন্‌হন্‌ করে বেড়াতে গেলুম ফুলডুংরি। বুরডির পাহাড়ের দিকে জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া শৈলমালা ও বনানীর ওপরের আকাশে একটি নক্ষত্র টিপটিপ করে জ্বলচে—ভগবানের ধ্যানে মন আপনাতে আপনি নিবিষ্ট হয়ে গেল। জ্যোৎস্না ঝরে পড়চে যেন পাহাড়ের শালচারা বেয়ে। আর কি নির্জনতা ! কতক্ষণ বসে রইলুম। সার্থক হল চতুর্দশীর জ্যোৎস্নারাত্রি আজ। বনবিহারীবাবুকে ডাকলুম। বলে—এত রাত্রে কোথা থেকে ?বল্লুম—ফুলডুংরি থেকে। কল্যাণী রেঁধে বসে আছে। বল্লে—মান্‌কু, এখন তুমি খাবে না ?মান্‌কু তুমি আমায় বকেছ। কেমন বলে ছেলেমানুষের মতো।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৩। ২৬শে আশ্বিন, ১৩৫০। বুধবার।

আজ লক্ষ্মীপূজা। সারাদিন বেরুইনি—পড়ি আর লিখি। সন্ধ্যায় দ্বিজুবাবুর বাড়ি গল্প করি ছেলেবেলায় বারাকপুরের কোজাগরী পূজার, সেই বাঁশবনের পথে সন্ধ্যায় শ্যামাচরণ দাদাদের বাড়ি থেকে লুচি ভাজা গন্ধ বার হওয়ার কথাটি বড় মনে হয়—সেই আনন্দ ! ত্রিশ বছর আগের সেই দিনগুলির কথা এখনো মনে করলে আনন্দ পাই।

দ্বিজুবাবুর বাড়ি বসে গল্প করে ফুলডুংরি গিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রে পাহাড়ের নীচে এক শিলাখণ্ডে কতক্ষণ বসে রইলুম। কাছে ছোট ২ কেঁদ গাছের চারা। ভগবানের উপাসনা এখানে নীরব। মোহনবাবুর বাড়িতে কাপড়ের খোঁজ করলুম—মোহনবাবু নেই। ফিরে এসে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গল্প করি।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৪৩। ২৭শে আশ্বিন, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

আজও বসে লিখি। তারপর বিকেলে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গেলুম। সেখান থেকে মোহনবাবুর বাড়ি থেকে কাপড় আনতে যাই। গিরিনবাবুর বাড়ি থেকে সবাই ফুলডুংরির ওপাশে Picnic করতে যাচ্চে। হরিপদবাবু গাইয়ে আছে—যে মুকুলের বোন বুয়াকে গান শেখায়। আমি দ্বিজুবাবুর বাড়ি এসে বসলুম, পথে এক শীর্ণ বালকের সঙ্গে দেখা, তার নাম নকুল দাস। সিগন্যালের কাছে সে মহিষ চরাচ্ছিল। বল্লে—খেতে পাইনে। তাকে দ্বিজুবাবুর বাড়ির সন্ধান বলে দিলাম—কারণ উনি বলচেন রান্নার লোকের অভাবে তিনি খেতে পান না। দ্বিজুবাবুর বাড়ি বসে গল্প।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৩। ২৮শে আশ্বিন, ১৩৫০। শুক্রবার।

আজ বেলা দশটা থেকে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি। তখন আমি সবে দ্বিজুবাবুর বাড়ি থেকে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'খানা এনে নীরদ চৌধুরীর প্রবন্ধটি পড়চি। সেই বৃষ্টি মাথায় পুকুরে নেয়ে আসবার সময় বজ্রের গর্জনে বড় আনন্দ হল। ভগবানের নাম ও উপাসনা বাঁধে কতক্ষণ করা গেল একগলা জলে দাঁড়িয়ে তখন ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি পড়চে আর মুহুর্মুহু বজ্র গর্জন করচে। বৃষ্টি আর থামে না—সন্ধ্যার দিকে বের হলুম কিন্তু বৃষ্টি একটু থেমেই আবার সুরু। দ্বিজুবাবুর বাড়ি নকুল দাস বলে সেই ছোকরাটি আবার কাজে বহাল হয়েচে।

কল্যাণী খিচুড়ি রেঁধেছিল—তাই বেশ করে খাওয়া গেল।

'দেবযান' আজ পুনরায় লেখা আরম্ভ করলুম। সতীশকাকাকে বনগ্রামে আজ পত্র দিলুম বিজয়ার। আজ বনগ্রামে আমার অভিনন্দন। কিন্তু তাদের কোনো পত্র দেওয়া বা যাওয়া হল না।

১৬ই অক্টোবর, ১৯৪৩। ২৯শে আশ্বিন, ১৩৫০। শনিবার।

সকালে 'দেবযান' যতীনের মার কাছে ম্যালেরিয়া অবস্থায় জ্বর ফিরে আসা পুষ্পকে নিয়ে—সেই অধ্যায় লিখি। শচীন এসে বল্লে দুপুর বেলা মি. লাহিড়ী এসেছিলেন—তাই সন্ধ্যার আগে গেলুম ডাকবাংলোতে। অনেকক্ষণ বসে রইলুম, ডাকবাংলোর চাকর ইতিমধ্যে এসে রংকিনী দেবী ও ধলভূমস্টেটের গল্প বল্লে। অনেক মদ্যপায়ী ও কুক্রিয়াসক্ত রাজা রাজত্ব করেচেন। ওখান থেকে উঠে মুকুলের বাড়িতে চা খেলুম। মেল ও প্যাসেঞ্জার চলে গিয়েচে। আজ মৌভাণ্ডারে থিয়েটার হচ্চে—আমায় নেমন্তন্ন করেচে। কিন্তু যাওয়া হল না। মি. লাহিড়ী বাংলার দুর্ভিক্ষের ভীষণ চিত্র আঁকলেন আমার মানস চক্ষুর সামনে ওঁর কলকাতার রাস্তায় ভিক্ষুকদের বর্ণনার মধ্যে। মন খারাপ হয়ে গেল বড্ড। সব যেন বিস্বাদ লাগচে। দ্বিজুবাবুদের বাড়ি ওর নানী ও নাৎজামাই এসেচে। নুটু দেখি এসেচে ও গুট্‌কে। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প। কল্যাণী শুয়ে বলে—মান্‌কু, একটা গল্প বলো। রোজ এমনি বলে।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৩। ৩০শে আশ্বিন, ১৩৫০ রবিবার।

সকালে নুটুর সঙ্গে চা খেয়ে গল্প করি। সে মোটরবাইকে ধলভূমগড়ে চলে গেল। আমাকে দ্বিজুবাবু ডেকে পাঠালেন বিপিনকে দিয়ে। তার নাতনী এসেচে—খুব খাওয়ালেন ঝাড়গ্রামের পান্তুয়া, মিহিদানা। তারপর মোটরে যাবার কথা বল্লেন ভট্‌চাজ সাহেবের ওখানে। ধর মহাশয় 'উদ্বোধন' দিয়ে গেল। স্নান করে মোটরে চলে গেলুম ভট্‌চাজ সাহেবের ওখানে। পথে হাটে গিয়ে দেখি জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য। ভট্‌চাজ সাহেবের বাড়ি নীরদবাবু, দীপু, গদাই, প্রোঃ বিশ্বাস, মিসেস বিশ্বাস, মিস পরিমল দাস—সবাই মিলে আড্ডা। ওরা আমার ছড়ি কেড়ে নেবেই। অতি কষ্টে আদায় করলুম। সন্ধ্যায় নীরদবাবু বেলুড়ের পুরোনো দিনের কথা বল্লেন। হেঁটে চলে আসি। নুটুর সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত কত গল্প।

বিবেকানন্দ

"পাহাড় ও বরফ দেখলে আমার মনে এক অপূর্ব শান্তিময় ভাব আনে।"

আমার আসে পাহাড় ও বন ঝরনা দেখলে।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৪৩। ১লা কার্তিক, ১৩৫০ সোমবার।

'উদ্বোধন' পড়তেই দিন গেল। বিশ্বময় বিশ্বপুরুষের আলিঙ্গনের মধ্যে আমরা বাস করচি। জীব বা ব্যক্তিগত পুরুষ প্রকৃতির গুণাত্মক ক্রিয়াসকলের দ্বারা বলপূর্বক আকর্ষিত হয় এবং প্রকৃতির গুণসমূহের আকর্ষণ তাহাকে অবিরত নানা জন্মের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়, সেখানে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অবস্থা বিপর্যয়, প্রকৃতির মধ্যে জন্ম গ্রহণের শুভ ও অশুভ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু ইহা হইতেছে পুরুষের কেবল বাহ্যিক অনুভূতি। এই দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন প্রকৃতির ও আমাদের ভগবান পরমাত্মা, পরমপুরুষ প্রকৃতির মহান পুরুষ। তিনি প্রকৃতির কার্য সকল সাক্ষীরূপে দর্শন করেন মাত্র। প্রকৃতি যে তাহারই নিজেরই সত্তায় নানা সৃষ্টি করিয়া খেলা করিতেছে—নিজের বিশ্বগত আনন্দ দিয়া তিনি তাহা উপভোগ করেন। এই যে আত্মজ্ঞান—আমাদের মনকে ইহাতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই আমরা অন্তরস্থিত ভগবানকে প্রকৃতভাবে জানিতে পারিব। এই জ্ঞানের আগমন হয় আভ্যন্তরীণ ধ্যানের দ্বারা। যত আমরা সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত আত্মার দর্শন করি—ততই আমরা সেই আত্মার সমতায় প্রতিষ্ঠিত হই। যতই আমরা এই শাশ্বত পুরুষকে অবগত হই, ততই আমরা নিজেদের শাশ্বত ভাব পরিগ্রহ করি ও চিরন্তন হই। আমাদের বর্তমান মানসিক ও শারীরিক প্রকৃতির মধ্যে আমাদের যে সীমাবদ্ধতা সেটা অন্ধকারের ভ্রান্তিমাত্র। এই উপলব্ধিই নিম্নতর প্রকৃতির ধর্ম হইতে আত্মার পরম পদে লইয়া যায়। সেই মহিমময় সমুচ্চ পরিবর্তনই শেষ রূপান্তর, দিব্য ও অনন্ত বিবর্তন, মর প্রকৃতিকে পরিহার করা।

বিকেলে নবাবসাহেবের গাড়িতে গালুডি গিয়ে হেলিওডোরাসের গল্প পাঠ করি। বৌঠাকুরানী খাওয়ালেন মাংস ও রুটি। সুবর্ণ দেবীও খাওয়ালেন। ভীষণ বৃষ্টি এল—সারা রাতবৃষ্টি।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৪৩। ২রা কার্তিক, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

পরদিন উঠে পড়ি ও লিখি। বৈকালে স্বামিজীর সঙ্গে ফুলডুংরি বেড়াতে গিয়ে বসি ও অনেক গল্প করি। ফুলডুংরি বড় চমৎকার লাগল।

২০শে অক্টোবর, ১৯৪৩। ৩রা কার্তিক, ১৩৫০। বুধবার।

আজও সকালে লেখাপড়া করি। সত্যবাবু ও কয়েকটি মাস্টার এল দেখা করতে। বিকেলে একা সেই জঙ্গলের মধ্যে পূর্ব পরিচিত শিলাখণ্ডে গিয়ে বসি—জঙ্গল খুব ঘন হয়েচে। অপূর্ব শোভা রাঙারোদমাখা শালবন ও অদূরবর্তী শৈলমালার। এ শোভা সত্যই অতুলনীয়। ভগবানের উপাসনাএখানে যেন এই অপূর্ব সৌন্দর্যের রূপ ধরেছে। ফিরবার পথে মেদিনীপুরের বিশুবাবুর সঙ্গে আলাপ হল দ্বিজুবাবুর বাড়িতে।

২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩। ৪ঠা কার্তিক, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

সকালে লিখচি চিত্ত রায়ের গাড়ি এসে দাঁড়াল দ্বিজুবাবুর বাড়িতে। চলে গেল নুটু। একটু পরে এল সুবোধ ঘোষ। সে স্নান করলে ও খেল। তার সঙ্গে চলে গেলুম বেঁদ—ভুলং নদী পার হয়ে। দুবরাজপুর বলে একটি সুন্দর স্থানে রাজকাছারিতে বসে রইলুম—সেখান থেকে ফিরে এসে দেখি হেমন্ত চাটুয্যে এসে রয়েছে ওর নিজের বাড়িতে। হরানন্দবাবুর বাড়িটা সবচেয়ে চমৎকার। ওখান থেকে বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে চা-পার্টি শেষ করে—সেখানে এল ডাঃ চ্যাটার্জি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক ও লেফটেনান্ট বোস রাখামাইন্‌স্‌ থেকে। চা খেয়ে লাইব্রেরি গেলুম রাজবাড়ির। তারপর গালুডি গিয়ে Prof. বিশ্বাসের বাড়িতে কিছুক্ষণ বসে গল্প করি। চলে আসতে পথে নবাবের গাড়িতে নীরদবাবুরা যাচ্চে—আমরা পথে ডাকাতের মতো গাড়ি থামালুম। সাঁকোর পাশ ভেঙে একটা মিলিটারি গাড়ি পড়ে গিয়েচে—তার আলোটা জ্বলচে। আমায় সুবোধ নামিয়ে দিয়ে গেল দুর্গামণ্ডপের কাছে। দ্বিজুবাবুর বাড়ি আড্ডা দিয়ে ফিরলাম।

২২শে অক্টোবর, ১৯৪৩। ৫ই কার্তিক, ১৩৫০।শুক্রবার।

সকালে উঠে লিখি। সুবোধ এল স্নান করতে যাওয়ার সময়ে। আমার সঙ্গে দেখা হল না। সিনহার চিঠি এল সারেন্ডা বনে ভ্রমণ করবার সাদর নিমন্ত্রণ। বনগ্রামে অভিনন্দন দিয়েচে আমার ফটোর সামনে, কাল যেন আমি নিশ্চয়ই সেখানে যাই। মধুস্মৃতি সভা। নীরদ দাশগুপ্ত ও সুবর্ণ দেবী এলেন—যখন বসে লিখচি। মিসেস দাসের সঙ্গে ওরা বেড়াতে গেল বড় কূর্ম শিলায়। তারপর দ্বিজুবাবুর বাড়িতে মনীষী রোমা রোল্যাঁর একটি শোকসভা আহুত [আহূত] হল। আমি বক্তৃতা দিলাম। তারপর জলযোগ হল। নুটুর সঙ্গে বসে গল্প করি অনেকক্ষণ। তারপর ছুটি।

২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৩। ৬ই কার্তিক, ১৩৫০। শনিবার।

আজ সকালে উঠে বনগাঁয়ে যাবো বলে বেরুলাম। স্টেশনে গিয়ে মেল ধরতে হবে। কিন্তু গিয়ে শুনি মেল ২ ঘণ্টা লেট। ফিরে মুকুলদের বাড়ি চা খেলুম। ডাকঘর থেকে 'অভিযান' কাগজ দিলে। তারপর চলে এলুম বাড়ি। লিখি বসে—এক রায় বাহাদুরের অনেক টাকা—অর্থের পরিণাম ব্যসনবিলাস। শরীরের ঘরকন্না ভালো। সন্ধ্যায় কল্যাণীকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে গল্প করি। ও বলে—বুড়ো, আমার বুড়ো—বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হয়েচে আমার। 'যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে'—এই গানে ভগবানের উপাসনা করি দুজনে—তারপর পাথরের ওপরে দুজনে বসি কতক্ষণ, নীচে জল। অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে কষ্টে এলুম পড়ে যেতে যেতে—একবার ও আমায় ধরে, একবার আমি ওকে ধরি।

দ্বিজুবাবুর বাড়িতে গল্প করি। ডালপুরী ভেজেচে হিং দিয়ে। আমায় এনে দিলে। নুটুর সঙ্গে গল্প। ওরা 'দুইপুরুষ' মহড়া দিচ্চে 'মাতৃধামে'।

২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৩। ৭ই কার্তিক, ১৩৫০। রবিবার।

এদিন নুটু রয়েচে। লিখিও 'স্বপ্ন বাসুদেব' গল্পটি পুনর্লেখনে ব্যয় করি অধিকাংশ দিন। বৈকালে দোকানের জিনিসপত্র মাপের জন্য কিনতে গিয়েচি—রাস্তা দিয়ে সত্যবাবু মাস্টার ও স্বামিজী যাচ্চে। আমায় দেখে দাঁড়িয়ে গল্প করে গেল। মংলা ও রাজেন দোকানের জিনিস নিয়ে এল। নুটুর সঙ্গে বসে গল্প করি রাত্রে।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩। ৮ই কার্তিক, ১৩৫০। সোমবার। ঘাটশিলা—কলিকাতা

সকালে উঠে রাজেনের সঙ্গে স্টেশন। বম্বে মেল ধরে কলকাতা। মিত্র ও ঘোষ ও M.C.তে বসে গল্পগুজব করে কাত্যায়নী বুকস্টলে ও D.M.-এ। হরিপদদার ওখানে গিয়ে দেখি সাতুকাকা ও হরিপদদা বিষণ্ণ ও গম্ভীর মুখে বসে। শুনলুম, নলিনী দিদির বড় ছেলে খ্যাঁদা মারা গিয়েছে কাল রাত্রে। হরিপদদা'র সঙ্গে গ্রামে ধান হওয়া সম্বন্ধে কথাবার্তা

অনেক হল। বারিকের সঙ্গে ভাগে যে জমি, তাতে ধান ভালো হয়েচে। সেখান থেকে উঠে বুদ্ধদেবের বাড়ি এসে দেখি রমেশবাবু বসে। তারাপদবাবু এল একটু পরে। বেশ আনন্দে গল্পগুজব সারারাত্রি বুদ্ধদেবের সঙ্গে—

২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৩। ৯ই কার্তিক, ১৩৫০। মঙ্গলবার। কলিকাতা

সকালে স্নান সেরে চা খেয়ে বার হই রমেশ ঘোষালের সঙ্গে। পরিমল গোস্বামীর বাড়ি হয়ে দেব সাহিত্য কুটিরে এসে সুবোধবাবুদের কাছে আমার ছোট গল্পগুলির কপি ও ফাইল নিই। তারপর M.C., বাতায়ন ও মিত্র ও ঘোষে সারাদিন কাটাই। কাত্যায়নী বুকস্টলেও এলুম—ওখান থেকে All India Radioতে এসে কমলের কথায় ৫টার সময় বক্তৃতা দিই। টাকা নিয়ে ট্রামে চলে এলুম। আবার M.C.। শিবরাম এল, তার সঙ্গে জ্ঞানবাবুর দোকানে চা খেয়ে চলে এলুম বুদ্ধদেবের বাড়ি আসবার পথে পরিমলের ওখানে। 'মাতৃভূমি'র হেমেন্দ্রবাবুর লোকের সঙ্গে দেখা। বাড়ি গিয়ে দেখি রমেশবাবু বসে। খুব আড্ডা।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৩। ১০ই কার্তিক, ১৩৫০। বুধবার। কলিকাতা—ঘাটশিলা

সকালে উঠে চা ও ভাত খেয়ে রমেশবাবু ও বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা। তারপর চার্বাকদর্শন আলোচনা। উঠে অপূর্ববাবুর বাড়ি ও গলির মধ্যে দিয়ে M.C. ও মিত্র ঘোষ। ওয়াভেল সাহেব কাল কলিকাতায় ছদ্মবেশে বেড়িয়ে ক্ষুধার্ত নরনারীদের দেখেচেন শুনলুম। ওদের করুণ আর্তনাদ কলকাতার বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলেচে। কিছু ভালো লাগে না। বাংলার অবস্থা কি করুণ, কি ভীষণ, চোখে না দেখলে তা বোঝানো যাবে না। ঘাটশিলা আসবার সময় প্রত্যেক স্টেশনে উলঙ্গ, কঙ্কালসার নরনারীর ভিক্ষার জন্য কাতর প্রার্থনা— এ দৃশ্য আর কতকাল সহ্য করতে হবে ?হাহাকারে চারিধার যে পূর্ণ হয়ে উঠল। মানুষ মরে পাহাড় হয়ে যাচ্চে। মি. মার্টিন বলে এক এ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুবক বেশ বাংলা বলে, তার স্ত্রীও এসেছিল তাকে তুলে দিতে। ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে এলুম সারা পথ। 'Set in Diamond'বলে একখানা উপন্যাস ওর কাছ থেকে নিয়ে পড়তে পড়তে এলুম। কাপড়, ময়দা কিনে এনেচি। বৌমা ও কল্যাণী তুললে। এসে অমরবাবুর পত্র পেলুম।

২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৩। ১১ই কার্তিক, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়ি। আজ কালীপূজা—কিন্তু কোথাও বেরুই না। সন্ধ্যার সময়ে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি নুটু এসেচে। ওর সঙ্গে গল্প করি, ও সন্ধ্যার আগেই চলে গেল গুট্‌কেকে নিয়ে সাইকেলের দোকানে। সন্ধ্যা হবার দেরী নেই—ধর মশায়ের সঙ্গে বসে কূর্ম শিলায় দুজনে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করি। তারপর দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৩। ১২ই কার্তিক, ১৩৫০। শুক্রবার।

আজ সকালে সুরেশ রায় মশায় এসে 'আশাবতীর উপাখ্যান' দিয়ে গেলেন। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী পড়ি। নুটু এল বিকেলে, আজ হোলির ছুটি। দুজনে কূর্ম শিলায় গিয়ে বসি। অপূর্ব শোভা হয়েচে আকাশের। গুটকেও এসেচে—ফণি কাকার পত্র এসেচে বেলা বোষ্টমের মোকর্দমার জন্যে আমায় নাকি যেতে হবে বারাকপুরে। নুটুর সঙ্গে রাত্রে গল্প করি।

৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৩। ১৩ই কার্তিক, ১৩৫০। শনিবার।

সকালে নুটু চা খেয়ে চলে গেল। আমি লিখি পড়ি ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী। বিকেলে বুয়াদের বাড়ি দিয়ে দেখি মুকুলের জ্বর। অনেকক্ষণ বসে থাকি।

৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৩। ১৪ই কার্তিক, ১৩৫০। রবিবার।

সকালে 'দেবযান' লিখি। অনুকূলবাবুর ও কানু মামার ও দিল্লি থেকে অপূর্বমণি দত্তর ছেলের চিঠি এল। হাট করতে গেলুম রাজুকে নিয়ে—আজ মেঘাচ্ছন্ন দিনটি। প্রফুল্ল ঘোষের সাঁতার দেখতে গিয়ে গুঁপো গোপাল, সত্যবাবুর সঙ্গে গল্প করি বাঁধের পাড়ে বসে। বুয়াদের বাড়ি গিয়ে সুনীতিদির বোনের স্বামী শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। নুটু এসেচে বাড়িতে—গল্প করি অনেকক্ষণ। ওই যে পাথরের জায়গাটা ওখানে সকালে যাই বেড়াতে।

১লা নভেম্বর, ১৯৪৩। ১৫ই কার্তিক, ১৩৫০। সোমবার।

নুটু সকালে মোটরবাইকে চলে গেল। আমি লিখি ও পড়ি—'দেবযান' প্রায় শেষ হল। বিকেলে শচীনের সঙ্গে ফুলডুংরি পাহাড়ের ওদিকে কোম্পানির সেই গাঁথুনিটাতে বসে রইলুম অনেকক্ষণ। তৃতীয়ার চাঁদ উঠেচে—নক্ষত্রভরা আকাশ, কাছের

পাহাড়টা, দূরের বনানী সব চমৎকার দেখাচ্ছিল অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ! দ্বিজুবাবুর বাড়ি বসে গল্প করি সন্ধ্যায়। গুট্‌কে এসেচে প্যাসেঞ্জারে, তার পা ভেঙে গিয়েচে মোটরবাইক থেকে পড়ে ওবেলা। তার সঙ্গে গল্প করি অনেকক্ষণ।

২রা নভেম্বর, ১৯৪৩। ১৬ই কার্তিক, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে লিখি 'দেবযান' আশার শেষ কথা। বৈকালে কল্যাণী, উমা ও বৌমাকে নিয়ে বেড়াতে যাই ফুলডুংরি পাহাড়ে। তারপর যাই মুকুলের বাড়ি। পাহাড়ে গিয়ে কতক্ষণ বসি। বড় ভালো লাগে।

৩রা নভেম্বর, ১৯৪৩। ১৭ই কার্তিক, ১৩৫০। বুধবার।

আজ সকালে লিখি ও পড়ি। ফণি এল বিকেলে, অমরবাবুর ওখানে যাবো—পথে ব্রাউন সাহেব বল্লে—অমরবাবু আসেন নি, তাই ফিরে এলুম। এসে মুকুলদের বাড়ি বসে বর্মা ভ্রমণের গল্প শুনি।

সুন্দর জ্যোৎস্না।

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৪৩। ১৮ই কার্তিক, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

আজ 'দেবযান' লিখি আশার শেষ দৃশ্য। "বনে পাহাড়ে" "মৌচাকে" পাঠাই। বিকালে প্রজ্ঞানন্দ স্বামীর আশ্রমে গিয়ে বসে তাঁর গুরুর গল্প শুনি ও দুখানা বই আনি। কল্যাণী এখন কেওনঝড় স্টেটের domestic manager—মহারানীর সঙ্গে দিল্লি গিয়েচে।

ফিরবার পথে অপূর্ব জ্যোৎস্না। সেই সাদা Quartz পাথরের পাহাড়ে একা রাত ৮ ॥০ টার সময় অপূর্ব আনন্দে বসে রইলুম। মনে এক অদ্ভুত আনন্দের অবস্থা। এই জ্যোৎস্নায় আর ৪দিন পরে সারেন্ডা forest বেড়াতে যাবো। ভগবান তাঁর অসীম কৃপায় আমার সেই সুবিধে দিচ্চেন—আমি বন প্রকৃতি ভালোবাসি বলে। তাঁর কৃপাহস্ত স্পষ্ট এর মধ্যে অনুভব করলুম। জীবনেএরকম আমি আগেও অনেকের দেখেচি। জয় হোক তাঁর।

ফিরে দ্বিজুবাবুর বাড়ি কৃষ্ণ সরকারের মুখে শুনি অমরবাবু ২রা তারিখেই এসেচেন। ব্রাউন সাহেব কাল আমায় মিথ্যে বলেছিল।

৫ই নভেম্বর, ১৯৪৩। ১৯শে কার্তিক, ১৩৫০। শুক্রবার।

সকালে উঠি লিখি 'দেবযান'।'ত্রিকাল'-এর পত্র এল গল্পের জন্যে। বিকেলে অমরবাবুর সন্ধানে গিয়ে দেখি তিনি নেই। রেলপথ ধরে বনের মধ্যে একটা ভালো জায়গায় গিয়ে বসি। বড় বন। টিলাতে বড় কাঁকর ও চোঁচঘাস। ফিরে এলুম জ্যোৎস্নারাত্রে ফণিদের বাড়ি। সেখান থেকে বাড়ি। জ্যোৎস্নারাত্রে অনেকক্ষণ বাইরে বসি।

'এই ভালোবাসাই ভগবান। ভগবানই ভালোবাসা। প্রেমের কাঙাল তিনি। তুমি কি তাঁকে ভালোবাসতে পারবে ?ভালোবাসা আদি, ভালোবাসা অন্ত'।

নিগমানন্দকে গৌরী-মার কথা।

৬ই নভেম্বর, ১৯৪৩। ২০শে কার্তিক, ১৩৫০। শনিবার।

সকালে মাছ আনবার জন্যে গেলুম আসাইনগর ঘাট, তখনো তারা আছে আকাশে। সেখানে শৈলেনবাবুর সঙ্গে ফিরে এসে বুয়াদের বাড়ি চা খেলুম। তারপর বাড়ি এসে লিখি। নুটু এল— কোথাও বেরুইনি। নুটুর সঙ্গে গল্প করি।

৭ই নভেম্বর, ১৯৪৩ ২১শে কার্তিক, ১৩৫০। রবিবার।

আজ সকালে লিখি। বিকেলে সুরেন রায় মশায়ের বাড়ি বেড়াতে গেলুম। সেখানে জটেমারির নীলকুঠীর মালিক ৺লক্ষ্মণ আশের কন্যা সাবিত্রী আশের সঙ্গে দেখা। তিনি আবার কল্যাণীর মাস্টার ছিলেন ময়মনসিং বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুলে। মঙ্গলগঞ্জে কুঠীতে ওরা নৌকো করে যান। অনেকক্ষণ আনন্দ হল—চলে এলুম সকলেই। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে। আজ গজেন মিত্র blade পাঠিয়েচে কলকাতা থেকে। পাঠাতে লিখেছিলুম। ধর মশায় হরির লুট দেবে বলে যাচ্চে—সুরেন রায় মশায়ের ওখানে সংকীর্তন হবে।

৮ই নভেম্বর, ১৯৪৩। ২২শে কার্তিক, ১৩৫০ সোমবার।

আজ সকালে দ্বিজুবাবুর বাড়ি। নুটু চলে গেল ধলভূমগড়ে। বিকেলে লক্ষ্মণ আশের মেয়ে সাবিত্রী এলেন। জটেমারির কুঠীর লক্ষ্মণ আশ। তারপর আমি রাত্রে গুট্‌কে ও রাজুকে নিয়ে রওনা হই স্টেশনে। বড্ড শীত। নসিরাম যাচ্ছিল, দুজনে টাটাতে এসে উঠলুম চাঁইবাসার গাড়িতে। এসেই ঘুম।

৯ই নভেম্বর, ১৯৪৩। ২৩শে কার্তিক, ১৩৫০। মঙ্গলবার। চাঁইবাসা।

সকালে উঠে রাজ খর্সাত্তন স্টেশনে চা খেয়ে নিই। চাঁইবাসা মোটর আসতেই মি. সিনহা গাড়ি আনলেন। তার বাড়ি গিয়ে চা পান করি। তারপর এলুম সুবোধের আপিসে। দুপুরে উমেশ পাণিগ্রাহী বলে একজন উড়িয়া লেখক আলাপ করলে। অল্পবয়সের ছোকরা কিন্তু খুব প্রকৃতিভক্ত এই বয়সেই। সন্ধ্যায় রবীন্দ্র স্মৃতি ভবনে সভা। আমিই সভাপতি। কালী মিত্র, মি. সিনহা প্রভৃতি বক্তৃতা দিলেন—রমণী ঘোষালের কমিক ইত্যাদি হল।

১০ই নভেম্বর, ১৯৪৩। ২৪শে কার্তিক, ১৩৫০। বুধবার। চাঁইবাসা—গুয়া—কুম্‌ডি

সকালে রমণী ঘোষাল এলেন। আমরা চা খেয়ে লীলা বেলাদের বাড়িতে বেড়াতে গেলুম। সেখান থেকে ফিরে মোটরে বন ভ্রমণে বার হই। হাট গামারিয়া পরেশ সান্ন্যালের বাড়ি এলুম। তারপর অন্য পথে মোটর বেঁকে এল গুয়ার পথে। পথে জগন্নাথপুর বলে একটা গ্রাম, স্কুল হচ্চে। দূরে দূরে গুয়ার শৈলশ্রেণী। ক্রমে বন আরম্ভ হল। রাস্তা লৌহপ্রস্তর মেশানো মাটি—অমন টকটকে লাল হঠাৎ দেখা যায় না। ঘন বনের মধ্যে কারো নদী পার হয়ে গুয়াতে এলুম। একজনের বাড়ি চাখেয়ে অপূর্ব বনের পথে ২৬ মাইল এসে কুম্‌ডি বাংলোতে উপস্থিত। বনের মধ্যে কাঞ্চন ও পিটুনিয়া অজস্র ফুটে আছে। ঘন বনের মধ্যে বাংলোটি। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। কাছেই পার্বত্য কোইনা নদীর কুলুকুলু শব্দ বনের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসচে। জ্যোৎস্না উঠলে বনের মধ্যে কতদূর বেড়িয়ে এলুম। এই বনে ১৫০/১৬০ বছরের শালগাছ দেখলুম কত। জলের ওপর জ্যোৎস্না পড়েচে। ভগবানের সাধনভজনের স্থান বটে। অগ্নিকুণ্ডের কাছে বসে গল্প করবো।

১১ই নভেম্বর, ১৯৪৩। ২৫শে কার্তিক, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে চা খেয়ে তৈরি হলুম। শশাংদাবুরু উঠতে হবে আজ। মোটরে সুন্দর বনভূমির মধ্যে দিয়ে ৪ মাইল গিয়ে পর্বতের গায়ের পথ দিয়ে হাজার ফুট দুরারোহ সরু পার্বত্য পথ নিবিড় বনের মধ্যে উঠে গিয়েচে। বন্য পিটুনিয়া ও কাঞ্চন ফুল ফুটে আছে বনে। মধ্যের উপত্যকাগুলি ঘন বন ও মোটা মোটা লতায় ভর্তি। এক জায়গায় বনে বন্য কলাগাছ হয়ে আছে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মতো। বেলা ১২।।০ টা, এখনো রোদ পড়ে নি বনে। এক জায়গায় বাড্ডা(?)নালা বলে ঝরনা ওপর পাহাড় থেকে পড়চে। সেই ঘন, নিবিড় অরণ্যে ছায়ায় পাহাড়ি ঝরনার কুলুকুলু শব্দ কি চমৎকার। কত রকমের পক্ষীকুলের সুমধুর কলতান। ওপরে উঠে একটা সমতল মালভূমির মধ্যে একটা ছোট্ট পুকুর। কাদায় বন্য বরাহ, হস্তী, সম্বর, বাইসন প্রভৃতির পদচিহ্ন। এক জায়গায় ছায়ায় বসে চা পান করলুম ও এই ডায়েরি লিখচি। বেলা ৪টা। ভগবানকে ধন্যবাদ, এই সুন্দর স্থান দেখবার সুযোগ আমায় দিলেন। কেলিকদম্ব পানজন, করম, ধ, শাল [,] আসন, লচা, বন্য চিরেতার ফুল ফুটেচে। আসবার সময়ে কি অদ্ভুত বনের দৃশ্য ! এক জায়গায় লুদাস বলে একটা গাছে বনের ফুল ফুটেচে। তাও অতি সুন্দর। মাঝে মাঝে দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকি, ঘন অরণ্যে শৈলসানুতে দাঁড়িয়ে আছি। ঝরনা পড়চে ঝর ঝর করে। সেই কলাগাছ। গুয়া থেকে ১৩ মাইল। আসবার সময় মোটর থেকে হাতি দেখলুম। barking deer-এর ডাক শুনলুম বনের মধ্যে। জ্যোৎস্নায় কোইনা নদীর ধারে বেড়াতে গেলুম।

১২ই নভেম্বর, ১৯৪৩। ২৬শে কার্তিক, ১৩৫০।শুক্রবার। কুম্‌ডি—থলকোবাদ

সকালে উঠে চা আনতে চাইচে বাবুর্চি। দোর খোলা নেই দেখে দোর খুললুম। তারপর কুলদা ব্রহ্মচারীর বই পড়ি। বাগানে অনেক কমলালেবুর গাছে লেবু ঝুলচে। ডিডো বলে Mrs. (?) Warren-এর এক কুকুরের কবর। বনের পথে কোইনা নদী পার হয়ে এলুম থলকোবাদ। কুইলাবাদ বলে এক জায়গায় একটা পুরোনো কুটিরে মি. সিনহা থাকতেন—সেটা একেবারে বনের গায়ে। থলকোবাদ চমৎকার জায়গা। আমরা চা খাচ্চি বাংলার সামনে বসে বিকেলে, নিকটের শৈলারণ্যে ময়ূর ডাকচে, সন্ধ্যায় বেড়াতে বার হয়ে বনের মধ্যে গিয়ে বসলুম। ঘন বন, ঝিঁঝি [ঝিঁঝিঁ] ডাকচে, সর্বত্র বন্যহস্তীর ভয়—অন্ধকারে সাবধানে অগ্রসর হই। দুজন লোক আসচে বালুজুড়ি থেকে—৫ ক্রোশ দূরে বোনাই স্টেট্ থেকে চাল নিয়ে। গাড়োয়ানেরা এসেচে সেরাইকেলা থেকে কাঠ নিতে—ওদের নাম বিস্‌রা, লব (?)মাহাত ও নিশা। পূর্ণচন্দ্র উঠল বনের মধ্যে—শৈলারাণ্য পরিপ্লাবিত হয়ে গেল হৈমন্তী পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্নায়। বড্ড শীত, আমরা এসে বাংলোতে বসলুম। জ্যোৎস্নারাত্রে বেড়াতে গেলুম গভীর রাত্রে। বনে জঙ্গলে পাহাড়ে বিশ্বরূপের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে মন মুগ্ধ হয়ে

গেল। সেই জায়গাটিতে বুনো হাতি তাড়াবার একটা মাচান আছে। রাত্রে সম্বর ও হরিণ ডাকচে। barking deerও ডাকচে।

১৩ই নভেম্বর, ১৯৪৩। ২৭শে কার্তিক, ১৩৫০। শনিবার। থলকোবাদ

সকালে উঠে চা খেয়ে বনের পথে রওনা হই। মোটর থেকে নেমে পায়ে হেঁটে উঁচু নীচু পথে বনের মধ্যে দিয়ে কতদূর গেলুম। কায়াউলি ও রাতিয়াব ঝরনা পার হয়ে কোইনা নদীর ধারেএসে বসলুম। কি ঘন ও সুন্দর বন এই কোইনা নদীর ধারে। আমি গাছতলায় বসে দেখচি শুধু আলোছায়ার খেলা, শুনচি অজস্র বিহঙ্গ কলতান ও ভগবানের নামে ধন্যবাদ দিচ্চি। East adrift in the Wild বলে একটা প্রবন্ধ পড়চি blackwoods magazineএ। এ বনের মধ্যে বসে দক্ষিণ আমেরিকার বনবর্ণনা বেশ লাগছে। কোইনা নদীর আর একটা স্থানে বসে আমরা কমলালেবু খেলুম। বনের মধ্যে কামিনী ফুলের গাছ, দেবকাঞ্চন ফুলের কি বাহার ! শৈলসানু আলো করেচে। আর এক রকমের হলদে চমৎকার ফুল। বেলা ২টোতে ফিরি।

সন্ধ্যায় মি. সিংহ, গুপ্ত ও আমি বনের পথে বেড়িয়ে আসি। ভয় করছিল বুনো হাতির জন্যে। আজ সকালে বাংলোর পাশের উপত্যকায় ৭/৮টি ময়ূর দেখেচি। রাত্রে হো নাচ হল ও খ্রিস্টান হোরা 'ইশামসী গালিলিয়ে (?)পার লাগায়া' গান করলে হাত নেড়ে। বনে বনে হুপ্ বানর ডাকচে।

বড্ড শীত রাত্রে। কল্যাণীকে ও লিচুতলার মন্মথদাকে চিঠি দিলুম।

১৪ই নভেম্বর, ১৯৪৩। ২৮শে কার্তিক, ১৩৫০। রবিবার। থলকোবাদ। জাতিসারাং

রাত ১১ ॥০ টা। দ্বিতীয়া কৃষ্ণতিথির ঘন অরণ্যের মধ্যে বসে লিখচি এক ঝরনার ধারে। সামনে পাষাণময় চড়ার মধ্যে দিয়ে কুইনা নদী ক্ষুদ্র একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেচে। ঝর ঝর অবিশ্রান্ত চলমান কুইনা নদীর স্রোতোধারার শব্দ গভীর রাত্রে সারেন্ডা অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করচে। কে এসেচে এমন গভীর শীতের রাত্রে এখানে, কে এর অবর্ণনীয় রহস্যময় শোভা দেখেচে ?অথচ লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে এই চাঁদ এমনি উঠেচে, এই কুইনা নদী এই বনের মধ্যে দিয়ে এমনি বয়ে চলেচে, এই অরণ্য তার সমস্ত শোভা নিয়ে হাজার হাজার বছর এমনি গভীর নিশীথে চন্দ্রালোকে এমনি অপূর্ব রহস্যময় দেখাত—আজ যাঁর কৃপায় এখানে এসেচি, তিনি কোথায় যেন আজ নবীন কিশোরের রূপে ছেলেমানুষের মতো সলজ্জ সপ্রতিভ নিবেদনে একপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতের সৃষ্টি কেমন লাগে আমাদের শুনবার আশার উদ্‌গ্রীব, উন্মুখ। জয় হোক তাঁর, সে অদৃশ্য বিশ্বদেবতার। গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠেছে, ঘনবনের ক্ষুদ্র কুইনা নদীর ৬০/৭০ হাত চওড়া পাষাণময় চড়ায় চাঁদের আলো পড়েচে, অবিশ্রান্ত শব্দ হচ্চে ক্ষুদ্র জলপ্রপাতটির, অগ্নিকুণ্ডের পাশে করমপদা গ্রামের গামো (কামোর ভাই) ও আরো কয়েকটি লোক, মি. সিংহ ও মি. গুপ্ত ও আমি বসে প্রকৃতির দৃশ্য উপভোগ করচি প্রায় ২০০০ বর্গমাইল ব্যাপী এক বিশাল অরণ্যভূমিরে মধ্যে বসে। সারেন্ডা, কোলহান, গোড়াহাট, বোনাই স্টেট কেউনঝর, ময়ূরভঞ্জ, পাল্লহড়া, দাসপাল্লা (?), পাতকুম— এ সব অরণ্য পরস্পর পাশাপাশি ও সংযুক্ত। জ্যোৎস্না ফুটেচে আরো—রাত ১টা। আলোছায়ায় কি অদ্ভুত মায়ারূপ বনে। এই সব গভীর বনের পার্বত্য নদী দ্বারা তৈরি সরোবরে দেবকন্যারা বোধ হয় নামেন স্নান ও জলকেলির জন্যে, ইতর দৃষ্টির অন্তরালে। লক্ষযুগের অতীত জলকলতানে এখানে কথা কইচে—মৌন অরণ্য নিশীথ রাত্রি আদিম যুগের স্বপ্নে বিভোর। ভাষা আছে এ বর্ণনার ?

আজ সকালে উঠে গিয়েচি প্রথমে এই স্থানে, তারপর বালগাঁও। সেখান থেকে বোনাই স্টেটের মধ্যে এক দুদিকের পাহাড়ের মধ্যস্থ সংকীর্ণ বনাবৃত উপত্যকায় বনের মধ্যে ধনেশ পাখি ডাকচে বনভূমির নিস্তব্ধতায়। একটি তরুণ কৃষ্ণকায় দেবতার মতো যুবক হাতে বোনা মোটা খাটো কাপড় পরে তীরধনু হাতে খাচ্ছিল, তার কাঁচা শকরকন্দ আলু। বল্লে, নাম তার মসি (?)। মসি বড় ব্যস্ত, কি তার হাসি, কি তার চঞ্চল ও চটুল ভাব—গির্জায় উপাসনা করতে যাচ্চে। ভালো লেগেচে সেই বন্য যুবকের আনন্দচঞ্চল গতি, হাসিমাখা মুখ, সরল চোখের চাহনি। তারপর 'দেবযান' পড়েচি যে (?)—এত রাত্রে আবার এখানে এসেচি জ্যোৎস্নায় বনানী দেখতে। বেনাই স্টেটের যেখানে বসেছিলুম আজ সকালে, নিকটতম রেলস্টেশন সেখান থেকে ৪০ মাইল দূর, ছেদহীন বনভূমি গুয়ার রেলস্টেশন থেকে এ পর্যন্ত। গুয়া কেন, তার আগের স্টেশন জামদা থেকে এ বনসুরু। যদি কলকাতা যেতে হয়, তবে পদব্রজে রেলস্টেশন যেতেই ৩ দিন লেগে যাবে। জীবনে রেলস্টেশন থেকে এতদূরে কবে ছিলুম আর।

১৫ই নভেম্বর, ১৯৪৩। ২৯শে কার্তিক, ১৩৫০। সোমবার। থলকোবাদ

সকালে ৬টি ময়ূর দেখলুম।

সকালে উঠে আবার মোটরে বেরিয়েচি। জঙ্গলের মধ্যে গতরাত্রে যে আলোছায়ার খেলা দেখেচি—সেই গভীর রাত্রির জ্যোৎস্নায় কোইনা নদীর পাষাণময় তীরভূমি থেকে থলকোবাদ আসবার পথে নিবিড় অরণ্যের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রূপ দেখে অবাক হয়েই গেলুম। আজ আবার বেরুলাম, এই ছেদহীন ?অরণ্য চলেচে রাস্তার দুধারে, কোথাও পথ নীচে উপত্যকায় নামচে, কোথাও আবার উঠচে—যেখানে নেমেচে সেখানে লতাপাতার জড়াজড়ি ঝোপঝাপ তৈরি করে অরণ্যে হয়েচে নিবিড়তর। সাদা পাথর ও পাষাণময় জমিতে বনে শুধু ভেডলেন্ডিয়া [?]দোলাই গাড়া বলে এক পার্বত্য ঝরনা বয়ে চলেচে—তারই তীরে একটা গাছ মস্ত বড় উঁচু। বিরাট বনস্পতি—অন্তত ১৩৫ বছর বয়েস। আমার পিতামহকে এ গাছ শিশু অবস্থায় দেখেচে। কি শক্তি এদের মধ্যে আছে যে একটু ক্ষুদ্র চারা থেকে এতবড় বিশাল বনস্পতি হয়েচে ! ব্রহ্মশক্তি। আগে পথ ছিল না, এই নিবিড় সারান্ডা অরণ্যে বিনা পথে বিনা সাহায্যে বন্যজন্তুর ভয়ে বেড়াবে কোথায় ?উঁচু পাহাড়ি রাস্তায় নামচি। তিনটি স্তর দেখা যাচ্চে। হঠাৎ একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় বনমধ্যে একটি ছোট কুটিরে এসে পৌঁছুই। চারিধারে উঁচু পাহাড়, বড় বড় শালতরু শ্রেণী ঘিরে আছে, গভীর অরণ্য নিস্তব্ধতা—'ওরেবুরা' নামক পার্বত্য নদী, প্রায় কোইনা নদীর মতোই কুলুকুলু নাদে কুটিরের পাদদেশ ধৌত করে বয়ে চলেচে। উঁচু টিলার ওপর কুটিরটা। নাম বাসুডেরা। ধনেশ পাখি ডাকচে ঘন বনে। তপোবনের উপযুক্ত স্থান বটে—নিভৃত নির্জন। জরাইকেলা স্টেশন থেকে ১০ মাইল রাস্তা ধরে এলে আসা যায়। বিরাট বিরাট শালতরু বেষ্টিত স্থানটি। বাসুডেরা থেকে ছেড়েই সত্যিকার সৌন্দর্য আরম্ভ হল। ঘন সুন্দর বনানী, আসাম ফরেস্টের মত।'ওরেবুরা'র নাম দিয়েচি বনশ্রী, একস্থানে সুন্দর প্রপাতের মতো সৃষ্টি করেচে। রাঙা রোদ চারিদিকের গাছে বাঁকা হয়ে পড়েচে, Gorgeটা বড় সুন্দর। ধারে কয়েকটি কুটির। কুলিদের জন্যে। সবাই ঘাস বিছানো, চারিদিকে বনে ঘেরা অপূর্ব স্থানটি। জেরাইকেলা স্টেশন থেকে ৮ মাইল। এরপরে আবার একটা ঝরনা পড়ে ৫ মাইল, সাম্‌টা নালা। এখান থেকে অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে সাম্‌টা ঝরনা সমান্তরাল ভাবে চলেচে। হেন্দেকুলী বলে একস্থানে বনবিভাগের বাংলো। B.T.T.Co'র কুলিরা কাজ করচে। সামটা, তিরিলপোসি P.B.b, P.B.ই. এই কেবল শুনচি। তারপর রাস্তা বড় চমৎকার। ১২ মাইল পর্যন্ত। হেন্দেকুলী ১০ মাইল। সন্ধ্যার আগেই থলকোবাদ এলুম।

১৬ই নভেম্বর, ১৯৪৩। ৩০শে কার্তিক, ১৩৫০।মঙ্গলবার।

থলকোবাদ থেকে বার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে এক চমৎকার জলাভূমি দেখি। সেখানে বাঘ, সম্বর ও বাইসনের পদচিহ্ন। দুটি Cave দেখলুম ঘোর জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে। সেখানে অসংখ্য শজারু, বাঘ ও বাইসনের পায়ের দাগ। গুহাদুটির মুখে মোটা মোটা গাছের জঙ্গল। অদ্ভুত wild স্থান। এমন cave কখনো দেখিনি। একটাতে "২২-৪-১৯১২" 'God is Here'এই লেখা আছে। একরকমের ওকড়া ফল সারা গায়ে ও কাপড়ে লেগে গেল। একটা বড় জলাভূমিতে অসংখ্য কাশফুল ফুটেচে। কি ঘোর জঙ্গল ! আমরা যখন জঙ্গলে ঢুকচি, তখন কোৎরা অর্থাৎ barking deer ডাকচে। তিরিলপোসি আসবার পথে বনমোরগ দুটি উড়ে পালাল। ৫টায় তিরিলপোসি এলুম। শীত আজ কম। তিরিলপোসি জংলি গ্রাম, ২২ ঘর লোকের বাস। ঘুরে এলুম সন্ধ্যার আগে।

১৭ই নভেম্বর, ১৯৪৩। ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। বুধবার। তিরিলপোসি। ১৭/১১

সকালে বেরিয়ে Irrigation-এর নালা দেখতে বনের মধ্যে দিয়ে সিংলুম নালা নামে একটা পার্বত্য ঝরনার মধ্যে শিলাখণ্ডে বসলুম। কুলুকুলু শব্দ করে গভীর বনের মধ্যে দিয়ে নদীটি বয়ে চলেচে। ছায়ায় ছায়ায় বিকেলে বালজুড়ির (বোনাই স্টেট ৯ মাইল) পথ দিয়ে বেড়াতে গেলুম। পথ নেমে গভীর জঙ্গলে মিশেচে গিয়ে। মি. সিংহ বল্লেন—হাতি তাড়া করলে পালাতে পারবো না, চলুন যাই। চলে এসে এক পাথরের ওপরে বসলুম। সেখান থেকে পাহাড় দেখা যাচ্চে, অনেকদূর পাথরে যেন বাঁধানো—কোয়ার্টজাইট। Hematite Quartzite। সন্ধ্যায় ভাবচি লিচুতলায় মন্মথদা, যতীনদা এতক্ষণ বসে আড্ডা দিচ্চে। ইন্দু রায় খাওয়ার পরে শুয়েচে। শেষরাত্রে জ্বলজ্বলেশুকতারা। থলকোবাদ থেকে গরুর গাড়ি জেরাইকেলা যাচ্চে।

১৮ই নভেম্বর, ১৯৪৩। ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

টোয়েবু জলপ্রপাত। বেলা ৪টা। তিরিলপোসি

সকালে এক বন্যগ্রামে গিয়েছিলুম তারপর এলুম ঘন বনের পথ দিয়ে টোয়েবু ঝরনায়। বাঘের থাবার দাগ। ৪ মাইল থলকোবাদ পথ থেকে। গভীর বনের সরোবর, সামনে ৮০ ফুট উঁচু লৌহপ্রস্তরের দেওয়াল (Ferruginous quartzite) খাড়া উঠেচে, তার গা বেয়ে মোটা শেকড় নেমেচে, এক এক জায়গায় পাথরের ব্লক খসে পড়েচে, শেকড়ে ঝুলন্ত পড়ন্ত পাথরকে ধরে রেখেচে, পাথরের দেওয়ালের এক পাশে ২৫ ফুট উঁচু জলপ্রপাত দিয়ে সশব্দে জল পড়চে। নীচে ৫০x৪০ বঃ ফুট সরোবর, জল কালো, ঈষৎ সবুজাভ। থাকে থাকে জঙ্গল উঠেচে, গাব, বেত, বোটে [?], বড় বড় মোটা লতা। জল গভীর। বোঙ্গা বা বন্য অপদেবতার স্থান বলে এখানে কেউ মাছ ধরতে আসে না। টোয়েবু মানে Twisted neck।মাছ ফেলে দিচ্ছিল হো লোক তার স্ত্রীকে, শেষে স্বামীর ছিন্ন মুণ্ড পেলে। পাহাড়ের মাথায় রাঙা রোদ। ছায়া ভরা ঠাণ্ডা জায়গা। প্রপাতের জল যেখান দিয়ে যাচ্চে—সেখানে সামান্য ঘাস দীর্ঘ। অনেকগুলি বন্য আমগাছ। Eternity is here।৮ ফুট চওড়া হয়ে দুধারায় জল পড়চে। অপূর্ব গম্ভীর দৃশ্য। কত যুগ ধরে বৈদিক আর্যদের সময় থেকে এই জল পড়চে—মানুষ যখন শিশু তখন থেকে এই জল পড়চে—কে দেখেচে ?বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ছড়ানো চারিপাশে। ফার্ণ, বেত, দীর্ঘ তৃণ তার ফাঁকে ফাঁকে। এরই সম্বন্ধে একথা বলাচলে 'Shaded pools, where Diana And her nymphs might have come and disported themselves.'গম্ভীর, শান্ত, উঁচু গাছ—ঘন অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত। এই ৪ মাইল পথই ভীষণ অরণ্য। অসংখ্য হাতি [র] পায়ের দাগ। জেরাইকেলা স্টেশন থেকে ২১ মাইল। এই ২১ মাইল ঘন বন। ৪ মাইল নিবিড়, নিঃশব্দ, মনুষ্যচিহ্নহীন, বন্যজন্তু অধ্যুষিত অরণ্যানী—সারেন্ডা বনের অভ্যন্তরতম প্রদেশে প্রকৃতির এই রম্যস্থান অবস্থিত। পাইথনে কোৎরা গিলেছিল, হোRanger তাকে মেরে লতা দিয়ে বেঁধে এনেছিল সে গল্প শুনলাম। বড় বড় পাইথন আছে, কড়িকাঠের মতো মোটা। barking deer আস্ত গিলে খেয়েছিল।

১৯শে নভেম্বর, ১৯৪৩। ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। শুক্রবার। তিরিলপোসি

সকালে বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বড় বড় শালগাছের ও সামনের সেই শৈলচূড়ায় একটি গাছ একা দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে বনের মধ্যে, ওর দিকে চেয়ে ভগবানের কথাই মনে এল। কি অদ্ভুত এই সৃষ্টি, কত পাহাড়, কত জঙ্গল, কত বনৌষধি লতা, কত জলপ্রপাত কত awe inspiring beauty spot—ঐ দূর দূর নক্ষত্রের মধ্যে শত কোটি গ্রহে ও হয়তো এমনি কোটি কোটি লক্ষ কোটি বার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে—অথচ কাকে তিনি দেখাচ্চেন, কে এসব দেখে আনন্দ পেয়েছিল এই লক্ষ বৎসরের মধ্যে ?বাইসন ?হাতি ?রয়েলবেঙ্গল ব্যাঘ্র ?সে উদাসীন, কিশোর, নির্বিকার, লীলার আনন্দে সৃষ্টি করে চলেচেন, কিন্তু মানুষ না হোলে এসব তাঁর সৌন্দর্য দেখত কে ?

মোটরে বেরিয়ে জঙ্গলের পথে চলেচি। বিরহোর বলে একটা জাতি তারা যাযাবর, দীঘা বলে গ্রামের কাছে বনের মধ্যে দড়ি তৈরি করচে চীহড় লতা থেকে। সামটা গ্রামের মধ্যে দুটি ছেলে তারাজাতে তাঁতি, একজনের নাম চন্দন, গেঞ্জি পরেচে এই বনের মধ্যে। Picturesque চেহারা দেখেছিলুম 'মসি' নামক সেই যুবকের বোনাই স্টেটের জঙ্গলে। মূর্তিমান বনদেবতা যেন। তারপর এক বনের মধ্যে ঢুকলুম সেখানে কয়লা তৈরি হচ্চে জঙ্গলে। জেরাইকেলায় কাশীশ্বর চাটুয্যে বলে এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হল, খুলনায় বাড়ি। অনেকদিন পরে সভ্য জগতের মুখ দেখলুম, ট্রেনের ধোঁয়া উড়চে, দোকানপসার। রেন্‌জ্‌ আপিসে বসে আবার মোটরে উঠি। ৩ মাইল গিয়ে Ponga Road-এ আবার গভীর জঙ্গল সুরু। একদিকে Gorge ও ভীষণ নিবিড় অরণ্য। পোস্টা এলুম, Exhort (?)না করে আপিসের সামনে ডুলি করে এক যোগীকে নিয়ে যাচ্চে—জঙ্গল থেকে। পোস্টা থেকে কোল বোংলা এলুম। মি. সিনহার মুখে এ পথের গল্প প্রথম শুনি, আজ দেখলুম। কোল বোংগা বেশ গ্রাম। এক বৃদ্ধ ধানের খামার করেচে পাহাড়ের ওপরে, সেখান থেকে পাহাড়ের দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। কল্যাণীর কথা আজ বড়ই মনে হচ্চে। মনোহরপুর আবার রেলস্টেশন, আবার সভ্যতা, চায়ের দোকান। ক'দিন জঙ্গলে শুধু হোভাষা ও হিন্দি শুনে মন হাঁফিয়ে উঠেছিল।

২০শে নভেম্বর, ১৯৪৩। ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। শনিবার। মনোহরপুর

সকালে এক বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়ি দেখা করে এসে লিখতে বসেচি 'দেবযান'। রামলাল ও যতীনের স্বগ্রামে ফেরা অধ্যায়। দূরে দূরে পাহাড় শ্রেণী, অদূরে সারাণ্ডা টানেলের জায়গা, সারাণ্ডা শৈলমালা [।] ও ছোটনাগপুর মালভূমির সংযোগ স্থান। যিনি বনে বনে দেবকাঞ্চন ফুল ফুটিয়ে রেখেচেন, তিনিই রোজ সকালে গাছে গাছে পাখির কূজনের সৃষ্টি করেচেন—দূর পাহাড়শ্রেণীর কুয়াসায় অস্পষ্ট করে রেখেচেন। ইন্দু রায় এই সকালে বারাকপুরে বসে হয়তো ফণি কাকার সঙ্গে গল্প করচে—তারা এই বিশ্বরূপ উপলব্ধি করতে পাচ্চে না। স্নান করতে রোদ [?রোদে] তেল মাখচি, দূরের পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে ভাবচি নির্জন বাংলোয়, 'জাগো জাগো শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী' মহাভারতের মহাদেবতা জাগো, স্নান করে রোদে বসে লিখচি আবার। দূরে দূরে পাহাড়, গাছে পাখি ডাকচে, নির্জন স্থানটি।

বিকেলে কোইনা ও কোয়েল নদীর সঙ্গমস্থান দেখতে যাই—ও লৌহ প্রস্তরের খনির সাইডিংএ রাঙা মাটিমাখা কুলীরা কাজ করচে। হরজীবন পাঠক লক্ষপতি কাঠের ব্যবসাদার, তার সঙ্গে দেখা। দেবী বাঁড়ুয্যের শ্বশুর গিরীনবাবুর সঙ্গে আবার দেখা। মিশন দেখে ফিরচি, ওপারে আনন্দপুরে স্টেট্, ঠাকুর সাহেবের বাংলো আছে। নৃসিংহ দাস বাবাজির আশ্রমে ঢুকি, বেশ লাগল। নিভৃতস্থান, পুষ্পের সুবাস। তার চেলা এখন মোহান্ত। এক পণ্ডিতজীকে বড় ভালো লাগল, আরা জেলায় বাড়ি, 'জী সরকার' ও [,] সাধুজী রহনে সে আপকো মেজাজ গদ্‌গদ্ হো যাতা' বল্লে। দীন ও বিনয়ী, প্রসাদ নিজের হাতে রেঁধে সব লোক যতই আসুক, নৃসিংহদাস খাওয়াতেন। খুব ভালো। ওঁর ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্তি দেখলুম ইষ্ট দেবের। তিনিই সব দিয়েছিলেন। এক দানব মূর্তিকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেচে, ছেড়ে দিলে বড় মুশকিল। ফিরে রাত আটটায় ভাবি মন্মথদা আজ আমার চিঠি পেয়ে এতক্ষণ লিচুতলায় বসে পড়েচে। নুটুও কাল চিঠি পেয়েছে চৌকিদারি আপিসারের হাতে।

২১শে নভেম্বর, ১৯৪৩। ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। রবিবার। মনোহরপুর।

সকালে চা খেয়ে পান্‌চেমগুটু গ্রামে এলুম মোটরে। এক পাহাড়ের ওপর গাছের ছায়ায় বসি। চারিদিকে শৈলশ্রেণী—এক ছোকরা নাম দিবাকর দাস, চাকুরি চাইলে, বলেছিলুম মি. সিনহাকে। ওর যেন হয়ে যায়। কোল বোংগা গ্রাম ছাড়িয়ে সেই ঝরনা সেদিন যেখানে চা খেয়েছিলুম, সেখানে গেলুম। বনের মধ্যে ঢুকি, লতাপাতায় জড়াজড়ি, ভীষণ বন। নিস্তব্ধ বনভূমি, পূর্বের ঝরনার নাম, 'মহাদেব সাল' (?)। আরোএকটি ঝরনা পার হলুম। পাথর ছড়ানো বনমধ্যস্থ ঝরনা। ফিরে এলুম মনোহরপুর। কোইনা নদীর ধারে Export আপিসে কিছু দেরী হল। খাওয়ার পর বিশ্রাম করেপাহাড়টার ওপর গিয়ে বসলুম। দূরে দূরে অবিচ্ছিন্ন শৈলশ্রেণী—বননীল দিগন্তের হাতছানি। কল্যাণী আছে ঘাটশিলায়, সে কতদূর এখান থেকে। কি করচে না জানি এতক্ষণ। গৌরী এমন দিনে বোধ হয় আজই মারা গিয়েছিল, শ্রীগোপাল মল্লিকের লেনে সেই ঠাকুরবাড়ির কথা মনে হল। প্রথম শীত পড়েছিল কলকাতা শহরে, সেও এই সময়। ভগবান তার মঙ্গল করুন। জাহ্নবীও এসময় মারা গেল, তারও গমনপথ মঙ্গলময় হোক। আজ রবিবারের হাট, গোপালনগরে মনো খুড়োর দোকানে খুব বিক্রি হচ্চে। বটতলা দিয়ে হাট করে লোকে ফিরে যাচ্চে, এতদূর বসেও তা যেন দেখি। সন্ধ্যায় হরজীবন পাঠক ও মি. সিংহের সঙ্গে নৃসিংহদাস বাবাজির আশ্রমে গেলুম। অনেক গাছপালা, ফুলফল। Shady walks, বসবার জায়গা। সুন্দর স্থানটি। সাধুজি তুলসীদাসী রামায়ণ পড়বে। সুধীর চাটুয্যের বাড়ি গেলুম। খুলনার লোক। সবাই খুব খুসি হল। চা খাওয়ালে। সুধীরবাবু বল্লে—এক সঙ্গে বসে দুটো খেতি পারলি বড় ভালো হোত। D.F.O. যাওয়াতে খুব খুসি। আমায় বল্লে—গরিবের বাড়ি যে এসেচেন মনে করে।

২২শে নভেম্বর, ১৯৪৩। ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। সোমবার। ছোটনাগরা

সকালে হরজীবন পাঠক ও সুধীরবাবু এসে গল্প। সাহী Timber Officer এল রাত্রের মেলে। চা খেয়ে কোল বোংগা হয়ে আবার সেই গোঁসাইয়ের বাড়ি দেখে রওনা হই। ঘন বনের মধ্যে 'মহাদেব ?' ঝরনা পার হয়ে পাহাড়ের চড়াই পথে খানিকটা গিয়ে মোটর থামাই আমরা। ওপারে বাঁশবন দেখতে যাওয়া হবে, ফরেস্ট গার্ডরা রয়েচে। ঘোর কাঁটাবন ও রামদাঁতনের কণ্টকলতা, দুর্ভেদ্য চড়াইয়ের বনপথে লুবড়ানালার [?] Valley-র ওপরে এলুম। এখানে একটি অপূর্ব স্থানের সন্ধান পেলুম। ৯০০ ফুট নেমে গিয়েচে খাড়া পর্বত একেবারে উপত্যকার মেজেতে গিয়ে ঠেকেচে। ময়ূরের কেকারব শুনচি সেই নিস্তব্ধ অরণ্যানীতে। সামনে শুধু পাহাড়ের পর পাহাড়। একটা পাথর ফেললে ৫ সেকেন্ড ওর পতনের শব্দ পাওয়া যায় না। (হেন্দেকিরি Saw mill-এ বসে লিখছি। বেলা ১১॥০ হরজীবন পাঠকের Saw mill) সারা সারান্ডাতে এমন অদ্ভুত স্থান নেই। ২২৩৬ ফুট উঁচু—নীচে ৯০০ ফুট খাড়া নেমেচে উপত্যকার মেজেতে। সামনে ১৬৩৬ ফুট উঁচু একটা পাহাড় অনেক নীচে। একটা শিবগাছ আমাদের অনেক নীচে ডাইনের জঙ্গলে। বাঁদিকে একটা বটগাছ পাষাণপ্রাচীরের গায়ে। কি অদ্ভুত স্থান, ঐ দূরে মনোহরপুর টাউনের বাড়ি সাদা দেশলাইয়ের মতো দেখা যাচ্চে। আবার চলে এলুম সেই কাঁটা ভেঙে। পোস্টার পথে ঘন জঙ্গল। উসুরিয়া বলে একটা জায়গা দেখতে পেলুম। বোংগাতে জঙ্গলের মধ্যে B.T.T.-র forest manager থাকে মি. নক্‌নার। এই জঙ্গলে কয়েকটি বাঙালি কেরানীও আছে। উসুরিয়া ঝরনা অতি সুন্দর দেখতে। ঘন বনের মধ্যে লতাঝুলানো বনস্পতি ওর পাষাণময় দুই তটে। হলদে রোদ তার মাথায়। বহু দূরে ইছামতীর তীরে এক তেতলা বাড়ির ছোট্ট ঘরের কথা মনে পড়চে আজ। গৌরী এই দিনে মারা গিয়েছিল, জাহ্নবীও। কল্যাণী কতদূরে, কবে বা দেখা হবে। বড় বড় শাল গাছ এক জায়গাতে, ২০০ বছরের শালগাছও রয়েচে, আমার ঠাকুরদাদা যখন বালক, তখন এই সব গাছ চারা ছিল। উসুরিয়া ঝরনা ডাইনে, ঘন বনের পথে এল ছোটনাগরা। সামনে গুয়ার পাহাড়, ঘুরে আবার এসেচি গুয়ার সামনে। ৬।।মাইল পাহাড় পার হয়ে গুয়া।

২৩শে নভেম্বর, ১৯৪৩। ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

পরদিন সকালে উঠে বনের পথে মোটরে চলেচি হেন্দেকিরি Saw mill দেখতে পাঠকজির। বেশ জঙ্গল সারা পথে—একদিকে খুব উঁচু পাহাড়। নির্জন বনের মধ্যে Saw millটা—একটা ঝরনার ধারে। সারান্ডার সব জায়গাতেই পার্বত্য ঝরনা, যেখানেই ঝরনা সেখানেই সৌন্দর্য। একটা বাংলো আছে মাটির, পাঠকজির সঙ্গে। বেশ চমৎকার মাটির ঘরটি, পাহাড়ের ধারে। মাত্র ৪ মাইল সলাই থেকে। Bengal Streel Co.র ছোট গাড়িতে সলাই পর্যন্তআসা যায় মনোহরপুর থেকে। এখানে বসে লেখা যায় এ বাংলোতে। বনের মধ্যেও বটে। একটি বিশাল শিমুলগাছ দেখলুম এ পথে, যেমন একটা দেখেছিলুম সামটা ও হেন্দেকুলি যাওয়ার পথের মোড়ে। ওখান থেকে ফিরে তেন্তারি ঘাটে গেলুম ফিরতি বেলায় কোইনা নদীর ধারে। কোইনার সঙ্গে বার বার দেখা হচ্চে। সুন্দর স্থানটি তেন্তারি ঘাট। বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে কোইনা নদী বয়ে চলেচে। নির্জন স্থানটি। ছোট নাগরা মানে লোহার ঢোল, মানুষের চামড়া দিয়ে ছাওয়া। প্রাচীনকালে বাজানো হোত।

সন্ধ্যায় বাংলোর পেছনে ক্ষুদ্র পাহাড়ে বসলুম একা। অস্তদিগন্তের আভা পাহাড়ের ওপরে। নক্ষত্র উঠেচে মাথার ওপর। কতদূরে ঘাটশিলা, কল্যাণী আছে, কি করচে তাই ভাবচি। কতদিনে দেখা হবে, আর বেশিদিন নেই। বারাকপুরের সবাই এখন কি করচে না জানি। মন্মথদা'দের ওখানে আড্ডা বসেচে। অসীম অনন্ত নক্ষত্রজগৎ, নিস্তব্ধ বনানী ও শৈলমালা, শান্ত সন্ধ্যা—শুধু বিশ্বদেবের কথা মনে আনে। কতক্ষণ মুগ্ধ মনে পাহাড়টাতে বসে রইলুম। বাংলোয় আলো জ্বলচে দেখতে পাচ্চি, হাতির ভয় নেই এ জায়গাটাতে।

২৪শে নভেম্বর, ১৯৪৩। ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। বুধবার।

সকালবেলা। বাংলোর সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে শৈলশ্রেণী, সামনে ছোট বড় গাছ ও বনানী সকালের শিশিরসিক্ত, পাখি ডাকচে, বনমধ্যে ঝরনার কুলুকুলু তান সব সময়ে কানে আসচে। সলাইয়ের পথে লিখচি বনের মধ্যে গাড়িতে বসে, মি. সিংহ তদারকি করচেন। মধু সংগ্রহ ও পাখির ডিম সংগ্রহের জন্যে কুলিরা গাছ কেটেচে তারই তদারক। কত কি বন্যপাখির কলধ্বনি বনে। বেলা ১০টা। ছোটনাগরা দেখে এলুম বড় বড় লতা ঝোলানো ঝোপে।

সলাই ফরেস্ট বাংলো। বেলা ১২টা।

এক অতি সুন্দর পর্বত ও অরণ্যের দৃশ্যের মধ্যে সলাই বাংলো অবস্থিত। বামে, সমুখে নিকটে ঘন বনাবৃত পর্বতমালা, এবং পর্বতের পটভূমিতে (বামের পর্বতমালা ২০০০ ফুট উঁচু, (Steep) খুব বড় একটা শিমুল গাছ, বাংলোর ?মধ্যে একটা আসন—পাহাড়ের ডাকবাংলোর মধ্যে বনভূমিতে বহু গাছ, একটা নটরাজের মতো নৃত্যশীল ভঙ্গিতে শাখাবাহু বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে সামনের পাহাড়ের পটভূমিতে, একটা গাছ ঘুপসি, কালো ও লম্বা, ছোট বড় অসংখ্য গাছ। নির্জন, নিস্তব্ধ বনভূমি চারিপাশে, বারান্দায় চেয়ারে বসে আছি আর শুনচি অসংখ্য বন্যবিহঙ্গের কলতান। টুং টুং টুং টুং...একটা পাখি ডাকচে বনে। একটা টিয়ার মতো ডাকচে। পাখিদের কলগীতির রীতিমতো ঐক্যতান [ঐকতান] চলচে। চোখ বুজে শুনলাম কত কি পাখির গান। শিশিরসিক্ত বনস্থলীতে বনবিহঙ্গের এ কলগীতি দুর্লভ। বাঁদিকের উঁচু পাহাড়ের একজায়গায় অনাবৃত পাথর বেরিয়ে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে। ঈষৎ কুয়াশা লেগে আছে বাঁদিকের পর্বতশিখরে। মস্ত বড় শিমুলগাছটা উঠেচে সামনে, পাহাড়ের পটভূমিতে কি চমৎকার দেখাচ্চে। বন, বন, বনে ঘেরা বাংলোটি। Beauty spot in itself. থলকোবাদ, ছোটনাগরা ও সলাই এ তিনটি অদ্ভুত সুন্দর স্থানে বাংলো। মনোহরপুর মন্দের ভালো। কিন্তু থলকোবাদ ও সলাই সবচেয়ে ভালো। সর্বোত্তম সলাই। খাঁটি বনের মধ্যে ডাকবাংলোটি অবস্থিত। প্রকৃতির সুরম্য নিভৃত বনস্থলীর ক্রোড়ে।

ট্রলিতে ঘনবনের মধ্যে আংকুয়া জংসন। নিকটে ডাইনে কোইনা নদীর পর্বত ও বনের মধ্যে দিয়ে অপূর্ব সুন্দর বড় বড় পাথর বিছানোcontrast রচনা করেছে দু জায়গায়। আংকুয়া থেকে সলাই তিন মাইল। আংকুয়া থেকে ট্রেনে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চিড়িয়া মাইন্স্। Skip দিয়ে খাড়া উঠলাম পাহাড়ের গা দিয়ে ৪৪৩৬ ফুট। এই বিরাট Hematite-এর পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়া ২৭০০ ফুট, তার নাম বুদ্ধবুরু। এর তিনটি নাম লেদাবুরু, অজিতবুরু ও বুদ্ধবুরু। ওপর থেকে অদ্ভুত দৃশ্য। বিশাল লৌহপ্রস্তর বার করা পর্বতপার্শ্ব রাঙা দগদগে ঘা'র মতো দেখাচ্চে। মনোহরপুর থেকে এটাই রাঙা রাঙা দেখাত। এ অঞ্চলের মধ্যে শশাংদাবুরুর নীচের এ পাহাড়। Skip দিয়ে উঠতে ভয় করে।৩ মাইল গেলুম বিরাট পাহাড়ের ওপর দিয়ে তারপর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দুর্গম মিনিডজোটো নামক কাঁটাফল গায়ে ও কাপড়ে লাগিয়ে এক নালার কাছে এলুম। ঝরনার নালা বেয়ে লৌহপ্রস্তরের চাটানের ওপর দিয়ে দিয়ে ৩ মাইল গিয়ে এক জায়গায় বিরাট

Gorge-এর মধ্যে দিয়ে নালাটা চলেচে। গভীর খাদ। ১৭৬০ ফুট পাহাড় উঁচু। বিরাট wilderness, বড় বড় দোলানো জঙ্গল। চা ও খাবার খেলুম সেই দূরশ্রুত Ankna 29 block-এর জলপ্রপাতের শব্দ শুনতে শুনতে। তারপর মিন্ডোজোটোর জঙ্গল ভেঙ্গে এক জায়গায় নালার খাদে বড় বড় লৌহপ্রস্তরের দেওয়াল ও গুহা পার হয়ে Skip-এ এলুম। Skip দিয়ে নামলুম। এক ছোকরা নাম অজিত সেন আমায় বল্লে—আপনি কি বিভূতিবাবু ?কাল গিয়েছিলুম আপনার সঙ্গে আলাপ করতে মনোহরপুরে। ট্রেনে লতা দোলানো আদিমযুগের অরণ্যানী দিয়ে যেন যাচ্চি। যেখানে হাঁস শাদা নদী কোইনার সঙ্গে মিশেচে। ট্রলি করে সব্বাই এলুম, তখন পাহাড়ের ও সেই ঘন বনশীর্ষে রাঙা রোদ। আমাদের গাঁয়ে কুঠীর মাঠে এখন শীত, রাঙা রোদ পড়েচে, ছেলেবেলায় বেড়িয়ে এসে ধুলোমাখা পা ধুয়ে গরম কাপড় পরে কালীদের বাড়ি কি কামার দোকানে যেতুম গল্প করতে। সলাইতে ও বনের বহুস্থানে চটিজুতোর মতো ফল ঝুলচে গাছে—আমাদের ভিটেতে যা [র] গাছ আছে। ধনেশ পাখি ডাকচে জঙ্গলে, বক্‌বক্ করে একটা বনমোরগ উড়ে গেল। মোটরে এলুম ছোটনাগরা। ওই সামনে গুয়া মাইন্‌সের রাঙা বার করা অনাবৃত গাত্র দেখা যাচ্চে। সুউচ্চ পাহাড়ের গায়ে এক নির্জন গাছ। কতদূরে ইছামতীর ধারে তেতলা বাড়ির ওপরের ঘর—সেখানে কে যেন আছে। গৌরীর এইসব সময়ে মারা যাওয়ার দিন। ঘন বনের অন্ধকার হয়েচে।

২৫শে নভেম্বর, ১৯৪৩। ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার। ছোটনাগরা—গুয়া

বেলা দশটার সময়ে চা খেয়ে স্নান সেরে বনের পথে গুয়া রওনা হই। মোটরের স্প্রিং ভাঙা, ভয় হচ্চিল প্রতিপদে এইবার বুঝি গাড়ি গেল। কোইনা নদী পার হবার সময় তেন্তারিঘাটে দেখি ৮/৯ জন কুলি দাঁড়িয়ে আছে—এখানেই ভয় ছিল বেশি কিন্তু দেখলুম ওরা পাথর দিয়ে রাস্তা করচে। আবার জঙ্গল সুরু এরপর থেকে, আবার কুমদির পথে এসে মিশলুম। বরাইবুরু থেকে ডাইনে কারো নদী পার হয়ে পথ গিয়েচে জাম্‌দা। ৬ মাইল এখান থেকে। গুয়াতে আসবার পথে বনের মধ্যে কেবলই মনে হচ্চে আজ বাড়ি ফিরচি। এই ঘি ও ধুনো নিয়ে কতক্ষণে না জানি বাড়ি পৌঁছুবো, আজ রাঁচিতে না কাল। Gua-তে মি. গুপ্তের বাড়ি আহারাদি করলুম। মহিলা সমিতির সভানেত্রী আশা দেবী ও আরো কয়েকটি মহিলা সভ্য দেখা করতে এলেন আমার সঙ্গে ৩।।০ টার সময় মোটর ছেড়ে রওনা হলুম বরাইবুরু দিয়ে কারো নদীর পারে এলুম। জাম্‌দা হয়ে বনের পথে এলুম, সেই যে দোকানে মিহিদানা কিনে খেয়েছিলুম সেই দোকানের সামনে দিয়েই গেলুম। নোয়ামুণ্ডি খনির ওপরে গিয়ে বেড়ালুম মোটরে। বেশ জায়গা, শুনলুম ট্রলি করে গেলে ওদিকে আরো জঙ্গল আছে, ট্রলিতে অনেকদূর যাওয়া যায়। সুন্দর মুক্ত প্রান্তর দিয়ে মোটর চলচে, ছোট বড় পাহাড়, জগন্নাথপুর গ্রাম। যাবার সময় এই গ্রামকেই মনে হয়েছিল ভীষণ বনের মধ্যে অবস্থিত। পেছনে কেউন্‌ঝর স্টেটের পাহাড় দূরে দেখা যাচ্চে, বাঁয়ে কোলহান ও সারান্ডার শৈলমালা। কেন্দ্‌পোসি স্টেশনে মোটর ধরলুম। হাটগামারিয়াতে পরেশবাবুর আপিসে চা খেলুম। মণীন্দ্র নন্দীর ভাগনে আলাপ করলে কেন্দপোসি স্টেশনে। আজ গোপালনগরের হাট, জগন্নাথপুরের হাট দেখে আমার সে কথা মনে হয়েচে এবং সারাপথ গাড়িতে পর্যন্ত সে কথা ভাবলুম। রোদ রাঙা হয়েচে কুঠীর মাঠে সেকথাও। সুন্দর সন্ধ্যা। বীরসার সঙ্গে দেখা করলুম চাঁইবাসাতে। ডাকবাহক এসে গাড়িতে বকশিশ চাইলে। টাটার ট্রেন ফেল করে সারারাত্রি ওয়েটিং রুমে। নৈহাটির গার্ডের সঙ্গে আলাপ। সকাল ৭টার সময়ে ঘাটশিলায় নামলুম। শান্তর সঙ্গে স্টেশনে দেখা। বম্বে এসেচে সে। কল্যাণীকে ধুনা ও ঘি দিলুম। তখুনি ওরা পরোটা ভেজে দিলে।

২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৩। ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। শুক্রবার। ঘাটশিলা

সকালে নামলুম। এক গাদা চিঠি এসেচে। অজিত সেন সাবডেপুটি রাঙামাটি এবং ঊষা কাশ্মীর থেকে পত্র দিয়েচে। রোদে বসে চিঠি পড়লুম, অপূর্বমণি দত্ত দিল্লি থেকে চিঠি লিখেচেন। যাই হোক এসব চিঠির উত্তর দিতে হবে। দ্বিজুবাবুর বাড়ি বসে বনভ্রমণের গল্প করে এলুম। বিকেলে নুটু এল, আমি ও ধরমশায় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, লেক তৈরি করেচে অনেকে তাই দেখে, নুটু মোটরবাইকে এল। বুয়াদের বাড়ি বসে গল্প করে ফিরে এলুম সন্ধ্যায়। নুটুর সঙ্গে গল্প করি। বেশ লাগচে। কল্যাণীকে রাত্রে বকি চিঠি না দেওয়ার জন্যে। কল্যাণী কতক্ষণ কাঁদল। তারপরে ওপাশে ফিরে শুয়েচি, ও দেখি চিমটি কাটচে। তখন আবার ওর দিকে ফিরে গল্প করি।

২৭শে নভেম্বর, ১৯৪৩। ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। শনিবার।

আজ বড্ড শীত। আর তো বেশি কিছু লিখবার নেই। ঘাটশিলা তো একঘেয়ে। অমরবাবু এসেচেন শুনে তাঁর বাড়ি গেলুম, তিনি আসেন নি। বিকেলে শচীন এল, ফণি এল। রমণীবাবুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

২৮শে নভেম্বর, ১৯৪৩। ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। রবিবার।

সকালে পরিমলবাবুর লেখা লিখি। রোদে বসে 'রাগরেখা' বলে একটা বই পড়ি। 'দেশ' কাগজে 'পার্থক্য' বলে গল্পটা ও শনিবারের চিঠিতে 'ভিড়' বেরিয়েচে। বৈকালে নিগমানন্দ আশ্রমে গিয়ে বসলুম। একজন মহিলার সঙ্গে আলাপ হল, হেমেন্দ্র মন্দিরে থাকেন। একদিন নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। নবাব সাহেব এলেন ওখানে বেড়াতে। সন্ধ্যার অন্ধকার হবার আগেই চলে আসি, কারণ চালভাজা খেতে হবে সতরঞ্চি পেতে বসে। বাড়ি এসে সতরঞ্চি পেতে বসি ও কল্যাণীর সঙ্গে গল্প করতে করতে ভাজা খাই উঠোনে— ইসমাইলপুরের আরণ্যক দিনে। হেমেনবাবু নায়েবের সঙ্গে বসে এমনি গল্প করতুম। তারপর দ্বিজেনবাবুর বাড়ি গিয়ে সারেন্ডা ভ্রমণের গল্প করি। দুজনেই বলি, ভগবানের করুণা ব্যতীত এই দুর্গম অরণ্যপথে ভ্রমণ আমার দ্বারা সম্ভব হোত না। তিনি হয়তো তাঁর হাতের অপূর্ব সৌন্দর্যসৃষ্টি, যা এ পর্যন্ত কেউ ভালোবেসে দেখে নি—তাই দেখাবার জন্যে উন্মুখ ছিলেন। তাই তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন—বল্লেন—দেখো, দেখো কেমন করেচি। কেউ দেখে না, কেউ আসে না—যারা আসে তারা কাঠের ব্যবসাদার, তুমি দেখো। সব জায়গা বেড়িয়ে ভালো করে দ্যাখো। আর বল তো কেমন হয়েচে ?তোমার মুখে শুনি।

জয় হোক তাঁর। Sinha পত্র দিয়েচে আজ। কেষ্ট সরকার দ্বিজুবাবুর বাড়ি ছিল। গুটকে এল রাত্রে।

২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৩। ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। সোমবার।

আজ সকালে লিখি ও কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর সদগুরু প্রসঙ্গ পড়ি। Does God love to associate himself with inmates of a lunatic asylum ?বিকেলে বাজার করে দিতে যাই এক মাসের মতো। শচীন ও ফণির সঙ্গে গেলুম মুকুলের বাড়ি। মুকুল বিয়ে করে এসেচে। ওরা চা খাবার খাওয়ালে। নুটু এল সন্ধ্যাবেলা। তার সঙ্গে গল্প করি। রাত্রে চলে আসবো। আসবার সময় কল্যাণী বল্লে যেয়ো না কাল। কাঁদে। অনেকরাত্রে দেখি আমার গায়ে টিপে টিপে দেখচে ঘুমের ঘোরে আমি শুয়ে আছি কিনা। আমি সাড়া দিলুম। যেমন আমি কথা বল্লুম, সে ওমনি হাতখানা আমার মাথায় দিয়ে ঘুমের ঘোরে শুলে। রাজেন চলে গেল রাত্রে রাগ করে।

৩০শে নভেম্বর, ১৯৪৩। ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। মঙ্গলবার। কলিকাতা

শেষরাত্রে উঠে খেয়েদেয়ে রওনা, গাড়ি খালি। বিষ্ণু প্রধানের সঙ্গে খড়্গপুর দেখা।

কলিকাতায় এসে মিত্র ও ঘোষ এবং M.C.। তারপর পরিমল গোস্বামীর বাড়ি। ওর স্ত্রী এসে আলাপ করলেন। বুদ্ধদেববাবুর বাড়ি [।] রমেশ ঘোষাল এসে দোর খুলে দিলে। সারারাত্রি গল্প করার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু আসলে রাত্রি ১টা পর্যন্ত গল্প।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। বুধবার। কলিকাতা—বনগ্রাম

সকালে স্নান করে বার হয়ে কাকার বাসা। তারপর অপূর্ববাবুর বাড়ি গিয়ে টাকা নিই। মিতের মেস ৪১, মৃর্জাপুর স্ট্রীটে এসে দেখি জীবন রয়েচে—আমাদের পুরোনো চাকর। সে দেখে খুব খুসি। একগ্লাস জল চেয়ে খাই। জীবনের কথা কত ভাবি। মিতের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সারান্ডার গল্প করি। বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ। বন্ধুর বাড়ির সামনে দিয়ে আসচি, বন্ধুর বৌ বলচে—স্বাগতম। ঢুকলুম ওদের বাড়ি, মন্মথদার বাড়িতে হেনা বলে একটা মেয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলে। যতীনদা ও মনোজের সঙ্গে আড্ডা। বন্ধুর সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত নানা গল্প। কেমন ভিজে ধরণের ঠাণ্ডা।

২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার। বারাকপুর

সকালে উঠে চা খেয়ে বারাকপুর। পথে মর্তমান কলা কিনি, এক পয়সায় একটা। বারাকপুর পৌঁছে যেন মনে হল জ্বর এসেচে। নাইতে গেলুম না। বিকেলে মতিকাকার বাড়ি গিয়ে বিমলির সঙ্গে দেখা। বল্লে, খুকুর খবর কি ?গিরীনদা ও বাঙাল মাসির সঙ্গে কথা। তারপর রাঙা রোদ ভরা বিকেলে কুঠীর মাঠে সেই সুন্দর স্থানটিতে গিয়ে বসি। মনে পড়ল গতদিনে আজ আমি তিরিলপোসিতে টোয়েবু জলপ্রপাত দেখে সেই ভীষণ বনের পথে ফিরচি—নদী কান্টালের সেই বনের মধ্যে দিয়ে। ভগবানের নাম এখানে করতে আনন্দ আসে। গত বৃহস্পতিবার আজ এমন সময় কেন্দপোসি স্টেশনে ট্রেনে উঠেচি। হাটগামারিয়া থেকে কেন্দপোসি এসেচি। "রম্‌তা সাধু ওর বহ্‌তা পানি" কখনো মলিন হয় না। রাত্রে ইন্দু, ফণিকাকা ও হরিপদদার সঙ্গে গল্প। শ্যামচরণদার বাড়ি বসে গল্প—দুটি ছেলে অন্তে ইত্যাদি পড়তে এসেচে।

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০।শুক্রবার।

আজ সকালে ইন্দুর বাড়ি বসে গল্প করি অনেকক্ষণ। তারপর নদীতে নেয়ে এলুম তেঁতুলতলার ঘাটে। ভাত খেয়ে এল জ্বর। সারাদিন বাড়িতে বসে রোদে। হরিপদদা ও খুড়ো সন্ধ্যাবেলা এল।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। শনিবার।

আজ সকালে জ্বরটা ছেড়ে গেল। রোদে বসে লিখি পড়ি। জেলি এসেচে কাল রাত্রে। জেলিদের বাড়ি গিয়ে বসি। সেই পুরোনো আমার বাল্যদিনের মেটেবাড়ি এখনো বজায় আছে, এখানে গেলেই মনে পড়ে সরোজিনী পিসিমা এখানে বসে বলত আমার জান ?হয়ে গেল। গত শনিবারের আগের শনিবার আজ মনোহরপুর ডাকবাংলায়। সেই উঁচু পাহাড়টায় বসে এদিকে চেয়ে আছি। বাঙালিবাবুদের সঙ্গে আলাপ করে এসেচি। বন্ধুরা এল বিকেলে গাড়ি করে, মিতে এল। অশ্বত্থতলায় ফণিকাকার মোকর্দমার মীমাংসার সালিশ বসল। মিতে নিরপেক্ষ লোক, ওকেই বল্লাম, মীমাংসা করো। তারপর সবসুদ্ধ বনগ্রামে চলে এলুম। লিচুতলায় যতীনদা, মন্মথদা আড্ডা দিলেন—আমি ও মিতে সেখানে খানিকটা বসে মিতের বাড়ি এসে গেলুম। রাত্রে জ্বর।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। রবিবার। কলিকাতা

সকালে সেকেন্ড ট্রেনে কলকাতা। শনিবারের চিঠি আপিসে গেলুম নেমে। সজনী দাস নেই।ওখান থেকে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে জিনিসপত্র কিনলুম। তারপর অপূর্ববাবুর বাড়ি বসে আছি, সাইরেন বাজল ১১।।০ টার সময়ে। রইল ১॥০ টা পর্যন্ত। খিদিরপুর ডকে নাকি বোমা পড়ল। আমি বুদ্ধদেবের বাড়ি গেলুম—এবং সেখান থেকে মেলে জ্বরগায়ে এসে নামলুম ঘাটশিলা। নুটু ছিল মুকুলদের বাড়ি। তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি চলে আসি।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। সোমবার। ঘাটশিলা

সকালে উঠে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গেলুম। বিকেলে অমরবাবু এলেন ওখানে। গিয়ে গল্প করি—রাত্রে জ্বর এল।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

আজ আর জ্বর নেই। 'সদগুরুসঙ্গ' পড়ি। সারাদিন বাড়িতে থাকবার পরে বিকেলে ফণি ও শচীন এসে গল্প করলে সন্ধ্যায়।

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। বুধবার।

আজ বসে 'সদগুরুসঙ্গ' পড়ি। বিকেলে সেনগুপ্তদের বাসায় গিয়ে গল্প করি। অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত। দাসপাল্লাতে (?)উমেশ পাণিগ্রাহীকে পত্র দিলাম।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে 'সদগুরুসঙ্গ' পড়ি। সিনহার চিঠি এল। বিকেলে ফুলডুংরি গিয়ে বসলুম। সেই জ্যোৎস্না আবার উঠল। নির্জন বনপ্রান্তর—ছন্নছাড়া চেহারা—বন, আকাশে তারা উঠেচে। সারেন্ডার মতো বন আর কোথায় আছে ?এখানে এই অপূর্ব। ছোট নাগরার সেই বাংলোর পেছনের পাহাড়টা, সেই উসুরিয়া ঝরনার কথা বড্ড মনে পড়চে। পূর্ণবাবুর সঙ্গে আজ সকালেও গল্প করেচি, আবার বিকেলেও রাত ৮।।০ পর্যন্ত গল্প করি। ভগবানের কথা মনে হল ফুলডুংরিতে বসে।

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। শুক্রবার।

সকালে লিখি। সারা দুপুর লিখি। বিকেলে বড় কূর্মশিলায় গিয়ে বসি। আয়েশাদের বাড়ি বেড়াতে গেলুম। আয়েশা নীরদ দাসগুপ্তের মাসতুতো বোন। এখানে ওর স্বামী বাসা করে আছে। আয়েশা বল্লে—আপনি প্রসাদ খাবেন কি ?বলে খুব লুচিটুচি খাওয়ালে। ওখান থেকে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে গল্প। অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত।

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। শনিবার।

সকালে উঠে 'দেবযান' লিখি। বিকেলে প্রজ্ঞানন্দ স্বামীর আশ্রমে গিয়ে একখানা বই আনি। প্রজ্ঞানন্দ স্বামী আশ্রমে নেই—সূর্য অস্ত যাচ্চে, আমি এক জায়গায় বসে থাকি, উঁচু টিলায়, সামনে শৈলমালা। তারপর স্বামীজি এলেন—তাঁর সঙ্গে গল্প করি বসে।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। রবিবার।

সকাল থেকে বসে লিখি। বিকেলে আয়েশাদের বাড়ি বেড়াতে গেলুম। 'স্বপ্ন-বাসুদেব' বার হয়েচে 'দেশ' কাগজে। সেখানা হাতে করে নিয়ে গেলুম। দ্বিজুবাবুর বাড়ি গেলাম। ওর জ্বর হয়েচে।

সকালে আতাতলায় লিখচি, কল্যাণী একটা কাগজ পাঠিয়ে দিলে—তাতে লেখা, তুমি আমার মান্‌কু, শোনকু, বুড়ো থুরথুরো ওর যা বানান।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫০ সোমবার। ধলভূমগড়

আজ সকালে ধলভূমগড় এলুম। বেশ জায়গাটি। লখিরাম আমার সঙ্গে এল। সব বিদেশ ভ্রমণের সময় কি লখিরাম আমার সঙ্গে যাবো ! গুট্‌কেও বাক্স নিয়ে হাঁটছিল। ট্রেনে Gua নিবাসিনী সেই মিস চাটুয্যের সঙ্গে দেখা। ওরা পাবনায় ?স্থল নামক গ্রামে যাচ্চে, সিরাজগঞ্জ থেকে যেতে হয়। ধলভূমগড়ে নুটুর কোয়ার্টার বেশ জায়গায়—রোদ থাকে সারাদিন। ধূ ধূ মাঠ, দূরে শালবন। বিকেলে সুবোধ ঘোষ আসবে বলে চাঁইবাসা থেকে, গুটকেকে দাঁড় করিয়ে রাখলুম পথে—কেউ এল না। আমি ও নুটু রাজবাড়ি বেড়াতে গেলুম। ধনপতিবাবু শিকারের গল্প করলে। শঙ্খচূড় সাপের কথা বল্লে। বেশ পুরোনো ধরণের বাড়ি, গড়খাইওয়ালা। চাঁদ উঠেচে তখন সেখান থেকে মাইনর স্কুলের কমপাউন্ড দিয়ে এলুম Range Officer নুরুল হকের ওখানে। সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, চা ও নাস্তা আনি। আমি বল্লাম—না। সেও Plantation-এর গল্প করলে। চমৎকার জ্যোৎস্নায় শালবনের মধ্যে দিয়ে বাসায় চলে এলুম। কতক্ষণ বাইরে জ্যোৎস্নায় বসে রইলুম। খেয়ে গল্প করলুম। উঁচু টিলার ওপর জায়গাটি, সারাদিন রোদ, তেমনি জ্যোৎস্নার শোভা কতদূরে দেখা যাচ্চে। রাজাদের কুচরিত্রের গল্প শুনেছিলুম—বিশেষত রাধিকাবাবুর। মংলা রুটি ও খাবার নিয়ে এসে জ্যোৎস্নালোকিত দাওয়ায় পাতা করে দিলে। ইসমাইলপুরের কথা মনে আনে। শেষরাত্রে জ্যোৎস্নায় বাইরে এসে দেখি ফুটফুট করচে জ্যোৎস্না।—কি অদ্ভুত শোভা ! গত দ্বিতীয়ায় আজ থলকোবাদ।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। মঙ্গলবার। ধলভূমগড়

সামনে চমৎকার শালবন। দূরে দূরে নীল পাহাড়শ্রেণী। সকালের লাল টকটকে সূর্যটা খুব সকালে উঠল। শালবনে বেড়াতে গিয়ে মনে হল যেন সুদূর বাংলা থেকে জাপলা সিমেন্ট খনিতে কাজ করতে এসেচি। ২৫ টাকা মাইনের চাকুরি করবো—সেকালের সস্তা দিন—এখানে যেন ৮/৯ সের দুধ টাকায়। √০আনা আটার সের, ১দ, ঘি। মাংস √০আনা। ৬/৭ টাকা খেতে লাগবে, ফ্রি কোয়ার্টার। জলখাবার ধোপানাপিত আরো৩ টাকা। ১৫ টাকা বাড়িতে পাঠানো যাবে। ক্রমে ৩০/৩৫ টাকা হবে। তখন ক্রমে পরিবারআনা যাবে। কোয়ার্টার দেবে। খুব স্বাস্থ্যকর, ফাঁকা, মুক্ত রোদ জ্যোৎস্নার দেশ। খটখটে শুকনো। বাংলাদেশের ম্যালেরিয়া থেকে এসে ভালো লাগচে। রাবড়ি বিক্রি হয়, গরম পুরী, হালুয়া—/০ আনা কিনলে বেশ জলখাবার। এখানকার ডাক্তার দেশের লোক, তাই যেন এসেচি। আরো ২ জন ছেলে আছে গ্রামের। সকালে চা খেয়ে রাজবাড়ি যাচ্চি নুটুর সঙ্গে, সিনহার সঙ্গে দেখা নুরুল হকের আপিসের সামনে। মোটরে একটি বৌ ও ভদ্রলোক বসে। গোবরডাঙ্গায় বাড়ি। রাজবাড়ি গেলুম ধনপতিবাবু অনেক মন্দির-টন্দির দেখালে। ফিরে নুরুল হক বল্লে—এইমাত্র ওরা চলে গেল। মাংস রেঁধেচে গোপাল। ভাত খেয়ে খাটে বাইরে শুয়ে বিশ্রাম করি। গোপাল ইঁদারায় পাঞ্জাবীদের বালতি নিয়ে নাইচে। ভাবলুম বারাকপুরের সীতা রায়ের নাতি—এখানে জল তুলচে কুয়োয় সুন্দর ধলভূমগড়ে। ঘুমিয়ে উঠে সুবোধ এল মোটর নিয়ে। ওর মোটরে বাড়ি। কল্যাণী গিয়েচে পুকুরে। তখুনি মিসেস খান্নার বাড়িতে গিয়ে চা খাই। মিসেস কনওয়ারের সঙ্গে দেখা হল। স্টেশনে এলুম ওদের সবাইকে নিয়ে। মেলে মিসেস কনওয়ারের ছেলে নামল—মাতৃমূর্তি দেখলুম—চুমু খেল প্ল্যাটফর্মে। ডিনার এড়িয়ে বাড়ি ফিরলুম।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫০ বুধবার। ঘাটশিলা

সকালে বসে লিখচি, রাজস্টেট থেকে সাইকেল নিয়ে লোক নিমন্ত্রণ করে গেল। লিখচি, মি. সিনহা মোটর নিয়ে হাজির। গেলুম রাজবাড়ি। বঙ্কিমবাবু চলে গেল S.D.O.র মিটিংএ ডাকবাংলায়। ইন্দুবাবু টেবিলে বসল। ওখান থেকে ৩॥০ টাতে বেরিয়ে ফুলডুংরি কলোনিতে রক্ষিতদের বাড়ি থেকে মেয়েদের নিয়ে আমরা গালুডি হয়ে বাদলবাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে বাগাল গোড়া, সাড়ে তিন মাইল গালুডি থেকে। এতকাল কখনো এ পথে যাইনি। বেশ পাথর ছড়ানো সুন্দর জায়গা।পাহাড়ে গোলগোলি ফুলের এত গাছ ! বসন্তে বড় শোভা হয় নিশ্চয়ই। শালবন পাহাড়ের নীচে—বড় শোভা। একটা বাঁধ আছে। সামনের কালাঝোড় পাহাড়শ্রেণীই দল্‌মা, পোড়াহাট, হেসাডি হয়ে চলে গিয়েচে। মোহিনীবাবুর নার্সারিতে ওপরের ছাদে চা খেলুম সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে ও সন্ন্যাসীর গল্প শুনি। সন্ন্যাসী এল ও থলি থেকে মাছ বার করে দিলে হঠাৎ। শেষে ধরা পড়ল অনুসন্ধানে, সন্ন্যাসী মাছ কিনেচে মৌভাণ্ডারের এক লোকের কাছে। চমৎকার

ক্রাইসেনথিমাম ফুটেচে ও ডালিয়া। যেন কাশ্মীর। সন্ধ্যায় ফিরে বাড়িতে—Anatole France-এর Prologue to well of St. Claire পড়ে শোনাই সিংহকে। তারপর মিসেস কনওয়ারের ওখানে গেলুম মোটরে—রাত্রে ডিনারের নিমন্ত্রণে মিসেস খান্নার বাসা। সূরয আটোয়াল এল মিসেস কনওয়ারের বাড়ি। আমরা কলকাতায় বোমা ও 'ন ই কহানী' বলে হিন্দি পত্রিকার সম্বন্ধে গল্প করি ও খাই। অনেক রাত্রে ফিরি।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

সকালে বসে লিখি। মি. সিংহ এসে দুপুরে খেলেন—তারপর ছোটঘরে বসে দুজনে গল্প করি। সকালে দ্বিজুবাবুর বাড়ি আয়েশা বসে—বংকিমবাবুর মায়ের নানা অলৌকিক ক্ষমতার কথা বল্লে। সন্ধ্যায় বেড়াতে গেলুম মাঠের দিকে। নুটু এল, তার সঙ্গে গল্প করলুম। আয়েসাদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যায় অনেক গল্প করলুম। রাত্রে নুটুর সঙ্গে সারান্ডা Forest-এর গল্প করি। কল্যাণীকে বকলুম সে পরোটা করে দেইনি [দেয়নি] বলে এবং চাঁইবাসা থেকে আনা চালগুলো ইঁদুরে খেয়েচে বলে। আবার দেখি আমায় চিমটি কাটচে, বল্লে—ওদিক ফিরে শুলে কেন ?অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করি। গত মাসে ঠিক এই দিনে বাসুডেরা ও বনশ্রী গিয়েছিলুম মোটরে থলকোবাদথেকে।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ১লা পৌষ, ১৩৫০। শুক্রবার।

সকালে উঠে লিখি ও May Sinclairএর Uncanny Stories এবং নিগমানন্দের ভক্তিযোগ পড়ি। 'দেবযান'-এর আশার নরকভোগ অধ্যায় লিখচি আজ সকালে। আশা ও নেত্যনারাণের দেখা হয়েচে আবার। দিজুবাবুর বাড়ি গেলুম। পুকুরধারে খেলাৎ স্কুলের এক পুরোনো ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল—মুহারিদের ব্যাচ। নাম নৃপেন্দ্র ঘোষ। বিকেলে ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশন্স জজ মিত্রমহাশয়ের সঙ্গে দেখা। Soya-bean সম্বন্ধে ওভারসিয়ারের সম্বন্ধী বীজ দিতে চাইলে। তারপর গেলুম মুকুলের বাড়ি। ফণির ছোট ঘরে শচীন ও আমি তামাক খেতে খেতে গল্প করি। আজ বেশ শীত পড়েচে। মিনতিকে চিঠি দিলাম—দেবুর বোন। সে কালীসাধনা করে কালীদর্শন পেয়েচে—অনেকদিন পরে চিঠি লিখেছিল। এবার উত্তর দিচ্চি। আজ আর আয়েশাদের বাড়ি যাইনি। মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম সন্ধ্যার আগে এবং সকালে স্নানের সময়।

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ২রা পৌষ, ১৩৫০। শনিবার।

সকালে লিখি। বিকেলে ফণির ছোট্ট ঘরে গিয়ে—শচীন ও আমি বসি। কি সুন্দর ঘরটি। রাত্রে এসে বসে লিখি আশার নরকভোগ অধ্যায়—। সন্ধ্যায় মহিমা মিত্র জজ সাহেব, গোকুল পাইন স্কুলমাস্টার ও সুবোধ দত্ত (নরসিং দত্তের নাতি) এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ৩রা পৌষ, ১৩৫০। রবিবার। ঝাড়গ্রাম

সকালে ট্রেনে শচীন, কেষ্ট, চুনাবালি ও আমি স্টেশনে। অনেক দেরি ট্রেনের। সুবোধ দত্ত ওর ঠিকানা দিলে 117, Panchanantala Road, Howrah। বেশ ছেলেটি। ট্রেনে খুব জায়গা। ঝাড়গ্রামে নেমে খুকুর ভাই ফড়িংয়ের সঙ্গে নেলিকো Seed Store নামক ওদের নার্সারিতে গেলুম। চা ও খাবার খেয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে ঝাড়গ্রামের ধূলিধূসর পথে রাজবাড়ি, সাবিত্রি (সাবিত্রী]মন্দির—আমার পুরোনো শ্বশুরবাড়ি ইত্যাদি ঘুরে রাজ- বাড়ির হাট দেখে দারুচিনির গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে এলুম। এসে ভূরিভোজন করা গেল। তারপর গিয়ে শুলুম। একটা নিমগাছ থেকে ডাল ভেঙে বেলা ৫টার সময় দাঁতন করি ও মুখ ধুই। তারপর চা এল। মিসেস দাসের বাড়ি 'ডাকঘর' অভিনয় হল। বেশ পরিকল্পনা করেছিল বাড়িটার। অমল ও সুধার ভূমিকা ভালো হয়েছিল। হাকিম ও উকিল মোক্তারদের স্ত্রীগণ এসে S.D.O.র স্ত্রীর চারিপাশে বসে খোসামোদ করতে লাগল। আমরা অভিনয়ান্তে তাড়াতাড়ি খেয়ে স্টেশনে আসি ও রাঁচি এক্সপ্রেসে একটু জায়গা করে নিয়ে অতি কষ্টে বসে ঘাটশিলা। শরীর খারাপ বড্ড সর্দি। কল্যাণী ঘুমুতে দেয় না—কেবল বলে, বুড়ো তোমার পায়ে সুড়সুড়ো। আমার বুরো [বুড়ো] ইত্যাদি। সর্দিতে সারারাত ঘুম হল না। নুটু এসেচে।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ৪ঠা পৌষ, ১৩৫০। সোমবার। ঘাটশিলা

সারাদিন সর্দি ও জ্বর ভাব। কোথাও গেলুম না। বিকেলে জজ মহিমা মিত্র ও শচীন বাঁড়ুয্যে এল। আয়েশাদের বাড়ি একটু গিয়ে বসলুম। সকালে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে মেজ বৌয়ের মুখে সুবর্ণ সংঘের কীর্তি সব শুনি। মিস দাস মেয়েদের আনচে—ইত্যাদি।

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ৫ই পৌষ, ১৩৫০। মঙ্গলবার।

সকালে রমণীবাবু এসে গল্প করলে ও অমরবাবুর ছেলে রমেন। রোদে বসে লিখচি। আয়েশাদের বাড়ি গিয়ে জল দিয়ে এলুম নিজে। সন্ধ্যায় জজবাবু এসে গল্প করলেন—ওরা মৌভাণ্ডাতে বেড়াতে গেল। হেমেন্দ্র মন্দির থেকে কারা বেড়াতে এলেন। দ্বিজুবাবুর বাড়ি রাত্রে বসি।

ভগবানের কথা অনেকদিন থেকেই ভাবি—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলেই তাঁর কথা আমার ভালো করে মনে পড়ে। গত জানুয়ারি মাস থেকেই দেখি তাঁর সম্বন্ধে অনবরত ভেবেছি—ওর মধ্যে মনে করার মতো ভাবনা সেই মাঠাবুরুতে জ্যোৎস্নারাত্রে শালবনে। সে এক অপূর্ব উদ্দীপনা ও অনুভূতি। বারাকপুরে গিয়ে পেয়ারাতলায়, মাঠে নদীতীরে ঠিক এমনি হয়েচে বটে। এবার কিন্তু তার Climax হল সারান্ডা ফরেস্টে গিয়ে। আমার মনের ভগবান সম্বন্ধে এই পরিণতি গত বৎসর জানুয়ারি থেকে বেশি হয়েচে—তারপর হয়েচে এপ্রিল মে মাসে রামকৃষ্ণ কথামৃত ও স্বামিজীদের জীবনী পড়ে।

২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ৬ই পৌষ, ১৩৫০। বুধবার।

শরীর ভালো নয়। দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে বসলুম। তারপর এলেন রমণীবাবু। সারাদিন শুয়ে আর বসে—সন্ধ্যায় জজবাবুর সঙ্গে রমণীবাবুর বাড়ি গিয়ে বসি।

আমারও এসব লোকের সঙ্গ তেমন ভালো লাগে না। দুটো সৎকথা কেউ বলে না—কেবল কি করে জমি কিনলুম, কি করে বাড়ি তৈরি হল, কি করে প্রথম ছেলের "বে" (বিবাহ বা বিয়েকে কলকাতার লোক 'বে' বলে) দিলুম—ইত্যাদি অসার কথা, দু-একবার টোপও ফেলেচি ভালো কথার—ভগবানের কথা তুলেচি, সাহিত্যের কথা তুলেচি, ফিলজফির কথা ও পরলোকতত্ত্বের কথা তুলেচি—কেউ একবার জিগ্যেস করলে না—আপনি কি পেয়েচেন কিছু এ সবের মধ্যে ?...নিতান্ত বৈষয়িক মন এদের। এত বিষয়ের কথা দিনরাত বলতে ও শুনতে আমার ভালো লাগে না। অথচ ঐ জজবাবুর বয়স ৫৯ বৎসর, উনি নিজেই কাল বল্লেন—এ বয়সে আর কেন অত ?ভালো লোকের সঙ্গ দেখচি যেমন মূল্যবান, তেমনি দুর্লভ।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ৭ই পৌষ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

দ্বিজুবাবুর বাড়ি বসে গল্প করি। আয়েশার স্বামীর অবস্থা ভালো নয়। বসে লিখচি, রমেন ওএক ভদ্রলোক দেখতে (?)এলেন। বিকেলে আমি নিজে গেলুম অমরবাবুর বাড়ি। চা ও খাবার খাওয়ালেন। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আবৃত্তি শুনি রেকর্ডে তারপর ব্রাউন সাহেবের বাড়িতে এসে জিগেস করি—টেবিল বিক্রি আছে ?ব্রাউন বার হয়ে এল ! বল্লে—না, বিক্রি নেই। যাচ্চি যখন, মুকুল ডাকচে—আসুন আসুন, শ্রী ব্যাঙ্কের শাখা হবে এখানে। আপনাকে কমিটির মেম্বার হতে হবে।

রাত হতে চলে এলুম। দ্বিজুবাবুর বাড়ি রিহার্সেল হচ্চে—সেখানে শচীন, কেষ্ট, ফণি, বালি (?)সবাই বসে। অনেক রাত্রে চলে এলুম।

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ৮ই পৌষ, ১৩৫০। শুক্রবার।

আজ বসে লিখি। রমণীবাবু এসে রোদে বসল সতরঞ্চিতে। কখনো মেঘ, কখনো রোদ। 'মাতৃভূমি' চিঠি লিখেচে উপন্যাসের জন্যে। বিকেলে জজবাবু এলে তার সঙ্গেই গল্প করি। আজ আর ঠাণ্ডা লাগিয়ে কোথাও যাবো না। দ্বিজুবাবুর বাড়িও না। গুটকে এল সন্দেবেলা—ওর বাপের চিঠি এসেচে ওর মা মৃত্যুশয্যায়। আমার ধান নষ্ট হয়ে গেল নাকি। গুট্‌কের সঙ্গে গল্প করি।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ৯ই পৌষ, ১৩৫০শনিবার।

আজ গজেনদের আসবার কথা, নুটুরও। সকাল থেকে রোদে বসবার পূর্বে লেপ মুড়ি দিয়ে বসে 'দেবযান' লিখি খানিকটা। তারপর রোদে বসে লিখে বইটি আজই বেলা ২॥০ টা থেকে ৩॥০টার মধ্যে শেষ করি। অবিশ্যি হয়তো পুনর্লিখন আছে বা সংশোধন আছে। ভগবানের জয় হোক। তাঁরই জগতের সৃষ্টি প্রাণীর অর্থাৎ আমাদের অনন্ত পথ ও তাঁর মহিমা কীর্তন করেছি এই বইতে। আশা করি লোকের মনে আনন্দ হবে এই বই পড়ে। ভগবান আশীর্বাদ করুন এই বইয়ে লিখিত সত্যগুলি যেন লোকের মনে শান্তি দেয়।

জজবাবুর বাড়ি গেলুম, তিনি আসেন নি। বেড়াতে বেরিয়েছেন। নীরদবাবু গরুর গাড়ি করে এসেচে দ্বিজুবাবুর বাড়িতে—সেখান থেকে আয়েসাদের বাড়ি হয়ে মাঠের পথে ওঁকে মেলে তুলে দিতে গেলুম স্টেশনে। টর্চ গেল নিভে। নীরদবাবু বল্লে—ও বিভূতিবাবু, ওখানে একটা পুকুর মতো কি ?হাসতে হাসতে দুজনে এলুম স্টেশনে। রমেন এসেচে সার বিজয়প্রসাদের জন্যে ফুল আর মিষ্টি দিতে। দেখা গেল না কোনো কামরায়। আমি একা চলে এলুম। নুটু এল না রাত্রে, ওর জন্যে মাছ নিয়েছিলুম।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ১০ই পৌষ, ১৩৫০। রবিবার।

কাল 'দেবযান' শেষ করেছি। আজ সরকারী ছুটি— নিয়েছি দুদিন। বই লেখা শেষ হলে দুদিন ছুটি নিয়ে থাকি। দ্বিজুবাবুর বাড়ি বসে, সত্য ও ডাঃ শীল এলেন। ওঁদের নিয়ে এলুম বাড়িতে। রমণীবাবু এসে পৌঁছে দিলেন। তারপর নুটু এল মোটরবাইকে। দুপুরে এক মোটর এসে হাজির, মুসাবনী থেকে দুইজন পাঞ্জাবী দেখা করতে এসেচে নুটুর সঙ্গে। বিকেলে বহু ছেলেমেয়ে বাড়িতে কিচ্‌কিচ্‌ করচে—আমি নুটুর সঙ্গে গল্প করে দ্বিজুবাবুর বাড়ি বসে আছি। দ্বিজুবাবুর অসুখ, তিনি তাঁর নির্জনতা বলে যাচ্চেন। এমন সময় দেখি আতাতলার কাছে জজবাবু উঁকি মারচেন আমার বাড়ির জানালায়। এসে জজবাবুকে বসালুম। এমন সময় দেখি সুরেশ মিত্র দুই নাতি নিয়ে বেড়াচ্চেন—ডাকলুম, এলেন ওঁরা। হঠাৎ দুই মোটর বোঝাই হয়ে টাটা থেকে একদল লোক, Range Officer ভর্মা, তাঁর স্ত্রী, অনেক young men এসে হাজির। ঘরে বসবার জায়গা দিতে পারিনে। জজবাবু ও সুরেশবাবুও জড়সড় হয়ে গেলেন। ওদের অনেকের বাড়ি ভাগলপুর। তারপর ওরা চলে গেলে জজবাবুকে নিয়ে রমণীবাবুর বাড়ি গিয়ে বসলুম। হৈ-হৈ ব্যাপার—এদিকে চুনাবালি (?), মেজ বৌ, শচীনের মা, শচীন সবাই। আজ বাড়িতে বড়দিনের ব্যাপার। সত্যিকার হলিডে। নুটুর সঙ্গে গল্প করি অনেক রাত পর্যন্ত। বড়দিনে feast হল। আয়েসার স্বামীর অবস্থা বড় খারাপ, ওবেলা সুবোধ ডাক্তার বল্লে। ভগবান তাকে নিরাময় করুন। 'দেবযান' লেখা আরম্ভ করি ১৯৩৭ সালে। কিন্তু বহুদিন পড়েছিল। ১৯৩৭ সালে ভাদ্র মাসে খুকুকে শুনিয়েছিলুম—তারপর গত মার্চ মাসের শেষে ও এপ্রিল মাসে পুনরায় আরম্ভ করি। ৯ মাস লাগল।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ১১ই পৌষ, ১৩৫০। সোমবার।

মন আজ ছুটি। দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি। কলকাতা থেকে ডাক্তার এসেচে আয়েশাদের বাড়ি। সে বলে কোনো আশা নেই। সন্ধ্যায় সুরেশ মিত্র মশায়ের জামাই এসে সারান্ডা ভ্রমণের গল্প শুনলে। তারপর দ্বিজুবাবুর বাড়িতে গিয়ে অনেক গল্প করি।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ১২ই পৌষ, ১৩৫০।মঙ্গলবার।

সকালে 'দেবযান'-এর এক নতুন অধ্যায় হঠাৎ লিখতে মন গেল। বসে বসে লিখলুম। দ্বিজুবাবুর পুকুরে নাইতে গিয়ে বড় আনন্দ পাওয়া গেল—সেখানে বসে বসে তেল মাখলুম ফুলফোটা গাছের পাশে বসে। বৈকালে জজবাবুকে নিয়ে স্বামীজীর আশ্রমে গেলুম। সেখানে গুরুবাদ সম্বন্ধে তত্ত্ব কি জিগ্যেস করলুম। স্বামীজী তাদের যুক্তি বললেন। জজবাবু ও আমি দুজনে অন্ধকারে মাঠের আলপথে চলে আসি। দ্বিজুবাবুর বাড়ি বসে গল্প করচি—এমন সময়ে মোটরে নুটু ও শান্তিবাবু, এক্সাইজ অফিসার এল। ওরা খেয়ে গুটকে ও বৌমাকে নিয়ে চলে গেল রাত ৯টার সময় ধলভূমগড়। কল্যাণী বলে, মানকু তোমার পাতে ভাত মেখে রেখো। আমার বড় ভালো লাগে তোমার মাখা ভাত।

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ১৩ই পৌষ, ১৩৫০। বুধবার।

সকালে শীল বাংলার ছেলেটি বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' এনে দিলে। রোদে বসে লিখি। তারপর দ্বিজুবাবুর বাড়ি গেলুম। আবার এসে লিখি—'দেবযান' শেষ করেচি। একটা বাড়তি অধ্যায় লিখচি। দ্বিজুবাবুর পুকুরে নাইতে গিয়ে তেল মাখতে মাখতে বড় আনন্দ হল। ভগবানের নাম করলুম। বিকেলে জজবাবু, দুই মেয়ে তাঁর ও সুরেশ সেন (বনগ্রামের ভূতপূর্ব S.D.O. ও কলিকাতার Collector ছিলেন) এসে গল্প করল। দুই মেয়ে গল্প করল ও গান করল। রাত্রে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি কাল 'ডাকঘর' অভিনয় উপলক্ষে ৪৫ জন নরনারী ঝাড়গ্রাম থেকেএসেচে। মিসেস দাসও এসেচেন। বহুলোক। বৌমা ও নুটু আজও এল না।

আজ গজেন মিত্র 'নবাগত'-এর দরুণ ১০০৲ টাকা বাকী মণিঅর্ডার পাঠালে।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ১৪ই পৌষ, ১৩৫০। বৃহস্পতিবার।

সকালে অনেকক্ষণ লিখি। শীল বাংলার ছেলে এল বই দিতে। একটু পরে সুরেশবাবুর নাতি 'মেঘমল্লার' নিয়ে গেল। দ্বিজুবাবুর বাড়িতে ঝাড়গ্রামের নৃপেন্দ্র মিত্র বলে এক সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ হল। অনেকক্ষণ ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্পগুজব, সাহিত্য আলোচনা করা গেল। বিকেলে সুরেশ সেন, মহিমা মিত্র, সরল নাগচৌধুরী হাইকোর্টের চিফ ইন্টারপ্রিটার প্রভৃতি এল। ওদের নিয়ে দ্বিজুবাবুর বাড়ি গিয়ে 'ডাকঘর' অভিনয়ে যোগ দিলুম। নীরদবাবু ও প্রফেসার বিশ্বাস এসেচেন। এত বাজে

লোক ওই আমতলার দোকানদারটা—এখানে গিয়েচে পয়সার তাগাদা করতে। অনেক রাতে 'ডাকঘর' শেষ হল। বালিকে দুপুরে অমলের স্বপ্ন রিহার্সাল দিলাম। অনেক রাত্রে আহারাদি করে ফিরি ! নুটু ও বৌমা আজও আসেন নি।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩। ১৫ই পৌষ, ১৩৫০। শুক্রবার।

এ বছরের শেষ দিন। ঘাটশিলাতেই কাটল।'মাতৃভূমি' থেকে পত্র এল ওদের উপন্যাসদিতেই হবে। সকালে বেড়াতে গেলুম 'হেমেন্দ্র মন্দির'-এ, চা খাওয়ালে দুটি মেয়ে। সুরেশ মিত্রের জামাই বন্দুক হাতে ফিরচে শিকার করে। দুপুরে 'মাতৃভূমি'র উপন্যাসের কথা ভাবি ও প্লট খুঁজি। সন্ধ্যায় দ্বিজুবাবুর বাড়িতে মিসেস দাস ও মেয়েরা নাচলে গাইলে। রাত্রে খাওয়া হল সেখানে—লুচি তরকারি, নববর্ষের ভোজ।

এ বৎসর ভ্রমণে কাটল ভালো। সারান্ডা, বামিয়াবুরু, মাঠাবুরু, ভালকি, পুরী—অনেক বেড়ালুম। ভগবানেরকৃপায় তাঁকে চিনবার সুযোগ পেলুম তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে। তাঁর জয় হোক। অর্থ তো লাগেনি বেশি ভ্রমণে। তাঁর দয়ায় যা হয়েছে অর্থব্যয়ে তা হয় না। অর্থব্যয়ে সারান্ডা হতে পারত না। ৯ বছর আগে এইদিনে আমি বারাকপুরে বড়দিনের ছুটি যাপন করচি, খুকুরাও আছে। সেই ধুরফুল ও ছোট এড়াঞ্চি ফুল ফোটা কুঠীর মাঠ। সে সব স্বপ্নের মতো মনে হয় এখন। আবহাওয়া একদম বদলে গিয়েচে।

১৯৪৩ সালের দিনলিপিতে উল্লিখিত
ব্যক্তি, স্থান এবং ঘটনার টিকা

১. সিংহ সাহেব। : যোগীন্দ্রনাথ সিনহা, বনবিভাগের বড় কর্তা।
২. সুবোধ : সুবোধ ঘোষ, ইঞ্জিনিয়ার ও সাহিত্যানুরাগী।
৩. গুট্‌কে : অজিতকুমার রায়, বারাকপুরবাসী। সম্প্রতি প্রয়াত।
৪. গুঁপো গোপাল : ফেলুগোপাল চট্টোঃ,ঘাটশিলাবাসী। সম্প্রতি প্রয়াত।
৫. শক্তিপদ : শক্তিপদ রাজগুরু, সাহিত্যিক।
৬. বাদু। : দেবীদাস চট্টোঃ, বিভূতিভূষণের ছোট শ্যালক।
৭. শচীন : সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণের ভাগনী-জামাই।
৮. দুনু : রেবা আচার্য, বিভূতিভূষণের শ্যালিকা।
৯. জন : জনরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ভাটপাড়াবাসী। লেখকের মাতুলবসন্তকুমারের পুত্র।
১০. বাণী রায়ের মা : লেখিকা গিরিবালা দেবী।
১১. নীলকণ্ঠ : বর্ধমান জেলার বিখ্যাত গায়ক ও গীতিকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়(১৮৪১-১৯১৮)।
১২. ত্রৈলোক্যবাবু : সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
১৩. গজেন : সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র।
১৪. সুমথ : সাহিত্যিক সুমথনাথ ঘোষ।
১৫. যোগেশ : যোগেশচন্দ্র বাগল।
১৬. দ্বারেশ : প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও জ্যোতিষী দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য (ভৃগুজাতক)।
১৭. বীরেন রায় : প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক। ওড়িশা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা।
১৮. খগেন মিত্র : অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র।